সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ

অনিল রায়

মূল্য ২॥০ টাকা

Printed & Published by S. C. Ghosh.
Presidency Printing Works, Dacca.

ভূমিকা

মার্ক্সবাদ পড়িবার ও বুঝিবার জন্য একখানা 'হ্যাণ্ডবুক' হিসাবে এই বইখানা প্রকাশিত হইল।

দমদম্ জেলে ১৯৪২ সনে কতকগুলি বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল রাজ-বন্দীদের মধ্যে। অধ্যাপক শ্রীনির্মল বসু 'ভারতীয় সভ্যতা' সম্বন্ধে, অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন 'বাংলা সাহিত্য' সম্বন্ধে, শ্রীসত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় 'পার্লামেণ্টারী রীতিনীতি' সম্বন্ধে এবং লেখক 'মার্ক্সবাদ ও সমাজতন্ত্র' সম্বন্ধে কতকগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

দমদম্ জেলে সেই সকল আলোচনা-সভায় লেখকের প্রদত্ত বক্তৃতার নোট হইতে এই বইয়ের উদ্ভব হইয়াছে। মার্ক্সবাদ একটা জীবনদর্শন এবং তাহার সকল দিকের যথাযথ আলোচনা করিতে হইলে একখানা বিস্তৃত পুঁথি লেখার দরকার হইয়া পড়ে। বর্তমানে তাহা সম্ভব নয়, তাই সম্প্রতি এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাই পুস্তকাকারে বন্ধুদের অনুরোধে প্রকাশ করা হইল। জেলখানায় প্রয়োজনমত বইপত্র পাওয়া অসম্ভব এবং তজ্জনিত অসম্পূর্ণতাও এই বইয়ে থাকিবে তাহা স্বাভাবিক। তবু এই পুস্তকের দ্বারা কিছু জিজ্ঞাসা, কিছু আলোচনা ও বিতর্ক উদ্দীপিত হইলেই ইহার সার্থকতা স্বীকৃত হইবে।

সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য। এই পুস্তকের মতে, ইতিহাসের বহুবাদী ব্যাখ্যাই (Pluralistic Interpretation) বিজ্ঞান-

সম্মত এবং সবগুলি একবাদী বা monistic ব্যাখ্যাই একদেশদর্শী। মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যা একবাদী। কেবল ভৌতিক বা আর্থিক ব্যাখ্যা (Materialistic বা Economic Interpretation) নয়, যাহার নাম ইতিহাসে চিদ্-ভৌতিক (Psycho-materialist Interpretation) ব্যাখ্যা তাহাই বৈজ্ঞানিক গবেষণার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারে: কেবল ভৌতিক জগতের শক্তিই নয়, চিৎলোকের বা মনোজগতের শক্তিগুলিও সমাজ ও জীবনের বিবর্তনে প্রভাবশীল। সমাজবিকাশের মূলে কেবল একপেশে নিয়ন্ত্রণবাদ (One-sided determinism) যারা কল্পনা করেন তারা একদেশদর্শী। এই দৃষ্টিতে Economic determinism, genetic determinism তথা ভৌগোলিক, যৌন, সামাজিক, বংশতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণবাদ প্রভৃতি সবই ভ্রান্ত। বৈজ্ঞানিক, দৃষ্টিভংগীতে Functional Correlation বা Interaction, ক্রিয়াত্মক সহসম্পর্ক ও পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদই সমাজ-ব্যাখ্যার বৈজ্ঞানিক নীতি। মার্ক্সবাদ আর্থিক নিয়ন্ত্রণবাদী হওয়ায় যান্ত্রিকতাবাদী বা mechanist ব্যাখ্যায় অধোগত হইয়া পড়িয়াছে। বহুবাদী ব্যাখ্যার সহিত এইখানে মার্ক্সবাদের মতবিরোধ।

শ্রেণীসংগ্রামকে মার্ক্সবাদ ইতিহাস ব্যাখ্যার মূলতত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। বহুবাদী ব্যাখ্যায় শ্রেণীসংগ্রাম একটা সামাজিক ঘটনা হিসাবে স্বীকৃত এবং ইহার প্রভাবও স্বীকৃত। কিন্তু ডায়ালেকটিক্-তত্ত্বের সহিত শ্রেণীসংগ্রামের যোগ এবং বিশ্ব-ইতিহাসের ও সংস্কৃতির একমাত্র স্রষ্টক ও নিয়ামক হিসাবে শ্রেণীসংগ্রামের সমাজতান্ত্রিক ভূমিকা, এই দুইটি মার্ক্সবাদী তত্ত্ব বহুবাদীব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করে।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা সঙ্গত। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার-প্রণীত 'Political Philosophies since 1905' নামক পুস্তকে আমাকে শ্রেণীসংগ্রামের বিরোধী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বর্ণনা

ভিত্তিহীন এবং ইহাতে আমার প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। শ্রেণীসংগ্রামের বিরোধী আমি নই। কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামের সামাজিক ও ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে মার্ক্সবাদী মতবাদ আমার কাছে অগ্রহণীয়। শ্রেণীসংগ্রাম একটা সত্য ও বাস্তব ব্যাপার। সমাজে ইহা রহিয়াছে এবং একদা ইহার বিলুপ্তি হইবে, সকল মানুষী চেষ্টার সেইদিকেই লক্ষ্য হওয়া উচিত। শ্রেণীসংগ্রামের অবসানই সামাজিক প্রচেষ্টার আদর্শ। কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামকে ডায়ালেকটিক্ নামক দুর্বোধ্য বিশ্বনীতির একটা প্রকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করা একান্ত কাল্পনিক। তাছাড়া শ্রেণীসংগ্রামকে বিশ্বসংস্কৃতির উৎপাদক বলিয়া বিশ্ববিবর্তনের একমাত্র মূল বলিয়া মনে করাও অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক। এই পার্থক্যটুকুই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণীসংগ্রামের অর্থনৈতিক ভূমিকা বা role সম্বন্ধে তেমন নয়, যতটা ইহার মার্ক্সকল্পিত দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক ভূমিকা সম্বন্ধে আপত্তি রহিয়াছে। আশা করি, সমাজ-তত্ত্ববিদ্ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিনয় সরকার মহাশয়ের কাছে এই পার্থক্যটুকুর গুরুত্ব উপেক্ষণীয় হইবে না।

এই বইর শেষ প্রবন্ধ 'সাহিত্যে শ্রেণীবাদ' চলিত ভাষায় লেখা। উহা মাসিক 'জয়শ্রীতে' প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

বইখানায় অনেক ভুলত্রুটি রহিয়া গেল। আশা করি, এই ত্রুটি মার্জনীয় হইবে। এখানে উল্লেখ থাকুক যে, সহকর্মী শ্রীযুক্ত সুনীল দাস মহাশয়ের পরিশ্রম ব্যতীত এই বই বাহির হওয়া সম্ভব হইত না।

৪৭এ, রাসবিহারী এভিনিউ,
কলিকাতা—২৬
ফোন : সাউথ— ১৩৪৫

সাম্রাজ্যবাদের দালাল
অনিল রায়

সূচীপত্র

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

পরিশিষ্ট

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ

প্রথম অধ্যায়

মার্ক্সবাদের মূলকথা

সমাজতন্ত্রবাদের সহিত মার্ক্স আরও তিনটী মতবাদ যোগ করিয়া একটী সম্পূর্ণ জীবনদর্শন (Philosophy of life) গঠন করিয়াছেন। এই মার্ক্সীয় দর্শনকে মার্ক্সবাদ (Marxism) বা কম্যুনিজম্ (Communism) বলা হইয়া থাকে। ১৮৪৮ সালে 'কম্যুনিষ্ট ইস্তাহার' (Communist Manifesto) নামক পুস্তকে মার্ক্স স্বয়ং 'কম্যুনিষ্ট' এই নামটী ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার পর ১৯১৯ সালে লেনিনও "কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিক" (Communist International) নামক প্রতিষ্ঠান গঠনের সময় 'কম্যুনিষ্ট' আখ্যাটি গ্রহণ করিয়াছেন।

সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমষ্টিবাদকেই বোঝা যায়। সম্পত্তিকে ব্যক্তির হাতে না রাখিয়া সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করাই সমাজতন্ত্রবাদের উদ্দেশ্য। ইহার উপায় হইল ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ এবং পণ্য উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কৃষির মালিকানা-স্বত্ব রাষ্ট্রের অধীনে আনিয়া সমাজের সকল ব্যক্তির কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালনা। কিন্তু মার্ক্স এই সমাজতন্ত্রবাদকে গ্রহণ করিয়া ইহার একটী দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি দান করিবার চেষ্টা করিলেন। সমাজের ও পৃথিবীর মূলে কোন্ শক্তি কাজ করিতেছে, ঐ শক্তি কোন্ পদ্ধতিতে কাজ করিতেছে, পৃথিবীতে ও সমাজে পরিবর্তন কেন হয় এবং কিরূপে হয়

ইত্যাদি রহস্যকে নির্ণয় করিবার চেষ্টায় তিনি পৃথিবীর ও সমাজের ক্রমবিকাশের ধারা সম্বন্ধে একটী বিস্তৃত মতবাদ দাঁড় করাইয়াছেন। সমাজতন্ত্র কেন প্রয়োজন এবং ভবিষ্যতে একদিন অব্যর্থভাবে কেন প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও সমাধান দিয়াছেন বলিয়া মার্ক্স দাবী করেন। এই কারণে মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্ তাহাদের এই কম্যুনিজমকে আখ্যাদান করিয়াছেন "বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ" (Scientific Socialism)। কেবল কাল্পনিক একটা আদর্শ হিসাবে নয়, বৈজ্ঞানিক কারণে ও বাস্তব জগতের অব্যর্থ নিয়মেই সমাজতন্ত্র আবির্ভূত হইবে বলিয়া মার্ক্স মনে করেন। কেবল আবির্ভূত হইবে নয়। আবির্ভূত হইতে বাধ্য মার্ক্সের পূর্বে যে সব সমাজতন্ত্রবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাহাদিগকে মার্ক্স "কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদ" "(Utopian Socialism)" নামে আখ্যাত করিয়াছেন।

১৮৪৮ সালে মার্ক্স 'কম্যুনিষ্ট ইস্তাহার' বা 'Communist Manifesto নামক পুস্তকে তাঁহার মতবাদ বিবৃত করেন। ঐ পুস্তকে ইউরোপে মধ্যযুগের সামন্ত-প্রথা হইতে শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্য দিয়া পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্রের আবির্ভাব কিরূপে হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপর "অর্থশাস্ত্রের আলোচনা" (Critique of Political Economy নামক পুস্তকে তাঁহার মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার পর ১৮৬৭ সালে "মূলধন,' বা ক্যাপিটাল (Capital) নামক পুস্তকে তাঁহার "উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব" (Theory of Surplus value) নামক বিখ্যাত মতবাদকে কেন্দ্র করিয়া সমাজের পুঁজিবাদী মূল প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মার্ক্সবাদ বলিতে নিম্নলিখিত মতবাদগুলি বোঝা যায়।

(১) দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ী জড়বাদ বা Dialectical Materialism (২) ইতিহাসের জড়বাদী বা অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা (Materialistic

Interpretation of History বা Economic Interpretation of History) (৩) উদ্বৃত্ত-মূল্যতত্ত্ব ও সমাজতন্ত্রবাদ বা Theory of Surplus value and Socialism. (৪) রাষ্ট্রের ক্রমবিলুপ্তিবাদ বা Theory of withering away of the state. (৫) বিবাহের ও পরিবারের বিলুপ্তিবাদ বা Theory of abolition of marriage and family.

উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ে মার্ক্স যে দৃষ্টিভঙ্গি বা মতবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহাই মার্ক্সবাদ (Marxism) বা কম্যুনিজম্ (Communism)। ইহাতে মার্ক্সবাদের বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইবে যে সমাজতন্ত্রবাদ বা সোস্যালিজম্'এর (অর্থনৈতিক সমষ্টিতন্ত্রবাদের) সহিত মার্ক্স একটা দার্শনিক মতবাদ ও একটা সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ যোগ করিয়াছেন। আসল **সমাজতন্ত্রের সহিত এই মার্ক্সবাদী দর্শনতত্ত্ব** (Dialectical Materialism) **বা সমাজতত্ত্বের** (Materialistic Interpretation of History) **কোন অন্তর্নিহিত সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ** সোস্যালিজম বা সমাজবাদকে **সমর্থন করিলেই যে** মার্ক্সবাদী **দর্শন ও সমাজসম্বন্ধীয় মতকেও সমর্থন করিতে হইবে তাহা ঠিক নয়।** মার্ক্সবাদের পাঁচটা মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা একটা করিয়া আলোচনা করা যাইতেছে।

দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ী বা দ্বান্দ্বিক জড়বাদ

(Dialectical Materialism)

মার্ক্স তাঁহার পূর্ববর্তী বিখ্যাত দার্শনিক হেগেল (Hegel) কর্তৃক প্রবর্তিত ডায়ালেকটীক (Dialectic) বা দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ী নীতি গ্রহণ করিয়া তাহাকে জড়বাদের বা Materialism এর সহিত যোগ করিয়া এই

Dialectical Materialism বা দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ী জড়বাদ নামক দর্শনতত্ত্ব গঠন করিয়াছেন। "তর্কবিজ্ঞান" (Science of Logic) নামক পুস্তকে হেগেল এই ডায়ালেকটীক নীতিকে ব্যাখ্যা ও বিবৃত করিয়াছেন। জড়বাদ পৃথিবীতে একটী পুরাতন মতবাদ, বিশেষ করিয়া ১৮শ শতকে ফরাসী দেশে নূতন **বিজ্ঞানের সহিত জড়বাদেরও প্রাদুর্ভাব হয়। এই ফরাসী জড়বাদের সহিত হেগেলীয় ডায়ালেকটীক বা দ্বান্দ্বিক নীতির সংযোগ সাধন করিয়া মার্ক্স'ও তাহার দর্শনতত্ত্ব "দ্বান্দ্বিক জড়বাদ" এর প্রবর্তন করেন।**

ডায়ালেক্‌টীক্ বা দ্বান্দ্বিক নীতি

ডায়ালেক্‌টীক্ নীতিকে হেগেল ও মার্ক্স একটা বিশ্বজনীন নীতি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। পৃথিবীর যত পরিবর্তন ঘটিতেছে সমস্তই এই নীতি অনুসারে ঘটিতেছে। মানুষের মনে যে সমস্ত চিন্তা ও ইচ্ছা ও অনুভূতি উঠিতেছে তাহাও এই নীতি অনুসারে উঠিতেছে ও বিলয় পাইতেছে। মানব-সমাজে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে, যত বিপ্লব, যুদ্ধবিগ্রহ, সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন, যত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, যত সভ্যতার জন্ম, স্থিতি ও লয়, সমস্তেরই মূলে এই ডায়ালেক্‌টীক্ নীতি রহিয়াছে। এক কথায় মানুষের মনে ও চিন্তা-জগতে এবং বাহিরের পৃথিবীতে যাহা কিছু ঘটে তাহা সমস্তই ডায়ালেক্‌টীক্ পদ্ধতিতে ঘটিয়া থাকে। **এই বিশ্বজনীন নীতি হেগেলই প্রবর্তন করিয়াছেন।**

এরিষ্টটল তাহার তর্ক-শাস্ত্রে যে তিনটী যুক্তি-বিচারের সূত্র (Laws of Thought) প্রবর্তন করিয়াছেন তাহাদিগকে হেগেল ভুল বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এরিষ্টটল প্রবর্তিত তিনটী নীতি এই—(১) তাদাত্ম্যনীতি বা অভেদনীতি (Law of Identity) (২) স্ববিরোধ নীতি (Law

f Contradiction) (৩) মধ্যবর্জন নীতি (Law of Excluded middle.)

(১) তাদাত্ম্য বা অভেদ (Law of Identity):—ক=ক, রাম মই বটে (A is A, Ram is Ram), প্রত্যেক বস্তু সেই বস্তুই বটে A thing is itself.)। ইহার অর্থ এই যে কোন বস্তু যাহা তাহা পেক্ষা বিপরীত বস্তু হইতে পারে না। যাহা যাহা, তাহা াহাই! একই বস্তুকে এক অর্থে এক সময়ে ব্যবহার করিয়া সেই মুহূর্তেই তাহাকে তাহার বিপরীত অর্থে ব্যবহার করা সঙ্গত। রামকে রাম বলিয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে "রাম না" বলা অযৌক্তিক। ারণ এইরূপ করিলে কোনও প্রকার চিন্তা করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। দি কোন বস্তু ও তাহার বিরুদ্ধ-বস্তু একই বস্তু হয়, তবে বস্তুর সঙ্গে বস্তুর কানও পার্থক্য থাকে না।

(২) স্ববিরোধ নীতি (Law of Contradiction):—ক 'না-ক' নয় A is not not-A)। রাম 'না-রাম' নয় (Ram is not not-Ram)। একটি বস্তু 'না-বস্তু' নয় (A thing is not not-itself)। এই নীতিটি প্রথম নীতির বা অভেদ তত্ত্বেরই একটা প্রকারভেদ মাত্র। অভেদ বা Identity নীতিকেই অন্য ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে। াম "রাম নহে" ইহা হইতে পারে না; অর্থাৎ রাম রামই বটে, না-রাম" হইতে পারে না।

(৩) মধ্যবর্জন নীতি (Law of Excluded middle):—ক, হয় ক, নয় তো না-ক (A is either A or not A)। রাম হয় াম-নয় তো 'না-রাম' (Ram is either Ram or not-Ram)। কান বস্তু হয় সেই বস্তু নয় তো 'না-বস্তু' (A thing is either itself or not itself)। কোন বস্তু হয় সেই বস্তুই আছে, নতুবা সেই বস্তু নয়।

"হাঁ" কি "না" এই দুইটীর একটীকে এক সময় কোন বস্তু সম্বন্ধে বলা চলে। হাঁ ও না এই দুইটী বিরুদ্ধ কথা কোন বস্তু সম্বন্ধে **একই সঙ্গে ও একই সময়ে বলা চলে না**। ইহাদের মধ্যে কোন আপোষ বা মধ্যবর্তী অবস্থা কল্পনা করা যায় না। হয় রাম রামই বটে, নতুবা রাম নয়—এই দুইটী এক সঙ্গে হওয়া সম্ভব নয়। রামও বটে রাম নয়ও বটে —ইহা নিতান্ত বাতুলতা বই আর কিছু নয়।

এরিষ্টট্‌ল-এর তর্ক শাস্ত্রের মতে এই নীতিকে মানিয়া না চলিলে কোনও প্রকার মননা বা চিন্তাকার্য সম্ভব নয়। তাই এই নীতি তিনটীকে চিন্তার মৌলিক নীতি বলিয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু হেগেল ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে এরিষ্টট্‌ল-এর নীতিগুলি গোড়াতেই ক্রটি-যুক্ত।

হেগেলীয় ডায়ালেক্‌টীক্ নীতি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ইহাকে তিনটী মূল নীতিতে ভাগ করা হইয়াছে।

(১) বিরুদ্ধ সমন্বয় বা বিরোধী-তাদাত্ম্যনীতি বা Law of Identity of Opposites, (২) বিনশনের বিনশন বা Law of Negation of Negation, (৩) পরিমাণগত পরিবর্তন হইতে গুণগত পরিবর্তনের উদ্ভব বা Quantitative Changes lead to Qualitative changes.

(১) বিরোধী-তাদাত্ম্য বা বিরোধীর সহানুপ্রবেশনীতি বা Law of Identity of Opposities, বা Interpenetration of Opposites. ক ক নয়—(A is not A). রাম রাম নয়—(Ram is not Ram). একটি বস্তু একই সময়ে সেই বস্তু এবং নয়-বস্তু—(A thing is itself and not itself at the same time). একই সময়ে হাঁ, হাঁ-ও বটে না-ও বটে—(Yes is both yes and no simultaneously). পৃথিবীর প্রত্যেকটি বস্তুই স্ববিরোধী। প্রত্যেকটি বস্তুই নিজেকে নিজেই বিরুদ্ধতা করিতেছে। প্রত্যেকটী বস্তুকেই "সেই

বস্তু" ও "সেই বস্তু না" উভয়ই বলা চলে। হেগেলের মতে প্রত্যেক বস্তুই প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে। কোন বস্তুই একই অবস্থায় একই সত্তা হিসাবে স্থির হইয়া থাকে না। যাহা যে প্রকার আছে, পর মুহূর্তে তাহার বিরুদ্ধ সত্তায় পরিণত হইতেছে। রাম রামও বটে, রাম নাও বটে, যাহা রাম তাহাই "না-রাম"। কারণ রাম পরিবর্তিত হইতেছে। পূর্ব মুহূর্তে যে রাম ছিল পর মুহূর্তে সে রাম আর নাই। রাম পর মুহূর্তে "না-রাম" বা not-Ram হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণে রাম রামও বটে এবং ঠিক পূর্বের রাম নাই বলিয়া রাম না-ও বটে। অতএব যিনি রাম তিনিই "না-রাম"। সুতরাং রামই "না-রাম" এবং এই প্রকার প্রত্যেকটী বস্তুই পরিবর্তনের দরুণ নিজের বিপরীত স্বরূপ ধারণ করিতেছে। অর্থাৎ একই সময়ে প্রতি বস্তু সেই বস্তুও বটে আবার তাহার বিপরীত বস্তুও বটে। হাঁ এবং না, itself—সত্তা এবং not itself—না-সত্তা একই সঙ্গে একই সময়ে একই সত্বারূপে বর্তমান আছে। ইহাকে বিরুদ্ধ তাদাত্ম্য বা Identity of Opposites বলা হয়। ইহা এরিষ্টটল-এর তাদাত্ম্য-নীতি Law of Identityর বিপরীত অর্থসূচক।

(২) বিনশনের বিনশন বা Law of Negation of Negation :—হেগেল ও মার্ক্সের মতে প্রতি বস্তু পরিবর্তিত হইতেছে। পরিবর্তনের মূল অর্থ হইল বিনশন বা বিলুপ্তি। প্রত্যেক বস্তু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বিনষ্ট বা বিলুপ্ত বা negate করিতেছে। এই বিনশন বা Negation বিশ্ব-সংসারের অন্তর্নিহিত একমাত্র মৌলিক নীতি। জড়-জগতে, উদ্ভিদ্-জগতে, পশু-জগতে মানব-জগতে যত পরিবর্তন ঘটিতেছে সবই এই বিনশন বা Negation নীতির প্রকাশ। প্রত্যেক বস্তু বা ব্যক্তি যে প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনের মধ্য দিয়া যাইতেছে তাহাই তাহার ক্রমবিকাশ। সমাজ, ব্যক্তি বা জাতির ক্রমবিকাশের মূলে এই বিনশন রহিয়াছে। ক্রম-

বিকাশের মুখে প্রত্যেক ব্যক্তি বা বস্তু বা সমাজ নিত্য নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু এই অবস্থান্তরের মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে পূর্ব অবস্থাকে বিলুপ্ত করিয়া পরবর্তী অবস্থার উদ্ভব হইতেছে। পূর্বের অবস্থা বা স্তরকে বিলুপ্ত বা বিনষ্ট না করিয়া পরবর্তী অবস্থা বা স্তরের উদ্ভব হইতে পারে না। এইখানে হেগেল একটি বিশেষ ফর্মুলা বা পদ্ধতির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রত্যেকটা পরিবর্তনের বা ক্রমবিকাশের তিনটা ধাপ বা স্তর আছে। প্রথম স্তরের নাম স্থিতি বা Thesis ; দ্বিতীয় স্তরের নাম প্রতিস্থিতি বা Antithesis ; তৃতীয় স্তরের নাম সংস্থিতি বা সমন্বিত স্থিতি বা Synthesis।

একটা বীজ তাহার ক্রমবিকাশের ফলে তিনটা ধাপকে পার হইয়া উচ্চতর অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। বীজের স্তর বা অবস্থাকে স্থিতি বা Thesis বলা চলে। প্রতি মুহূর্তেই বীজ বীজের বিপরীত বা "না-বীজ" বা not seed হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু প্রতি মুহূর্তের এই সব পরিবর্তন আমাদের চোখে না পড়িলেও বীজটা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া চারা গাছে পরিণত হইতেছে। তাই "চারা গাছকে" বীজের প্রতিস্থিতি বা বিরুদ্ধ সত্তা বা Antithesis বলা যাইতে পারে। স্থিতি বা প্রথম স্তরকে বিনষ্ট করিয়া বা negate করিয়া প্রতিস্থিতির (চারাগাছ) উদ্ভব হইয়াছে। ইহার পর চারাগাছও পরিবর্তিত বা ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া তৃতীয় স্তর বা বৃক্ষে পরিণত হয়। এই "বৃক্ষ" হইল সমন্বয় বা Synthesis। প্রতিস্থিতিকে বিনষ্ট করিয়া সমন্বয়ের আবির্ভাব হইয়াছে। এই কারণে সমন্বয়কে বলা হইয়াছে দুইটা বিনশনের বা Negationএর ফল। এইরূপে বৃক্ষ আবার পরিবর্তনের গতিতে বীজ ও অন্যান্য অবস্থান্তরে পরিণত হইতেছে। সুতরাং, এই মতে, সমস্ত পরিবর্তন বা ক্রমবিকাশই ক্রমান্বয় বিনষ্টি বা Negation of Negation-এর ফল। পৃথিবীতে সমস্ত বস্তুই

এইরূপ অহরহ বিনষ্টির মধ্য দিয়া যাইতেছে। এই বিনষ্টি-তত্ত্বই সৃষ্টির-মূলতত্ত্ব।

(৩) পরিমাণগত পরিবর্তন হইতে গুণগত পরিবর্তন বা Quantitative Changes lead to Qualitative Changes।

প্রত্যেক বস্তুরই পরিবর্তন হইতেছে, সেই পরিবর্তনের অর্থই হইতেছে বিনশন। প্রতি মুহূর্তেই প্রত্যেক বস্তু আপনাকে বিনাশ বা negate করিতেছে, কিন্তু প্রতি মুহূর্তের সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র পরিবর্তনগুলি আমাদের চোখে পড়ে না। পরিবর্তনের পরিমাণ যখন খুব বেশী হয় তখনই আমাদের চোখে বস্তুর মধ্যে একটা রূপান্তর ধরা দেয়, হেগেল ও মার্ক্সের ডায়ালেক্‌টিক্ নীতির ইহা একটা তত্ত্ব যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্তন জমা হইতে হইতে একটা বিশেষ অবস্থায় সুবৃহৎ একটা পরিবর্তন ঘটিয়া যায়। সামান্য সামান্য পরিবর্তনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া একটা বিশেষ সময়ে হঠাৎ একটা নূতন বস্তুর আবির্ভাব হয়। যখন এই নূতন বস্তুর আবির্ভাব ঘটে তখন একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়াছে বলিয়া ইঁহারা মনে করেন। এই নূতন অবস্থায় বস্তুটী একটি নূতন স্তরে উপস্থিত হইয়াছে। এখানে একটা বিন্দুতে বা জায়গায় আসিয়া যেন একটা আকস্মিক বিপ্লব ঘটিয়া গেল। যেন অতি ধীরে ধীরে ও ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন হইতে হইতে বস্তুটি একটি লম্ফ বা একটি 'Sudden Jump' দিয়া একটি সম্পূর্ণ নূতন বস্তুতে পরিণত হইল। যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, জল হইতে বরফ উদ্ভব এই নীতির একটি প্রমাণ। জলের উপর ঠাণ্ডা প্রয়োগ করিলে এবং ধীরে ধীরে ঠাণ্ডার পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে এমন একটা সময় আসিবে যখন হঠাৎ জল বরফে পরিণত হইবে। এখানে ঠাণ্ডার পরিমাণগত পরিবর্তনের ফলে গুণগত পরিবর্তন সংঘটিত হইল। তেমনি জলের উপর ক্রমশই বেশি উত্তাপ প্রয়োগ করিতে করিতে যখনই ১০০° উত্তাপ

দেওয়া হয় তখনই অকস্মাৎ জল বাষ্পে পরিণত হইতে আরম্ভ করিবে। বাষ্প ও বরফ দুইই জল হইতে সম্পূর্ণ নূতন বস্তু। এই প্রকার নূতনত্বের আবির্ভাব পৃথিবীতে সদাই ঘটিতেছে এবং এই প্রকার পরিমাণগত পরিবর্তন হইতে নূতন বস্তুর আবির্ভাব ঘটিতেছে। স্থিতিকে বিনাশ করিয়া এরূপ ক্রমবর্ধমান পরিবর্তন হইতেই প্রতিস্থিতির আবির্ভাব ঘটিতেছে; প্রতিস্থিতির মধ্যেও ক্রমিক পরিবর্তন বা বিনষ্টির ফলে সমন্বয়ের আবির্ভাব হইতেছে।

সমাজে ডায়ালেক্‌টীক্‌-এর প্রয়োগ

হেগেল তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক 'ইতিহাসের দর্শন' বা "Philosophy of History"তে উপরোক্ত ডায়ালেক্‌টিক্‌ নীতি অনুসারে সমাজের ক্রমবিকাশকে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মানুষের সমাজ-জীবনেও পরিবর্তন ঘটিতেছে। এই পরিবর্তন হেগেলের মতে বিনশন ব্যতীত আর কিছুই নয়। সমাজ প্রতিমুহূর্তে নিজেকে বিনাশ করিয়া চলিয়াছে। এই বিনষ্টি বাড়িতে বাড়িতে সমাজকে এক একটা অবস্থায় এক একটি নূতন স্তরে রূপান্তরিত করিতেছে। সমাজেও পরিমাণগত পরিবর্তনের ফলে এই বিশেষ স্তরগুলিতে গুণগত পরিবর্তন ঘটিতেছে। এই গুণগত পরিবর্তন এক একটা বিপ্লবাত্মক ঘটনা এবং সমাজের ক্রমবিকাশের এই অব্যর্থ ডায়ালেক্‌টীক্‌ নীতির ফলে যুগে যুগে সমাজ-বিপ্লব উপস্থিত হইতেছে। এই ডায়ালেকটীক নীতি অনুসারে ক্রম-বিকাশের বিভিন্ন অবস্থায় বিপ্লব বা Revolution সংঘটিত হয়। প্রত্যেকটী সমাজও এই ডায়ালেক্‌টীক্‌ নীতি অনুসারে পরিবর্তিত হইতে বাধ্য। সুতরাং অব্যর্থ নিয়মে কতকগুলি বাঁধাধরা বিশিষ্ট ধাপের মধ্য দিয়া সমাজের জীবন চলিতে বাধ্য।

মার্ক্স হেগেলকে অনুসরণ করিয়া সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশকে এই ডায়ালেক্‌টীক্‌ নীতি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে স্থিতি এবং প্রতিস্থিতি এই দুইটী বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্য দিয়া সমাজ ক্রমেই নূতন সমন্বয়-এর স্তরে উপস্থিত হইতেছে। প্রত্যেকটী স্থিতি নিজেকে বিনাশ করিতেছে। স্থিতির গর্ভেই একটী বিরুদ্ধ প্রতিস্থিতির উদ্ভব হয়। ঐ প্রতিস্থিতি স্থিতিকে ক্রমেই অধিকতর বিলুপ্তির দিকে লইয়া যাইতেছে অর্থাৎ বিনাশ করিতেছে। এই বিনশনের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। বৃদ্ধি পাইতে পাইতে স্থিতি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত বা বিনষ্ট হইয়া প্রতিস্থিতির পরিপূর্ণ রূপ লইয়া আবির্ভূত হইতেছে। এই নিয়মে প্রতিস্থিতির মধ্যেও তাহার বিপরীত শক্তিরূপে একটী নূতন প্রতিস্থিতির জন্ম হইতেছে। পূর্বের প্রতিস্থিতিকে এই নূতন বিরুদ্ধ শক্তি ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া একটী সম্পূর্ণ নূতন সমন্বয় রূপে অবির্ভূত হইতেছে।

সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাস মার্ক্স, ডায়লেকটিক নীতি অনুসারে ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে প্রাচীন সমাজকে বিলুপ্ত বা negate করিয়া মধ্যযুগে ফিউডাল সমাজ বা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ আবির্ভূত হইয়াছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ প্রাচীন সমাজের "প্রতিস্থিতি" আবার সামন্ততান্ত্রিক সমাজকে বিলুপ্ত করিয়া ধনতান্ত্রিক (Capitalism) সমাজের জন্ম হইয়াছে। ধনতান্ত্রিক সমাজকে বিনাশ বা negate করিবার জন্য ধনতন্ত্রের গর্ভেই তাহার "প্রতিস্থিতি" সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলন আরম্ভ হইবে। সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্রকে বিনষ্ট করিয়া ভবিষ্যতের অব্যর্থ সমন্বয়রূপে আবির্ভূত হইবে। সমাজের ক্রমবিকাশেও ডায়ালেক্‌টীকের উপরোক্ত তিনটী নীতি অমোঘরূপে কাজ করিতেছে।

দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ী জড়বাদ বা Dialectical Materialism

মার্ক্সের দর্শনের নাম দ্বান্দ্বিক জড়বাদ। ফরাসী দেশে ১৮শ শতকে যে জড়বাদ প্রচলিত ছিল তাহার সহিত ডায়ালেক্‌টীক্ নীতিকে যুক্ত করিয়া এই দ্বান্দ্বিক জড়বাদ গঠিত হইয়াছে। জড়বাদের মূল সূত্র দুইটী :—

(১) জড়-শক্তি বা (Matter) জগতের আদিম ও একমাত্র সত্য পদার্থ।

(২) জড় হইতে প্রাণ (Life) ও মনের (Mind) উৎপত্তি হইয়াছে।

এই দুইটী সূত্র একত্রে ইহাই বুঝায় যে সৃষ্টির পূর্বে জড় উপাদান ও তাহাতে গতি (Motion) ছিল। এই সব জড় উপাদান নানাপ্রকার বিচিত্র ধরণে সংযুক্ত হওয়ার ফলে কোন বিশেষ অবস্থায় প্রাণ-শক্তির জন্ম হইয়াছে। নানাপ্রকার জড়-বস্তুর সমবায়ে প্রাণ-শক্তির উদ্ভব কি করিয়া হইল এ কথার উত্তরে ১৮শ শতকের বৈজ্ঞানিক জড়বাদীরা বলিয়াছেন যে প্রাকৃতিক নিয়ম ও কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার ফলেই প্রাণশক্তি আবির্ভূত হইয়াছে। উদ্ভিদ ও প্রাণী-দেহ একপ্রকার জটিল যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহাদের যে গতি ও প্রাণ দেখা যায় তাহার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। মস্তিষ্ক হইতেই আলোকচ্ছটার মত ইহা নির্গত হয়। মানুষের চিন্তাশক্তি ও মন মস্তিষ্কের সৃষ্টি মাত্র। উদ্ভিদের মন না থাকিলেও প্রাণ আছে। উহার এই প্রাণ-শক্তি আর কিছু নয় শুধু তাহার অন্তর্গত জড়কণাগুলির সমবেত প্রকাশ মাত্র। কার্য-কারণের অব্যর্থ নিয়মে কতকগুলি উপাদান একত্র হইলে প্রাণ ও মন দেখা দিবেই। বিজ্ঞানের মূলনীতি কার্য-কারণ-শৃঙ্খলা (Causality)। কারণগুলি বর্তমান থাকিলে কার্য বা তাহার ফল দেখা দিবেই, জগতের সমস্ত

বস্তু সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ এই নিয়মে বাঁধা। কারণগুলি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ষোল আনা না থাকায় আমরা সমস্ত কার্য বা ঘটনাকে বুঝিতে বা সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারি না। তেমনি প্রাণ এবং মনের সমস্ত কিছু রহস্য আমরা এখনো উদ্ঘাটন করিতে পারি নাই, তাহার কারণ, এই যে সমস্ত উপাদান ও শক্তি সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণজ্ঞান এখনও হয় নাই। যে সব উপাদান যে প্রকারে সংযুক্ত হইয়া উদ্ভিদ, জন্তু ও মানুষ গঠিত হইয়াছে এক সময় সম্পূর্ণ জ্ঞান হইলে বিজ্ঞান সব উপাদান এইরূপে একত্র করিয়া ইহাদের সৃষ্টি করিতে পারিবে।

সংক্ষেপতঃ, জড়-শক্তি (Matter) হইতেই মন ও প্রাণের উৎপত্তি এবং এই বিশ্বপৃথিবী জড়-শক্তি (Matter) হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাই জড়বাদের সারতত্ত্ব।

মার্ক্স এই তত্ত্বকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তাঁহার মতবাদ জড়বাদ (Materialism)। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্সের ডায়ালেক্‌টীক্ নীতিকে যোগ করায় মার্ক্সবাদীদের মতে ইহা পূর্ববর্তী অন্য সমস্ত জড়বাদ হইতে বৈশিষ্টযুক্ত হইয়াছে এবং পৃথক হইয়া উঠিয়াছে। এই কারণে পূর্ববর্তী জড়বাদকে যান্ত্রিক জড়বাদ (Mechanistic Materialism) বলিয়া আখ্যাত করিয়া মার্ক্স তাহার দ্বান্দ্বিক জড়বাদের (Dialectical Materialism) বিশিষ্টতা দাবী করিয়াছেন। পূর্ববর্তী জড়বাদ অনুসারে জড়শক্তি হইতে মনের বা প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে—কার্য-কারণের যান্ত্রিক নিয়মে।

জড়কণাগুলির ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে প্রাকৃতিক নিয়মে মন ও প্রাণের আবির্ভাব ঘটে। কাজেই জড়বস্তুকে ও জড়-প্রকৃতির নিয়মগুলিকে জানিতে পারিলেই আমরা মনের ও প্রাণের তত্ত্বকে জানিতে পারিব। জড়বস্তু ব্যতীত প্রাণ বা মনের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। মার্ক্স এই মতবাদের ত্রুটী সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তিনি মানুষকে ও প্রাণীর প্রাণ ও

মনকে যান্ত্রিক সমাবেশের ফল বলিয়া মনে করেন না। তাঁহার মতে, পূর্বের জড়বাদ কিছুটা ভুল করিয়াছে। তাহারা মন ও প্রাণকে জড়বস্তুর যান্ত্রিক ফল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। বস্তুতঃ, মার্ক্সের মতে জড়বস্তু হইতে মন ও প্রাণের উৎপত্তি হইলেও মন ও প্রাণ জড় হইতে উচ্চতর বস্তু এবং ইহা সম্পূর্ণ একটা নূতন আবির্ভাব। এই নূতন আবির্ভাব যান্ত্রিক উপায়ে সৃষ্ট হয় নাই। ডায়ালেক্‌টিক্ নীতি অনুযায়ী পরিমাণগত পরিবর্তন হইতে হইতে গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়া একটা নূতন স্তরের আবির্ভাব হইয়াছে। মার্ক্সবাদী এই যান্ত্রিক জড়বাদকে প্রত্যাখ্যান করিয়া একটা নূতন ধরণের জড়বাদ প্রবর্তন করিয়াছে বলিয়া দাবী করেন। ইহাদের মতে এই নূতন জড়বাদের বৈশিষ্ট্য হইল এই যে ইহারা মনকে একটি নূতন সত্তা বলিয়া স্বীকার করেন এবং জড়জগতের নিয়মের দ্বারা মনোজগতের ও প্রাণজগতের ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা করা অসম্ভব বলিয়া মনে করেন। সংক্ষেপে এই বলা চলে যে জড়শক্তি (Matter) হইতেই বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে এবং **এই জড়বস্তু** (Matter) **দ্বান্দ্বিক বা ডায়ালেকৃটিক্ নীতির ফরমুলা অনুসারে নিজেকে পরিবর্তিত করিয়া চলিয়াছে।** "অর্থশাস্ত্রের আলোচনা" (Critique of Political Economy) নামক পুস্তকের মুখবন্ধে এবং "পুঁজিবাদ" (Capital) নামক পুস্তকের ভূমিকায় এবং "ফয়ারবাক সম্বন্ধে এগার সূত্র" (Eleven Theses on Feuerbach) নামক পুস্তকে মার্ক্স এ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এঙ্গেলসের 'ফয়ারবাক' (Feuerbach), "ডুয়েরিং-বিরোধী" (Anti-Duhring), 'প্রকৃতি ও ডায়ালেকৃটিক্' (Nature and Dialectics) নামক পুস্তকগুলিতে, লেনিনের 'প্রত্যক্ষবাদী সমালোচনা এবং জড়বাদ' (Emperio-Criticism and Materialism) পুস্তকে, বুখারিনের 'ঐতিহাসিক জড়বাদ' (Historical Materialism) পুস্তক প্রভৃতিতে এই তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বান্দ্বিক জড়বাদের সমালোচনা

ডায়ালেকৃটীক্ নীতি

মার্ক্সের এই দ্বান্দ্বিক জড়বাদ দাঁড়াইয়া আছে ডায়ালেকৃটীক্ নীতির উপরে, কিন্তু এই **হেগেলীয় ডায়ালেকৃটীক্ নীতি নিতান্ত ত্রুটীপূর্ণ এবং অযৌক্তিক। বহু দার্শনিক পণ্ডিত এই ডায়ালেকৃটীক্ নীতিকে বিশ্লেষণ করিয়া ইহার ভুল-ত্রুটী দেখাইয়া দিয়াছেন।** যুক্তি বিচারে ইহা প্রমাণ হয় যে এরিষ্টটলের তর্কশাস্ত্র ও তাঁহার যুক্তি বিচারের মৌলিক সূত্রই (Fundamental Laws of Thought) নির্ভুল এবং চিন্তা ও জড়জগতের মৌলিক সত্য। অভেদনীতি (Law of Identity) ইত্যাদি ব্যতীত আমরা কোনই চিন্তা করিতে পারি না। **জগতের সব ঘটনা ও ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝিতে বা চিন্তা করিতে হইলে বা তাহাদের সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে এরিষ্টট্ল কর্তৃক প্রবর্তিত নীতি তিনটিকে মানিতেই হইবে। হেগেল নিজেই ভুল করিয়া অবাস্তব ও অযৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন।** কোথায় কি করিয়া হেগেল ভুল করিয়াছেন তাহাই দেখাইতেছি।

প্রথমতঃ "বিরোধী-তাদাত্ম্য" (Identity of Opposites) নামক হেগেলীয় ডায়ালেকটিক নীতির প্রথম সূত্র অবাস্তব, অসম্ভব ও অযৌক্তিক। প্রতি বস্তুই তাহার বিপরীত বস্তুতে—প্রতিস্থিতিতে পরিণত হইতেছে; রাম পরিবর্তিত হইয়া "না-রাম" হইতেছে, অতএব রামই "না-রাম" এ কথা ঠিক

নয়। যে রাম সে কখনও তখন তখনই সেই মুহূর্তে "না-রাম" হইতে পারে না। পরিবর্তন ঘটিতে কিছুটা সময়ের দরকার হয়। পরিবর্তন হইল একটা প্রক্রিয়া ; যে কোন প্রক্রিয়া ঘটিতে কিছু সময় অতিক্রান্ত হইবেই। কাল পদার্থকে (Time factor) বাদ দিয়া কোন প্রক্রিয়া বা পরিবর্তনই ঘটিতে পারে না। রামের কিছুটা পরিবর্তিত হইতেও কিঞ্চিৎ সময় লাগিয়াছে, কাজেই রাম পরিবর্তিত হইয়া "না-রাম" হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করিলেও একথা বলিতে হয় যে কিছুক্ষণ পরে রাম "না-রাম"-এ পরিণত হইয়াছে। রাম একই সময়ে "না-রাম" হইতে পারে না, যে মুহূর্তে রাম রামই আছে ঠিক সেই মুহূর্তে রাম রামই আছে। হয়ত পরমুহূর্তে কিছু পরিবর্তিত হওয়ার ফলে রাম "না-রাম" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই পরিবর্তনকে বুঝিতে বা বুঝাইতে ডায়ালেকটিকের বিরুদ্ধ-সমন্বয় নীতি মোটেই খাটে না। যে বস্তু যাহা, সেইক্ষণেই সেই বস্তু তাহা নয়, এ কথা বাতুলের প্রলাপ বই আর কিছু নয়। আমাদের বক্তব্য রাম একই সময়ে (simultaneously বা at the same time) "না-রাম" হইতে পারে না, পরবর্তী সময়ে (subsequently) হইতেও বা পারে। বীজ প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তিত হইতেছে। কিন্তু পরিবর্তনের ফলে ও পরে পরে সময়াতিপাতের ফলে না-বীজ (not-seed) হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু সেই মুহূর্তে বীজও বটে এবং না বীজও বটে, একথা অসম্ভব। **দুইটী বিরুদ্ধ বস্তু বা সত্তা একই সময়ে একই অর্থে একই সত্তা হইতে পারে না।**

তা ছাড়া যদি একই মুহূর্তে রাম "না-রাম" ও বটে, তবে কোনও পরিবর্তন সম্ভব হয় না। কারণ রাম ও "না-রাম" একই সময়ে ও একই সঙ্গে ঘটিলে একে অন্যকে খণ্ডন ও বিলুপ্ত করিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং তার ফলে অবশিষ্ট শূন্য বই আর কিছু থাকে না। **পরিবর্তনকে**

বুঝিতে হইলেও অ্যারিষ্টট্‌লের তাদাত্ম্য নীতিকেই (Identity) অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ বস্তু কিঞ্চিৎ সময়াতিক্রমে **স্বরূপে** পৃথক বা বিভিন্ন হইতে পারে। পরবর্তী কালে (subsequently) বস্তু ভিন্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে—একই কালে নয়।

দ্বিতীয় নীতি—বিনশনের বিনশন বা Negation of Negationও মূলতঃ ভুল। বস্তুতঃ, পরিবর্তন (Change) আর বিলুপ্তি (Negation) একই বস্তু নয়। "বীজ" হইতে প্রতি মুহূর্তের পরিবর্তনে যে "চারাগাছ" বাহির হইল, তাহা বীজের বিলুপ্তির বা Negation-এর ফলে নয়, তেমনি চারাগাছ হইতে "বৃক্ষের" পরিণতি ও বিনাশ বিলুপ্তির পরিচায়ক নয়। এ-স্থলে ক্রমবিকাশে কোনও বিলুপ্তি ("Negation") ঘটিতেছে না। বীজের বৃক্ষে পরিণতিকে বিনাশ (Negation) বলা ভুল। ইহা হইল "বিকাশ" (Development), বিবৃদ্ধি (Growth) বা পূর্ণতা-প্রাপ্তি (Culmination)—তেমনি রাম বালক হইতে যুবকে পরিণত হইল তাহাও রামের বিনাশ (Negation) নয়। রামের পূর্ণতা-প্রাপ্তি। পূর্ণতা যাহা তাহাকে বিনাশ বলিব কেন? বিকাশকে বিনাশ বলা ভাষা ও ভাবের উপর জুলুম বই আর কিছু নয়। ম্যাক্ টেগার্ট (Mac Tegart) ১৯শ শতকের একজন নামকরা হেগেলপন্থী। তাঁহার "হেগলীয় ডায়ালেকটীকের আলোচনা" (Studies in Hegelian Dialectic)" নামক পুস্তকে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে জীব-জগতে যে ক্রমবিকাশ ঘটে তাহাতে বিনাশ (Negation) ঘটে না। সেখানে হেগেলীয় বিনাশকে (Negation) বিকাশ (Development) অর্থেই বুঝিয়া লইতে হইবে। **কিন্তু আমাদের মতে বিনাশ** (Negation) **সত্যি সত্যি ঘটে না; কাজেই "বিকাশ" অর্থে আমরা বিনাশ শব্দ কেন ব্যবহার করিব? হেগেল ও মার্ক্সের**

এখানে বিনাশ বা (Negation) শব্দ ব্যবহার করা যুক্তি-বিরুদ্ধ হইয়াছে।

বিনষ্টি (Negation) যদি না ঘটে তবে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটে? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি, "পরিবর্তন" (Change) ঘটে, বিনাশ নয়। বস্তুমাত্রই কতকগুলি উপাদান লইয়া তৈরী। যেমন 'রাম' বলিতে বা 'আপেল' বলিতে আমরা কতকগুলি গুণের সমষ্টি একটা মানুষ ও একটি ফল বুঝিয়া থাকি। রামের মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তার অর্থ এই যে রামের অন্তর্গত কতক উপাদান বা গুণ আর বিদ্যমান নাই এবং কতকগুলি গুণ বা উপাদান পূর্ববৎ বর্তমান রহিয়াছে। কোন বস্তুর আংশিক গুণ বা স্বরূপের কিছু ঘাটতি ঘটিলে তাহার সম্পূর্ণ বিনাশ হয় না। তাহার আংশিক পরিবর্তন ঘটে মাত্র। রাম কৃশ ছিল, স্থূল হইয়াছে। ইহাতে দৈহিক গুণে কিছু উপাদান বিলুপ্ত হইয়া নূতন গুণ বা উপাদানের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহার অর্থ ইহা নয় যে রামের পরিপূর্ণ বিলুপ্তি হইয়াছে। রামের পূর্ব স্বরূপ কিছু অংশে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাই তাহাকে রাম নামে আখ্যাত করি। রামের কিছু পূর্বসত্তা আছে, কিছু পূর্বসত্তা আর নাই। এই অবস্থাকে বিনাশ বলা অন্যায় ও ভুল; পরিবর্তন (Change) বলিলে ভুল হইবে না। কয়েকটি উপাদানের অবর্তমানতা ঘটিলে পরিবর্তন (Change) এবং সব উপাদানের সম্পুর্ণ বিলুপ্তি ঘটিলে বিনাশ (Negation) বলা হয়। বিনাশ (Negation) শব্দটি এখানে অপপ্রয়োগ।

এ ছাড়া এখানে আর একটা ভুল রহিয়াছে। বীজ একেবারে "না-বীজ-এ," রাম একেবারে "না-রামে" পরিণত হইতেছে, একথায় গুরুতর ভুল রহিয়াছে। এখানে বিনাশ হয় না, পূর্বেই বলিয়াছি।

: "না" শব্দটীর এখানে অপব্যবহার ঘটিয়াছে। বালক-রাম যুবক-মে পরিণত হইল। হেগেলের ও মার্কসের মতে যুবক-রাম হইল তিস্থিতি (Anti-thesis) ; এখানে 'প্রতি' (Anti) শব্দও বিরুদ্ধতার)pposition বা Negation) সূচক। কিন্তু যুবক-রাম তার র্বের সত্তার 'বিরুদ্ধ' ("Anti") হইবে কেন? বালক-রাম ও যুবক মে কোন বিরুদ্ধতা নাই। **বিখ্যাত ইতালীয় দার্শনিক ক্রোচ** Croce) **তাঁহার পুস্তক "হেগেল দর্শনের কোন্‌টুকু জীবিত ও কান্‌টুকু মৃত"-এ** (What is living and what is dead of legel) **হেগেলের এই ত্রুটী উল্লেখ করিয়াছেন।** তিনিও দখাইয়াছেন, **বিরুদ্ধতা** (Opposition) এবং **পার্থক্য বা পৃথকত্ব** Distinction) **এই দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু।** হেগেলীয় য়ালেকটীক **'বিরুদ্ধ'** (Opposite) এবং **'পৃথক'** (Distinct) **এই ইয়ের মধ্যে গোল পাকাইয়া ফেলিয়াছে।** সত্য এবং সত্য এই দুইটী সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ সত্তা বা বস্তু। ইহাদের একটি যেখানে াছে সেখানে অন্যটীর বিদ্যমানতা অসম্ভব। যাহা সত্য তাহাই সত্য হইতে পারে না। কিন্তু সত্য ও সৌন্দর্য এই দুইটি বস্তু রস্পর বিরুদ্ধ নয়—তবে এরা পৃথক বটে। হেগেল ও মার্ক্স পৃথিবীর বতীয় বস্তুর মধ্যে একই সঙ্গে বিনাশ বা বিরোধ ((Negation, Contra-iction বা Opposition) নীতির ক্রিয়া দেখাইয়াছেন। বিশ্বসংসারে সর্বত্র র পরিবর্তনের মধ্যেই এই সম্পূর্ণ বিরোধিতা বা বিনাশ (Opposition বা egation) ঘটিতেছে। ইহাই সার্বজনীন বিশ্বনীতি। ভূত, ভবিষ্যৎ ও র্তমানে **কেবল বিরুদ্ধতা, বিলুপ্তি ও বিনাশই ঘটিতেছে। এই কথেয়ে তত্ত্ব বিশ্বের সব ঘটনা ও বস্তুর তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করিতে ারে না।** পূর্বের দৃষ্টান্তে দেখা গেল পৃথিবীতে দুই প্রকারের পদার্থ বা

প্রক্রিয়া রহিয়াছে—পৃথকত্ব ও বিরুদ্ধতা। কোন বস্তুর সহিত কোন ব৺ বিরুদ্ধতার (Negation) সম্বন্ধ থাকিতেও পারে; যেমন সত্য অসত্যর মধ্যে। কিন্তু বস্তুতে বস্তুতে তাহা ব্যতীত অন্য যে সম্প রহিয়াছে তাহা বিরুদ্ধতা নয়, পৃথকত্ব (Distinctiveness) মাত্র একটী বস্তু অপর বস্তু হইতে বিভিন্ন মাত্র, যেমন সত্য ও সৌন্দর্যের মধ বিরুদ্ধতা, অসামঞ্জস্য বা শত্রুতা আমরা কল্পনা করি না। এই পৃথকত্ব ভেদও (Difference) বিশ্বের একটী তত্ত্ব বটে। কাজেই স্থিতি প্রতিস্থিতির মধ্যে কেবলমাত্র বিরুদ্ধতাকেই (Opposition) ব এর মধ্যে বিনাশকেই (Negation) এক মাত্র সত্য বলিয় নির্ধারণ করায় এই ডায়ালেকটীক একপেশে হইয়া দাঁড়াইয়াছে উইলিয়াম জেম্‌স্ (William James) নামক আমেরিকার (১ শতাব্দীর) বিখ্যাত দার্শনিকও এই বিনাশ বা বিরোধিতা তত্ত্বে বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমাদের দেশের শ্রে হেগেলীয় দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় তাঁহার বিখ্যা পুস্তক 'New Essays in criticism' এবং 'Positive Science of the Hindus'-এ হেগেলের এই অবাস্তব তত্ত্বের বিরুদে প্রতিবাদ করিয়াছেন।

তৃতীয় নীতিও (পরিমাণগত পরিবর্তন হইতে গুণগত পরিবর্তন) বৈজ্ঞানি দৃষ্টিতে সঙ্গতিশীল বলিয়া বিবেচিত হয় না। পরিমাণের ক্ষুদ্র পরিবর্তন হই ক্রমসঞ্চিত পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে এক সময় হঠাৎ গুণগত পরিবর্তন ঘটি যায়—একথা সঠিক নয়। আমরা বলিতে চাই পরিমাণ (Quantity এবং গুণ (Quality) একই সঙ্গে জড়িত হইয়া বিদ্যমান; যখন পরিমাণে ক্ষুদ্রতম পরিবর্তনও ঘটে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে গুণেরও পরিবর্তন ঘটিয়া যায় পরিমাণের পরিবর্তন অর্থই আনুষঙ্গিক গুণগত পরিবর্তন। কাজেই

[প]রিমাণগত পরিবর্তন জমিয়া জমিয়া এক সময়ে আকস্মিকভাবে গুণের [প]রিবর্তন হয়, তাহা ঠিক নয়।

এই প্রসঙ্গে জৈন দর্শনের "অনেকান্তবাদ" বা "স্যাদ্‌বাদ" নামক [ত]ত্ত্ববাদের আলোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে হেগেলীয় ডায়ালেকটিক [নী]তির সহিত জৈন ডায়ালেকটীক্‌ বা অনেকান্তনীতির কোন সাদৃশ্য নাই। [আ]মাদের দেশের কোন কোন মার্ক্সবাদীরা জৈন অনেকান্তবাদকে ভুল [বু]ঝিয়া বা স্বেচ্ছায় বিকৃত করিয়া ইহাকে মার্ক্সীয় বা হেগেলীয় ডায়ালেকটিক্‌ [নী]তির সমর্থক বলিয়া প্রচার করেন। জৈন অনেকান্তবাদ অ্যারিষ্টট্‌লের [ত]াদাত্ম্যনীতি (Law of Identity)কে বজায় রাখিয়া প্রত্যেক বস্তুই যে অপর [ব]স্তুরাজির সহিত সম্পর্কিত তাহাই প্রচার করিয়া থাকে! কোন বস্তুকে বুঝিতে [হ]ইলে, ইহা কী এবং কী নয় এই দুই তত্ত্বই বুঝিতে হইবে। 'ঘট'কে [বু]ঝিতে হইলে ঘট কি কেবল তাহাই বুঝিলে চলিবে না, ঘট যে বৃক্ষ নয়, টেবিল নয়, খাট নয়, তাহারও জ্ঞান থাকা দরকার। কিন্তু একই অর্থে, একই সময়ে কোন বস্তু হাঁ এবং না দুইই হইতে পারে না। তবে বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন দৃষ্টিতে একই বস্তু সম্বন্ধে বিরুদ্ধ কল্পনা বা বিবৃতি করা চলে। [র]াম সম্বন্ধে ভাল এবং মন্দ দুইই বলা চলে, কিন্তু একই অর্থে একই স্থানে [ব]া একই কালে নয়। যেমন রাম দৈহিক বিষয়ে ভাল হইতে পারে এবং একই সঙ্গে অন্য অর্থে—যেমন বুদ্ধির বিষয়ে ভাল নাও হইতে পারে, কিংবা একসময়ে রাম ভাল হইলেও অন্য সময়ে রাম মন্দ হইতে পারে।

এই তত্ত্বটি জৈন অনেকান্তের মূল কথা। "অনেকান্তবাদ" অর্থ এই [য]ে পৃথিবীতে কোন বস্তু বা ভাবই "একান্ত" বা Absolute নয়। প্রত্যেক [ব]স্তুই অন্য সব বস্তুর অপেক্ষা রাখে অর্থাৎ জগতের প্রত্যেকটি বস্তুই একে [অ]ন্যের সহিত এমন ভাবে জড়িত ও সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ যে কোন একটিকে বিচ্ছিন্ন ভাবে আলাদা করিয়া বুঝিবার উপায় নাই। টেবিলকে

বুঝিতে হইলে যে সব বস্তু টেবিল নয় বা না-টেবিল তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। অর্থাৎ টেবিল সম্বন্ধে পূর্ণ ও সঠিক জ্ঞ তখনই হইতে পারে যখন খাট, পালঙ্গ, চেয়ার দরজা, আল ইত্যাদি সব বস্তু হইতে টেবিলকে আমি পৃথক করিয়া চিনি লইতে পারি। যতক্ষণ এই পার্থক্যজ্ঞান না হয় ততক্ষণ বস্ স্বরূপ জ্ঞানও পূর্ণভাবে হইতে পারে না। তাই পৃথিবীর প্রত্যেক বস্ জ্ঞানের সহিত প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞান জড়িত। তাই 'হাঁ'-র জ্ঞান ও 'না'-র জ্ঞান, ইতি-বাচক ও নেতি-বাচক জ্ঞান এই দুই প্রকারের জ্ঞান সম্পর্কিত একটিকে বাদ দিয়া অপরটিকে বিভিন্ন ভাবে জানা অসম্ভব। এই মতবাদকে দার্শনিক আপেক্ষিকতাবাদ (Relativity) বলা যায়। জৈনদর্শনের অনেকান্তবাদ এই আপেক্ষিকতাবাদ বই আর কিছু নয়। হেগেলের বিনশন (Negation) এবং জৈনদর্শনের 'নাস্তি-তত্ত্ব' এক জিনিষ নয়।

এই অনেকান্তবাদ সাতটি ধাপে সম্পূর্ণ একটি যুক্তির দ্বারা এই উপরোক্ত তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই কারণে, এই যুক্তিকে "সপ্তভঙ্গী ন্যায়" বলা হইয়া থাকে।

(১) **প্রথম ভঙ্গঃ**—স্যাদ্ অস্তি এব সর্বম্ ইতি সদংশ-কল্পনা-বিভজনেন প্রথমোভঙ্গঃ। অর্থাৎ ধরিয়া লওয়া যাক "সব বস্তুই আছে"। এখানে সত্তার দিকে বা অস্তিত্বের দিককে ধরিয়া লইয়া তাহার উপরেই জোর দেওয়া হইতেছে। ইহাই প্রথম ভঙ্গ বা ধাপ। অর্থাৎ, অংশতঃ এক অর্থে (In a certain sense) একটি বিশেষ দিক হইতে "ঘট আছে" এ কথা বলা চলে।

(২) **দ্বিতীয় ভঙ্গঃ**—স্যাদ্ অস্তি এব সর্বম্ ইতি পর্যুদাস-কল্পনা-বিভজনেন দ্বিতীয়ো ভঙ্গঃ। অর্থাৎ ধরিয়া লওয়া যাক্ "সব বস্তুই নাই"। এখানে পর্যুদাস বা অস্বীকৃতির দিক বা না-থাকার দিককে ধরিয়া লইয়া

তাহার উপর জোর দেওয়া হইতেছে। ইহাই দ্বিতীয় ভঙ্গ। অর্থাৎ, অংশতঃ (partly) কোন বিশেষ অর্থে (in a certain sense) একটি বিশেষ দিক হইতে "ঘট নাই" এ কথা বলা চলে।

(৩) **তৃতীয় ভঙ্গঃ**—স্যাদ্ অস্তি এব স্যান্নাস্তি এব ইতি ক্রমেণ সদংশাসদংশ কল্পনা-বিভজনেন তৃতীয়োভঙ্গঃ। অর্থাৎ ধরিয়া লওয়া যাক্ 'আছেও বটে নাইও বটে' এখানে অস্তিত্বের দিক ও নাস্তিত্বের দিক, আছে এবং নাই এই দুই দিক কল্পনা করিয়া লইয়া দুইদিকের উপরেই সমান জোর দিলে তৃতীয় ভঙ্গ হইবে। অর্থাৎ অংশতঃ (partly) কোন বিশেষ অর্থে বস্তু আছে এবং অপর কোন বিশেষ অর্থে বস্তু নাই বলা চলে।

(৪) **চতুর্থ ভঙ্গঃ**—স্যাদ্ অব্যক্তম্ এব ইতি সমসময়ে বিধিনিষেধয়োঃ অনির্বচনীয় কল্পনা বিভজনেন চতুর্থ ভঙ্গঃ। অর্থাৎ ধরিয়া লওয়া যাক "সব বস্তুই অবক্তব্যও বটে" এখানে একই কালে Positive ও negative, বিধি ও নিষেধ, স্বীকার ও অস্বীকার এই দুই প্রকার বিপরীত উক্তির জন্য অনির্বচনীয় বলিয়া কল্পনা করাও জোর দেওয়া হইয়াছে, ইহাই চতুর্থ ভঙ্গঃ।

অর্থাৎ অংশতঃ বা কোন বিশেষ অর্থে ঘটটি অনির্বচনীয়। বাস্তবিকই এক অর্থে ঘটকে বর্ণনা করা অসম্ভব। এক অর্থে যেমন "আছে" বলা চলে তেমনি অন্য অর্থে নাই বলাও চলে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ঠিক যে একই মুহূর্তে এই বিরুদ্ধ উক্তি দ্বারা আসল বস্তুটিকে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাই বলা হইতেছে যে কোন বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ ভাষার অতীত বা অনির্বচনীয় বা অবক্তব্য।

(৫) **পঞ্চম ভঙ্গঃ**—স্যাদ্ অস্তি এব স্যাদ্ অব্যক্তব্যম্ এব ইতি বিধি প্রাধান্যেন যুগপদ বিধিনিষেধানির্বচনীয়-খ্যাপনা-কল্পনা-বিভজনেন পঞ্চমো ভঙ্গঃ। অর্থাৎ কোন একবিশেষ অর্থে ঘট আছে ইহাও বলা চলে, আবার কোন এক বিশেষ অর্থে "ঘট" অনির্বচনীয় ইহাও বলা চলে।

(৬) **ষষ্ঠ ভঙ্গ :**—স্যান্নাস্তি এব স্যাদ্ অবক্তব্যম্ এব ইতি নিষেধ প্রাধান্যেন যুগপদ নিষেধাবিধি-অনির্বচনীয়-কল্পনা-বিভজনয়া ষষ্ঠোভঙ্গঃ অর্থাৎ, কোন এক অর্থে ঘট নাই এবং কোন অপর অর্থে "ঘটটি অনির্বচনীয়" ইহাও বলা চলে।

(৭) **সপ্তম ভঙ্গ :**—স্যাদ্ অস্তি এব স্যাদ্ নাস্তি এব স্যাদ্ অব্যক্তবাম এব ইতিক্রমাৎ সদংশাসদংশ প্রাধান্য কল্পনয়া যুগপদ্ বিধিনিষেধানির্বচনীয় খ্যাপন কল্পনা বিভজনয়া চ সপ্তমোভঙ্গঃ। অর্থাৎ কোন অর্থে "ঘট আছে" অন্য কোন অর্থে ঘট নাই এবং অপর এক অর্থে ঘট অনির্বচনীয়।

উপরোক্ত সপ্তভঙ্গী ন্যায়ের তাৎপর্য এই যে একই অর্থে একই স্থানে ও কালে দুইটি বিরুদ্ধগুণের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। কিন্তু বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন স্থানে ও কালে বিরুদ্ধ সংজ্ঞা একই বস্তু সম্বন্ধে প্রয়োগ করা সম্ভব। জৈন অনেকান্তবাদ বলে যে বস্তুর সঙ্গে বস্তুর পার্থক্য আছে এবং পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে সম্বন্ধও আছে। এক অর্থে যেমনি ভেদ আছে অন্য অর্থে তেমনি অভেদও আছে। জৈন দর্শন জগদ্ব্যাপী সম্বন্ধ-জালের অস্তিত্বকে বিশেষ গুরুত্ব দান করিয়াছে। পৃথিবীতে ভেদ (Distinction) যেমন আছে তেমনি অভেদ (Relation) সম্পর্কও রহিয়াছে। জৈন দর্শনের এই তত্ত্ব সম্বন্ধে কাহারই কোন আপত্তি থাকিতে পারেনা। কিন্তু মার্ক্সীয় দর্শনের ডায়ালেকটীক যে ভাবে বিনাশ বা প্রতিস্থিতির অর্থ পরিকল্পনা করিয়াছে তাহাতে আতিশয্য দোষ ঘটিয়া এই দর্শন ত্রুটিযুক্ত হইয়াছে। হেগেলীয় দর্শন যদি ভেদাভেদ-তত্ত্বরূপে ব্যাখ্যা করা হয় তবে এই ত্রুটি থাকে না। কিন্তু মার্ক্সবাদীগণ যে অর্থে ডায়ালেকটীক ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন তাহাতে ডায়লেকটিকতত্ত্ব একপেশে হইয়া দাঁড়ায়।

জড়বাদ (Materialism)

জড়বাদ বিজ্ঞানের দ্বারা সমর্থিত হয় না। ১৮ শতকে জড়বাদের প্রাবল্য ঘটিয়াছিল। ঐ সময় লা মেট্রি (La Mettri) হেলভেসিয়াস Helvetius) প্রমুখ পণ্ডিতেরা (Encyclopedist), জড়বাদ প্রচার করিয়াছিলেন। ঐ যুগ নূতন জড়বিজ্ঞানের যুগ ও যন্ত্রের যুগ। মানুষকে, সমাজকে, প্রাণীমাত্রকে, উদ্ভিদকে,নূতন বৈজ্ঞানিকরা যন্ত্র বলিয়া মনে করিতেন। আত্মা বা মন তাহাদের কাছে স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নয়। শুধু জড় কোষগুলিরই সমবায়ের ফলমাত্র। কিন্তু ১৯ শতকের শেষ দিকে বায়লজি (Biology) নামক জীববিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে ক্রমেই বৈজ্ঞানিকদের ভুল ভাঙিতে লাগিল। জীববিজ্ঞানীরা পূর্বে মনে করিতেন, প্রাণশক্তি জড় বস্তু হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। (তাহারা বলিতেন যে কোন বস্তু পচিয়া গেলে কিছুদিনেই তাহার মধ্যে কীটশ্রেণীর উদ্ভব হয়। ইহাতেই তাহারা ধারণা করিয়াছিলেন যে জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তি হয়। এই মতকে জীববিজ্ঞানীরা জড়জবাদ (Abiogenesis) নামে আখ্যাত করিয়া থাকেন।)

কিন্তু কিছুদিনের গবেষণার ফলেই ইহা প্রমাণিত হইল (যে জড় বস্তু হইতে প্রাণশক্তির উৎপত্তি কোন সময়েই হয় না।) জীববিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন যে বাতাসে জীবন্ত ও সূক্ষ্ম বীজাণু রহিয়াছে। এই সব বীজাণু পচা (Putrefied) বস্তু হইতে খাদ্য-গ্রহণ করিয়া কীটরূপে আবির্ভূত হয়। আসলে বায়ু-নিরুদ্ধ আঁধারের মধ্যে মৃতদেহ বা পচাবস্তু হইতে কোন কালেই জীবন্ত কীটের উদ্ভব হয় না। পাস্তুর (Louis Pasteur) ফরাসীদেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। তিনি উনবিংশ শতকে জড়বাদকে সর্বশেষ আঘাত দিলেন। তাহার জীববৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কার প্রমাণিত করিল যে প্রাণ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি হয় (Life out of Life) অর্থাৎ প্রাণজবাদ (Biogenesis) নামক মতবাদই সত্য।

মানুষ এখন পর্যন্ত জগতের সমস্ত রহস্যভেদ করিতে পারে নাই মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ ও অসম্পূর্ণ। কাজেই যে যুগে মানুষের জ্ঞান ও বিজ্ঞান যতটুকু রহস্য ভেদ করিতে পারিয়াছে ততটুকু সত্যকে সম্বল করিয়াই সেই যুগে মানুষকে চলিতে হয়। মানুষের অভিজ্ঞতা (Experience) যুক্তি ও পরীক্ষা—এই তিনটি উপায়ে যে সত্য সমর্থিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সত্যই সেই যুগের বৈজ্ঞানিক সত্য। কাজেই **বর্তমান জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে যে সত্য পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জড়বস্তু হইতে প্রাণের উৎপত্তির সমর্থন পাওয়া যায় না।**

মানুষের অভিজ্ঞতায় কখনও দেখা যায় নাই যে অতীত কালে বা বর্তমানে পৃথিবীতে জড় হইতে প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে যাহারা এ কথা বলেন, তাহারা মানুষের যুগান্তব্যাপী অভিজ্ঞতা হইতে এ সম্বন্ধে কোন নজীর দেখাইতে পারিবেন না।

দ্বিতীয়তঃ পাস্তর প্রমুখ জীববিজ্ঞানীদের পরীক্ষায়ও জড়বাদের সমর্থন মিলে নাই এবং প্রাণ হইতে প্রাণের উৎপত্তির প্রস্তাবই অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা দুই দ্বারাই সমর্থিত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, যুক্তির দ্বারাও জড়বাদ সমর্থিত হয় না। জড়বাদী বলেন যে অজ্ঞাত অতীতকালে কোন এক বিশেষ মুহূর্তে পৃথিবীর বিশেষ কোন অবস্থায় একদা মাত্র জড় হইতে প্রাণের উদ্ভব ঘটিয়াছিল। এখন বর্তমান কালে কেন কোথাও জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তি হয়না তাহা প্রশ্ন করিলে জড়বাদী বলেন, এখন প্রাণ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি হইতে পারে কাজেই এখন আর জড় হইতে প্রাণের উদ্ভবের প্রয়োজন নাই; তাই আমাদের অভিজ্ঞতায় এখন এমন ঘটনা ঘটেনা।) কিন্তু প্রকৃতির সম্বন্ধে বিজ্ঞানের প্রথম আবিষ্কার হইল এই যে প্রকৃতির নিয়মগুলি চিরন্তন ও শাশ্বত প্রাকৃতিক বিধানের কোন সময়ে কোন ব্যতিক্রম হয় না, তাহারা

চিরকাল একই ভাবে অব্যর্থরূপে কাজ করিয়া যায়। কাজেই পৃথিবীতে কয়েক লক্ষ বছর পূর্বে কোন এক বিশেষ মুহূর্তে কিছুক্ষণের জন্য জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছিল, একথা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী। কিছুক্ষণের জন্য জড় হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয় এবং তাহার পর ঐ নিয়ম নাকচ হইয়া যায় একথা হাস্যকর। প্রকৃতি খামখেয়ালী ও উচ্ছৃঙ্খল নয় ইহাই বিজ্ঞানের ভিত্তি। কাজেই জড়বাদের এই উক্তি নিতান্ত অযৌক্তিক ও বিজ্ঞান-বিরোধী গোঁজামিল মাত্র।

এই কারণে জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তি জীব-বিজ্ঞানীরা আজকাল সমর্থন করেন না। স্বার্থ বা ব্যক্তিগত রুচির জন্য কোন কোন বিজ্ঞানী এখনও জড়বাদকে মানিয়া লইয়াই চলিয়াছেন। কিন্তু **ডারুইন, বের্গস, পাস্তুর, ড্রিস, জে, এস্, হ্যালডেন, জে, এ, টম্সন্ (Darwin, Bergson, Pasteur, Driesch, J. S. Haldane, J. A. Thompson) প্রমুখ জীব-বিজ্ঞানীরা আজ জড়বাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলিয়াছেন। তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন যে প্রাণশক্তি জগতের ও সৃষ্টির একটী মৌলিক ও আদিম শক্তি।** তাহার নিত্য নূতন পথে নব নব রূপে ক্রমবিকাশ হইতেছে। এই ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরে নানা উদ্ভিদ, নানা শ্রেণীর প্রাণী, জীবজন্তু ও মানব আবির্ভূত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া বের্গসঁ৷ তাঁহার অতুলনীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও দার্শনিক মনীষা দ্বারা বর্তমান যুগে জড়বাদকে খণ্ডন করিয়া প্রাণশক্তির জটিল সৃষ্টিশক্তিকে জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার বইগুলি (Creative Evolution, Matter and Memory ইত্যাদি) বর্তমান জগতে বিজ্ঞানের ও দর্শনের স্তম্ভস্বরূপ। প্রাণশক্তিকে তিনি Elan Vital আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার মতে এই Elan Vital আপন অন্তর্নিহিত শক্তির উচ্ছ্বাসে

আপনাকে নানা সৃজনের মধ্য দিয়া বিচিত্ররূপে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে। তাই এই ক্রমবিকাশ সৃজনপর (Creative Evolution)। এই ক্রমবিকাশের একটি বিশেষ স্তরে জড়বস্তু দেখা দেয়।

তবু বর্তমান কালেও ক্রাউথার (Crowther) ও জে, বি, এস, হ্যালডেন (J. B. S. Haldane) প্রমুখ লেখকেরা জড় হইতে প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ ধরিয়া লইয়াই চলিতে চাহেন। তাহারা বলিতে চাহেন যে প্রমাণ করিতে না পারিলেও বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুবিধার জন্য জড়বাদী ও যান্ত্রিকনীতিকে স্বীকার করিয়া লওয়া সঙ্গত। জড় হইতে প্রাকৃতিক নিয়মে ও কার্যকারণ শৃঙ্খলার অব্যর্থ পরিণামে প্রাণ ও মন উৎপন্ন হইয়াছে। এই পদ্ধতিকে (Mechanistic Theory) অনুসরণ করিয়াই বিজ্ঞানীদের চলা উচিত, নতুবা গবেষণা ও পরীক্ষা চালাইবার কোন সুবিধা বা কারণ থাকে না।

যান্ত্রিক জড়বাদ (Mechanistic materialism)

কিন্তু ইহারাও জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্তমানের বিজ্ঞানের যে গভীর অজ্ঞতা রহিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। জড়বাদী জে, বি, এস, হ্যালডেন (J. B. S. Haldane) ও স্বীকার করিয়াছেন যে বৈজ্ঞানিক গবেষণাতেও কেবল মাত্র যান্ত্রিক পদ্ধতিকে স্বীকার করিয়াই বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলিতে পারে না, বরং প্রাণশক্তির সামঞ্জস্য-বিধায়িনী শক্তিকে (Harmonising power) স্বীকার করিয়াই বিজ্ঞানের গবেষণা ও পরীক্ষা আজকাল সম্ভব হয়। হ্যালডেনের উক্তিতে তাই পাই—* "কারণ সামান্য কিছু দূর অগ্রসর হলেই দেখা যাবে যে মতামতে কেউ কঠোর যযান্ত্রিকতাবাদী হলেও কার্যতঃ অন্য আরেকটি নীতি গ্রহণ না করলে চলেই না।"

* 'For when one gets a little further one finds that even if one is a rigid mechanist in theory, in practice one needs another principle.' (J. B. S. Haldane)

প্রাণীদেহ কেবলই যন্ত্রমাত্র নয়, কেবলমাত্র জড় (Matter) এবং গতির (Motion) যান্ত্রিক ও অন্ধগতির প্রতিঘাতের ফল বলিয়া প্রাণীদেহকে বুঝিতে চেষ্টা করিলে বিফল হইতে হইবে। হ্যালডেন (Haldane) বলিতেছেন— "জীবদেহ শুধু যন্ত্রই নয়, যন্ত্র বা মেশিনের থেকেও অতিরিক্ত কিছু।"†

ক্রাউথার (Crowther) অনুমান করিতেছেন যে কোলয়ড (Colloid) যে নীতিতে গঠিত হয় সেই নীতিতেই কোলয়ড হইতে প্রাণ-কণিকা হয়তঃ একদা সৃষ্টি হইয়াছিল। তবে কিরূপে হইয়াছিল এ প্রশ্নের জবাবে 'জানিনা' একথা ছাড়া অন্য জবাব দিতে পারেন নাই। ক্রাউথারের ভাষায়— ‡ "কোলোয়ড থেকে যে কি করিয়া কোন কোন ধাপে পার হইয়া যে প্রাণ-কণিকা বিবর্তিত হইয়া উঠিল তাহা আজও অজ্ঞাত।"

এইরূপে বীজানু (Bacteria) লইয়াও এই দল খুব আন্দোলন করিতেছেন। কিন্তু ক্রাউথারই বিজ্ঞানের অজ্ঞতা স্বীকার করিয়া বলিতেছেন যে, কি ভাবে যে জীবাণু জটিল পদার্থ নিঃসরণ করিয়া নানা বিচিত্র রাসায়নিক প্রক্রিয়ার খেলা দেখায় তাহা রসায়ন শাস্ত্রের অজ্ঞাত। "ব্যাক্‌টেরিয়া বা জীবানু জারক-রসগুলির মধ্যে যে সব জটিলবস্তু নিঃসারণ করিয়া দেয় তাহা রাসায়নিক ক্রিয়ায় প্রস্তুত করিবার দিন আজো বহু দূর।"¶

---

† 'Organism is something more than a machine.'

‡ "The exact steps of evolution from colloid to living particle are not yet known........."

¶ "Chemists are far from able to make the complicated substances bacteria exude into fermenting juices."

এক কথায় রসায়ন বিজ্ঞান যে তিমিরে সে তিমিরেই আছে। ১৮ শতকে যে যান্ত্রিক জড়বাদ অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া সৃষ্টি-রহস্যকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল, বিংশ শতকের বিজ্ঞানের আজ সেই গর্ব ধূলিসাৎ হইয়াছে। **অধিকাংশ বিজ্ঞানী প্রাণবাদকে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানী আজও সংস্কার ও গর্বকে ছাড়িতে না পারিয়া এখনও জড়বাদ ও যন্ত্রবাদকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছেন।**

জড়বাদীরা আর একটি যুক্তি দিয়া থাকেন ভূতত্ত্ব হইতে। পৃথিবী এক সময় জ্বলন্ত বাষ্পময় ছিল। তখন পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। তারপর পৃথিবী কিছু শীতল হইলে অনুকূল আবহাওয়ায় এক সময় প্রথম প্রথম কণিকা উদ্ভূত হয়। ইহাতেই জড়বাদীদের মতে প্রমাণ হয় যে আগে জড় পৃথিবী এবং পরে পৃথিবীতে সূক্ষ্ম আকারে প্রাণের উৎপত্তি হয়। আগে জড় বস্তু, পরে প্রাণশক্তি। জড়বাদীদের এই যুক্তির কোন সঙ্গত ভিত্তি নাই। অতি আদিমকালে যখন জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র ছিলনা, তখন কি প্রকারে কোন্ পথে প্রথম প্রাণ-কণিকার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, তাহা আজ জানিবার উপায় নাই। শুধু কল্পনা ও অনুমান করা চলে কিন্তু পরীক্ষামূলক প্রমাণ দিবার পথ নাই। যুক্তির সাহায্যে ও বর্তমান বিজ্ঞানের আলোকে সর্বাপেক্ষা অধিক সঙ্গত মতবাদকেই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে।

ভূতত্ত্ব (Geological)

প্রাণের শক্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা গঠিত হইয়াছে এই পৃথিবীর বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে। এই পৃথিবীতে আমরা যত প্রকার প্রাণী দেখিয়াছি এবং প্রাণীদের যে প্রকার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছি তাহা হইতেই অনুমান করিয়া লইয়াছি প্রাণের ধর্ম ও

বিশেষত্ব কি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অগণিত তারা, নক্ষত্র ও লোকলোকান্তরের মধ্যে আমাদের পৃথিবী একটি নগণ্য ধূলিকণামাত্র। অপর কোন লোক সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। কেবল এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর অভিজ্ঞতা হইতে আহরণ করিয়া যে জ্ঞান সঞ্চিত হইয়াছে তাহাই সম্বল করিয়া প্রাণ সম্বন্ধে চরমতত্ত্ব জানিবার দাবী করা অযৌক্তিক। পৃথিবীতে আমরা জড়বস্তুর সহিত অসম্পর্কিত স্বতন্ত্রভাবে কোন প্রাণের প্রকাশ দেখি না। যেখানেই প্রাণ আছে সেখানেই স্থূল দেহও আছে। দেহ ব্যতীত কোন প্রাণ আমাদের চোখে পড়ে না। প্রাণকে আত্মপ্রকাশ করিতে হইলে কোন না কোন উপযুক্ত আধার বা আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইতে হয়। হয় উদ্ভিদ-দেহ, নতুবা জন্তুদেহ, কিংবা মানবদেহ—কোন না কোন স্থূল আশ্রয়ের সহিত জড়িত হইয়া প্রাণ প্রকাশিত হয়। এই পৃথিবীর অভিজ্ঞতা হইতে ইহাই আমরা জানিতে পাই। (কাজেই যতদিন পৃথিবীতে যোগ্য আধার গঠিত হইবার উপায় ছিল না ততদিন প্রাণেরও প্রকাশিত হইবার উপায় ছিল না।) ল জীবদেহ গঠিত হইয়াছে পৃথিবীর কোন এক বিশেষ অবস্থায়। হা ধরিয়া লইলে প্রাণশক্তিও সেই বিশেষ অবস্থায় প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। তাহার পূর্বে আমরা বর্তমান আকারে ও রূপে প্রাণশক্তির প্রকাশ দেখি নাই। যেমন রেডিও যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে আমরা রেডিও তরঙ্গের অস্তিত্ব জানিতাম না। কিন্তু রেডিও তরঙ্গ পূর্বেও ছিল, কেবল উপযুক্ত যন্ত্রের (Apparatus) অভাবে সেই তরঙ্গের কোন বাহ্য অভিব্যক্তি আমরা দেখিতাম না। ইহা হইতে একথা প্রমাণ হয় না যে পূর্বে রেডিও তরঙ্গ বিদ্যমান ছিল না। আমরা যুক্তিসঙ্গতভাবে শুধু এইমাত্র বলিতে পারি যে যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে আমাদের ইন্দ্রিয়ে ঐ তরঙ্গের সূক্ষ্ম অস্তিত্ব ধরা পড়ে নাই। সেইরূপ

জড় উপাদানের একটা বিশেষ অবস্থায় যখন স্থূল জীবদেহ গঠিত হওয়া সম্ভব হইল তখনই সেই দেহকে আশ্রয় করিয়া প্রাণশক্তি আত্মপ্রকা‍শ করিল। ইহার পূর্বেও ছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে ভিন্ন স্বরূপে ও ভি‍ প্রকৃতিতে। প্রকাশ ছিল না এই কারণে তাহার অস্তিত্বও ছিলনা, ‍ যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রকাশ এবং অস্তিত্ব এই দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু অস্তিত্ব থাকিলেও প্রকাশ না থাকিতে পারে, কিন্তু প্রকাশ থাকি‍লে আমরা অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়া থাকি। এই কারণে এক সম‍ বর্তমান আকারে ও দেহে প্রাণের প্রকাশ না থাকিলেও প্রাণের অস্তিত্ব ছিল মানুষের ইন্দ্রিয় গোচর না হইয়াও। বিশেষতঃ বর্তমান বিজ্ঞানের পরীক্ষায় জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তি (জড়জবাদ—Abiogenesis) হয় না বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। যাহা প্রমাণিত হইয়াছে তাহাকেই ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিব? না যাহা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রত্যাখ্যাত ‍ ত্যক্ত হইয়াছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই অতীত সম্বন্ধে সিদ্ধা‍ন্ত গ্রহণ করিব? আমাদের মতে বর্তমানে স্বীকৃত ও গৃহীত প্রাণজবা‍দ (Biogenesis) তত্ত্বের উপরেই অতীত ইতিহাসও গঠিত হওয়া উচিত যাহা প্রকৃতিতে আজ ঘটিতেছে তাহা পূর্বেও ঘটিয়াছে। জড় হই‍তে প্রাণ উৎপন্ন অতীতে হইলে বর্তমানেও হইত। অতীতে কেবল বিশে‍ষ এক সময়ে জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু তাহা এখন আ‍র হয় না, একথা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। **কাজেই পৃথিবীর উত্তপ্ত অবস্থায়‍ও প্রাণ কূটস্থ অবস্থায় বিদ্যমান ছিল এই সিদ্ধান্তই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত।**

জড়বিজ্ঞানীরা ১৯শতক পর্যন্ত জড়বাদ ও যান্ত্রিক মতবাদেরই সমর্থক ছিল। **কিন্তু জড়-বিজ্ঞান অর্থাৎ রসায়নবিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান বর্তমানে যে স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাতে জড়বাদ আজ**

বৈজ্ঞানিকদের দ্বারাও সমর্থিত হওয়া মুস্কিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পদার্থ বিজ্ঞান (Physics)

বর্তমান বিজ্ঞানের সেরা বিজ্ঞান-শাস্ত্র (Physics) আজ জড় বস্তুকে একটা অজ্ঞাত ও দুর্বোধ্য পদার্থে পরিণত করিয়াছে। বর্তমান পদার্থ-বিজ্ঞান ও (Physics) আজ জড়বাদকে সমর্থন করে না। ইহা বড় বড় বৈজ্ঞানিক মহারথী, যথা—এডিংটন (Eddington) হোয়াইটহেড, (Whitehead) জেমস জীনস (James Jeans), বাট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russel), ওলিভার লজ (Oliver Lodge), ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক (Max Planck), আয়েনষ্টাইন (Einstein) প্রমুখগণ বলিতেছেন। পদার্থ বিদ্যার আধুনিক পরিণতি এই হইয়াছে যে জড়ভূত বা Matter স্থূল ওজনদার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভারী পদার্থ আর নয়। জড়ভূত বা Matterকে বিশ্লেষণ করিয়া বিজ্ঞানীরা দেখিতেছেন পৃথিবীর উপাদান জড়ভূত (Matter) আর জড়পদার্থ নয়। জড়ভূত (Matter) সূক্ষ্ম শক্তির পূঞ্জীভূত বাহ্যরূপ মাত্র। ইলেকট্রন, প্রোটন (Electron, Proton) এই দুই প্রকারের বৈদ্যুতিক শক্তি আমাদের কাছে জড়বস্তুর রূপ ধরিয়া দেখা দিতেছে। ১৯১১ সাল হইতে এই ইলেকট্রন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া বিজ্ঞান জগতে বিপ্লব সাধন করিয়াছে। তাই পূর্বোক্ত বিজ্ঞানের মহারথীদের মধ্যে এডিংটন, হোয়াইট-হেড, জীন্‌স্ ইত্যাদি বলিতেছেন যে (বিশ্বজগতের আড়ালে এক সর্বব্যাপী মহামন রহিয়াছে যাহার চেতনা ও শক্তি সৃষ্টিরূপেই প্রকাশিত হইতেছে। এমন কি যুক্তিবাদী রাসেল পর্যন্ত বলিতেছেন যে জড়বাদের মৃত্যু হইয়াছে।) তাঁহার মতে বিশ্বসংসারের আড়ালে এমন এক সত্তা আছে যাহার দুইদিক হইল জড় এবং চৈতন্য। একই সত্তা একদিক হইতে জড় এবং অন্যদিক হইতে মন বলিয়া প্রতিভাত হয়। এ বিষয়ে সকলেই একমত যে জড়বাদ আজ বিজ্ঞানের দ্বারা সমর্থিত হইতেছে না।

আসল কথা বিজ্ঞানের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। মানুষের ইন্দ্রিয়ের জ্ঞা যতদূর পর্যন্ত যায় তাহা হইতে অনেক দূর বিজ্ঞান তাহার যন্ত্রপাতিস যাইতে পারে না। বিজ্ঞানের মূলনীতি হইল কার্যকারণবাদ বা Causality এই মূলনীতিও আজ নববিজ্ঞানের আলোকে ত্রুটিযুক্ত হইয়া দেখা দিয়াছে। অনিশ্চয়তাবাদ বা Theory of Indeterminism আসিয় বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতাকে প্রমাণ করিয়াছে। তাহার পর Theory relativity বা আপেক্ষিকতাবাদ আবিষ্কার করিয়া বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞা আইনষ্টাইন জড়বাদ ও সনাতন প্রাকৃতিক নিয়মের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন।

মার্ক্সের দ্বান্দ্বিক জড়বাদ জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তির এক সমাধান দিয়াছে এবং পূর্ববর্তী যান্ত্রিক জড়বাদ (Mechanistic Materi lism) হইতে ইহা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া দাবী করিয়াছে। কি **যদিও মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ দাবী করেন যে তাঁহাদের দ্বান্দ্বি জড়বাদ প্রকৃতপক্ষে নূতন ও যান্ত্রিক জড়বাদ হইতে পৃথ তবুও বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় এই মার্ক্সীয় জড়বাদও যান্ত্রি জড়বাদেরই নামান্তর মাত্র।** জড় হইতে প্রাণ ও মনের উৎপত্তি হ এ' কথা এই উভয় সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন। তবে যান্ত্রিক জড়বাদী মতে জড় হইতে বিশেষ একটা সমাবেশের জন্য স্বভাবতঃই ও অব্যর্থরূ কার্যকারণ প্রভাবে প্রাণের উৎপত্তি হয়। অপরপক্ষে মার্ক্সীয় জড়বাদী মতে, জড় হইতে ডায়লেক্‌টীক্ নীতি অনুসারে উচ্চতর একটা সমন্বয় Synthesis হিসাবে প্রাণের উৎপত্তি হয়। মার্ক্সবাদী বলেন, প্রাণ ও ম উভয়ই একটা উচ্চতর আবির্ভাব মাত্র; অর্থাৎ জড়ের সমবায়ে পরিবর্ত হইতে হইতে কোন এক স্তরে প্রাণ ও মন অকস্মাৎ সম্পূর্ণ নূতন বস্তুরূ উদ্ভূত হয়। মার্ক্সবাদীর এই ডায়ালেক্‌টিক নীতি বস্তুতঃ জড় হইতে প্রাণে

আবির্ভাবকে ব্যাখ্যা করিতে বা বুঝিতে সহায়তা করেনা। একটা উচ্চতর আবির্ভাব বা একটা আকস্মিক বিপ্লব বা একটা আমূল পরিবর্তন বলিলেই প্রাণের জন্ম-রহস্য উদ্‌ঘাটন করা হইল না।) সমস্যা সমস্যাই থাকিয়া গেল। আসল প্রশ্ন হইতেছে, জড় হইতে কিরূপে প্রাণের উদ্ভব হইল? এই প্রশ্নের কোনই সমাধান মার্ক্সীয় সূত্র বা Formula দ্বারা হইল না। বরং যান্ত্রিক জড়বাদ কারণিকবাদের (Law of Causality) উপর দাঁড়াইয়া আছে এবং এই কারণে অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত। কিন্তু মার্ক্সীয় মতবাদ বিজ্ঞানের কারণিকতার (Causality) বিরোধী। ডায়লেক্‌টিক্‌ নীতির সহিত কারণিকতা (Causality) নীতির সামঞ্জস্য হয় না। একটিকে মানিলে অপরটিকে অগ্রাহ্য করিতে হয়। বিজ্ঞানের কারণিকতা নীতি বলে যে, কারণই কার্যরূপে আবির্ভূত হয়। কার্যের (effect) ভিতরেই এমন কোন কিছু নাই যাহা কারণের মধ্যে উপস্থিত ছিল না। যাহা কারণের মধ্যে ছিল তাহাই কার্যরূপে দেখা দিয়াছে। বীজের মধ্যে যাহা ছিল তাহাই গাছরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীতে শক্তির সমষ্টি সর্বদাই একই প্রকার থাকে, পরিমাণ কখনও কম কখনও বেশী হইতে পারে না। শক্তির নিত্য সংরক্ষণ (Conservation of Energy) বিজ্ঞানের একটি মূল মন্ত্র। একই শক্তির রূপ হইতে রূপান্তর হয় মাত্র। এই নীতি অনুসারে একেবারে সম্পূর্ণ নূতন কোন বস্তুর আবির্ভাব সম্ভব হয় না। জড় হইতে জড়ের সমবায়ে প্রাণের উৎপত্তি যদি সম্ভব হয় তবে বুঝিতে হইবে যে প্রাণ জড়েরই একটা রূপান্তর মাত্র। (জড়ের সমস্ত উপাদান বা factor গুলি একত্র সমাবেশ করিলে প্রাণের উৎপত্তি হইতে বাধ্য।) এই নীতিতে জড় জগতের বিধানই প্রাণের জগতেও কার্যকরী হইবে এবং যান্ত্রিক উপায়ে অব্যর্থভাবে জড় হইতে প্রাণ সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে। ডায়ালেকটীক নীতি অনুযায়ী প্রাণ জড় হইতে উৎপন্ন হইলেও জড় হইতে উচ্চতর একটা

আবির্ভাব। স্থিতি (Thesis) ও প্রতিস্থিতি (Antithesis) হইতে যখন সমন্বিত-স্থিতি (Synthesis) আবিভূ'ত হয় তখন সংস্থিতির (Synthesis) মধ্যে নূতন গুণের উৎপত্তি হয়। এইসব নূতন গুণ আসিল কোথা হইতে? মার্ক্সবাদী বলিবে, কোথা হইতে আসিল জানিনা কিন্তু পূর্বে য ছিল না এমন কিছু নূতন আবির্ভাব সর্বদাই ঘটিতেছে। এই নূতন ও অজ্ঞেয় আবির্ভাব বিজ্ঞানের যান্ত্রিক কারণিকতা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। অথচ ডায়ালেকটীক নীতিও এই সব আবির্ভাবকে ব্যাখ্যা না করিয়া শুধু স্বীকার করিয়া ও বর্ণনা করিয়াই খালাস। মার্ক্সবাদী বিজ্ঞানের যান্ত্রিক কার্যকারণবাদকেও গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক অথচ আবার জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তি বিজ্ঞান একদিন প্রমাণ করিবে বলিয়া ঘোষণাও করিতেছেন। আসলে জড়বাদ যান্ত্রিক হইতে বাধ্য। এঙ্গেল্‌স্ মার্কসবাদকে যে ভাবে "ডুয়েরিং-বিরোধী" (Anti-Duhring) নামক পুস্তকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে দ্বান্দ্বিক জড়বাদ যান্ত্রিক জড়বাদেই পরিণত হইয়াছে। সর্বশেষে দার্শনিক যুক্তিতেও জড়বাদ ভিত্তিহীন বলিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণ জড়বাদকে খণ্ডন করিয়াছেন। জড় বা Matter কাহাকে বলে? জড়ের সংজ্ঞা নির্ণয় করিতে কোন জড়বাদী পারেন নাই। যুগে যুগে জড়ভূতের স্বরূপ পরিবর্তন হইয়া আজ বিজ্ঞান এমন এক স্থানে আসিয়াছে যাহাতে জড়বস্তুর লক্ষণ বর্ণনা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

ইতিহাসের জড়বাদী বা আর্থিক ব্যাখ্যা (১)

(Materialistic Interpretation of History)

(মার্ক্সীয় দর্শন দ্বান্দ্বিক জড়বাদকে মানবসমাজের ব্যাপারে প্রয়োগ করিয়া মানবসভ্যতাকে ব্যাখ্যা করিয়াছে।) এই ব্যাখ্যাকে "ইতিহাসের জড়বাদীয় ব্যাখ্যা" বলা হয়। ইহাকে ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যাও বলা হইয়া থাকে। মানুষের ইতিহাসকে জড়বাদের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করায় এই তত্ত্বকে "ঐতিহাসিক জড়বাদ" বা "Historical Materialism"ও বলে।

এই মতানুসারে সমাজে বা ইতিহাসে যাহা কিছু ঘটে তাহা জড়শক্তি ও আর্থিক পারিপার্শ্বিকের দ্বারা সৃষ্ট হয়। ব্যক্তি বা মানুষের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। মানুষ যুগে যুগে যাহা কিছু করিয়াছে, যে ধর্ম, বিবাহ প্রথা, শিল্প, ইত্যাদি অর্থাৎ এক কথায়, যে সভ্যতা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা সব কিছুই জড় পারিপার্শ্বিক (Material environment বা Economic environment) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া করিয়াছে।

যে যুগে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যে স্তরে থাকে, সেই যুগে সমাজের জীবন এবং ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, বিবাহ-প্রথা অর্থাৎ সভ্যতাও সেই স্তরের অনুরূপ স্তরে থাকে।

মানুষের ইতিহাসের কয়েকটি স্তর বা যুগ দেখিতে পাই। (১) আদিমযুগ (২) প্রাচীন দাস-যুগ (৩) মধ্যযুগ (৪) আধুনিকযুগ। এইসব যুগে অর্থনৈতিক অবস্থাও যুগানুযায়ী ছিল। যথা—আদিমযুগে ছিল সাধারণ সম্পত্তি

বা কম্যুনিজ্‌ম্। প্রাচীনযুগ ছিল দাসপ্রথা (Slavery) ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির, মধ্যযুগ সামন্ততন্ত্রবাদ বা Feudalism-এর এবং আধুনিকযুগ পুঁজিবাদ বা Capitalism-এর। ভবিষ্যৎ যুগে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিনষ্ট হইবে এবং আবার কম্যুনিজ্‌ম্ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

একযুগ হইতে যখন অন্য অর্থনৈতিকযুগে পরিবর্তন ঘটে তখনই সমাজ-বিপ্লবও ঘটে। সমস্ত সমাজ-জীবনকে রূপদান করে সেই সমাজের অর্থনীতি। প্রত্যেক যুগের সংস্কৃতির রূপ, গুণ ও প্রকৃতি নির্ভর করে সেই যুগের অর্থনৈতিক স্তরের উপর। (কোন যুগের অর্থনীতির স্তরের পরিবর্তন ঘটিলে সেই যুগের সংস্কৃতিরও পরিবর্তন ঘটে। অর্থনীতি হইল কারণ এবং সংস্কৃতি (Culture) হইল তাহার কার্য বা ফল।) (অর্থনীতির সহিত সংস্কৃতির ও সমাজ-জীবনের এই কার্য-কারণ সম্বন্ধই মার্ক্সীয় সমাজ-তত্ত্বের ভিত্তি। অর্থনীতিতে কোন পরিবর্তন ঘটিলে সংস্কৃতিতে ও সমাজজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটিতে বাধ্য।) এই মতবাদকে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদও (Economic determinism) বলা হইয়া থাকে।

সমাজ-বিপ্লবও এই অর্থনীতি হইতেই উদ্ভূত হয়। কোন একযুগে অর্থনৈতিক শক্তি বা উৎপাদন শক্তি (Productive forces) অনুসারে মানুষে মানুষে সেই যুগের উৎপাদন-সম্বন্ধ (Productive Relation) স্থাপিত হয়। এই উৎপাদন-সম্বন্ধ অনুসারেই তদনুযায়ী সামাজিক-সম্পর্ক (Social relation) মানুষে মানুষে স্থাপিত হয়। এই সামাজিক-সম্বন্ধ বলিতে ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প, রাষ্ট্র ইত্যাদিকে বুঝায়। অর্থাৎ, উৎপাদন-সম্বন্ধ অনুসারে সামাজিক-সম্বন্ধ বা সাংস্কৃতিক-সম্বন্ধ (Culture relation) স্থাপিত হয়।

অর্থনৈতিক শক্তি-সম্পদের মধ্যে যদি কোন পরিবর্তন হয় তখন নূতন উৎপাদন-সম্বন্ধ বা Productive relation স্থাপিত হয়। এই নূতন

উৎপাদন-সম্পর্কের যোগ্য নূতন সামাজিক-সম্বন্ধগুলি স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কিন্তু নূতন সামাজিক-সম্বন্ধ বা সংস্কৃতি সহজে গঠিত হয় না। পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থাই চলিতে থাকে। এদিকে নূতন অর্থনৈতিক শক্তির আবির্ভাব হওয়ায় সেই নবাগত অর্থনীতির সহিত পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা খাপ খায় না, উভয়ের মধ্যে একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সংঘর্ষের ফলে পুরানো সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া যাইতে বাধ্য হয়। ধীরে ধীরে সামাজিক-সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে নূতন অর্থশক্তির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া। আর একটি কথা লক্ষ্য করিবার আছে যে সমাজের এই সংঘর্ষ ও সামাজিক-বিপ্লব মানুষের মধ্য দিয়া মানুষ কর্তৃক সংগঠিত হয়। নূতন অর্থশক্তি প্রথমতঃ কতকগুলি লোক কর্তৃক সৃষ্ট হয়। এই নূতন অর্থশক্তির প্রতিনিধি যে শ্রেণী তাহারা নূতন অর্থশক্তির বিকাশের জন্য নূতন সমাজ-ব্যবস্থার প্রয়োজন বোধ করে।) (অপর পক্ষে পুরাতন অর্থশক্তির প্রতিনিধি পুরাতন শ্রেণীগুলি পুরাতন শ্রেণীগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়।) এই দুই বিরোধী শ্রেণী-স্বার্থের সংঘর্ষকে মার্ক্স নাম দিয়াছেন শ্রেণী-সংগ্রাম (Class Struggle)। এই সংঘর্ষের ফলেই পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিয়া নূতন শ্রেণী নূতন সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করে। এইরূপে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে সমাজ-বিপ্লব ঘটে। ইহাকে ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা (Economic Interpretation of History) বলা হইয়া থাকে।

এই কারণে সামন্ততন্ত্র (Feudalism) নামক অর্থনৈতিক স্তর পূর্ববর্তী "আদিম কম্যুনিজ্‌ম্" (Primitive Communism) নামক স্তরকে ধ্বংস করিয়া আবির্ভূত হয়। আবার সামন্ততন্ত্রের মধ্যে নূতন অর্থনৈতিক শক্তি অর্থাৎ নবাবিষ্কৃত বাষ্পশক্তি (Steam power) যখন সৃষ্টি হইল তখন পূর্ববর্তী উৎপাদন-সম্পর্ক (Productive Relation) ও সামাজিক-সম্পর্ক (Social Relation), এক কথায়, পূর্ববর্তী সমাজ-

ব্যবস্থা নূতন অর্থশক্তির বা বাষ্পশক্তির কার্যকারিত্বের সহায়ক না হইয়া পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইল। ফলে পূর্বতন "গিল্ড" বা শিল্পসমিতি-ব্যবস্থা (Guild system) ও সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসের উপর নূতন সমাজ গড়িবার প্রয়োজন হইল। পূর্বসমাজের প্রতিনিধি শ্রেণী হইল সামন্তরাজাদের (Feudal chiefs) শ্রেণী। আর নবজাত বাষ্পশক্তির ব্যবহার-কারক নূতন শ্রেণী হইল নব-উদ্ভূত ধনিক শ্রেণী (Capitalist) বা বুর্জোয়া শ্রেণী (Bourgeois)। তাই বুর্জোয়া পুঁজিবাদীশ্রেণী পূর্বতন সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত নূতন সমাজ-ব্যবস্থা গড়িবার দাবী করিল সামন্তশ্রেণী এবং বুর্জোয়া ধনিকশ্রেণীর এই সংগ্রামে বুর্জোয়ারা জয়ী হইয়া ধনিকতন্ত্রের সহায়ক নূতন সমাজ ও সংস্কৃতি সৃষ্টি করিল। বর্তমান যুগ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির যুগ, তাই এই যুগের সংস্কৃতিও ধনতান্ত্রিক ; ইহার পর ধনতন্ত্রের ভিতর আবার নূতন অর্থশক্তি ও নূতন শ্রেণী (Proletarian বা সর্বহারা) সৃষ্টি হইবে। এই নূতন শ্রেণী নূতন সমাজ-ব্যবস্থা দাবী করিবে। (ফলে ধনিক ও শ্রমিকের শ্রেণীসংগ্রামে শ্রমিকেরাই জয়ী হইবে এবং পুঁজিবাদী সংস্কৃতি ধ্বংস হইয়া নূতন সর্বহারা সংস্কৃতি সৃষ্টি হইবে।)

সমাজবিবর্তনে দ্বান্দ্বিকনীতি বা ডায়ালেক্‌টীক্‌

সামন্ততন্ত্রের পর ধনিকতন্ত্র সকল দেশে ও সমাজে আসিয়াছে এবং আসিবে। ধনিকতন্ত্রের (Capitalism) পরে আবার সমাজতন্ত্রের স্তর আসিবে ; এই প্রকারে সমস্ত সমাজেরই ক্রমবিকাশ ধাপের পর ধাপ, স্তরের পর স্তরকে অতিক্রম করিয়া ঘটিতেছে। **এই স্তর প্রবর্তন কেন হয়?** মার্ক্স বলেন সমাজের ভিতরকার পরিবর্তনের পদ্ধতি বা মূলনীতি একটা আছে। সেই নীতি হইল ডায়ালেক্‌টীক্‌ নীতি। এই নীতি অনুসারে সব পরিবর্তন ঘটিতে বাধ্য। এই নীতি অনুসারে প্রথম অবস্থা হইতে দ্বিতীয় অবস্থায়

পরিণতি ঘটে বিরুদ্ধতা ও বিনাশের (Opposition, Contradiction and Negation) **মধ্য দিয়া।** প্রথম স্তরের মধ্যে একটা বিরুদ্ধ শক্তি (Antithesis) সৃষ্ট হয় এবং এই বিরুদ্ধ সত্তা বা প্রতিস্থিতি (Antithesis) পূর্বস্তরকে (Thesis) বিনষ্ট করে। পরে আবার এই স্তরের মধ্যেও একটা নূতন প্রতিস্থিতি গড়িয়া ওঠে, যাহার ফলে এই স্তরেরও বিনষ্টি হইয়া একটা নূতন স্তরের আবির্ভাব (Synthesis) ঘটে।

ইহাদের একটি ধাপকে বর্জন করিয়া নূতন স্তরের আবির্ভাব ঘটিতে পারে না। উপযুক্ত পরিবর্তন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ঘটিলে, তবেই পরবর্তী পর্যায়ের আগমন সম্ভব হইতে পারে। ক্রমবিকাশের গতি ও স্তরবিন্যাস ডায়ালেক্‌টীকের সূত্রের দ্বারা বাঁধা আছে।

সামন্ততন্ত্রের যুগে রাজামহারাজার (শ্রেণীর) প্রাধান্য থাকে। এই যুগের শিল্পে, সাহিত্যে, ধর্মে, এক কথায় সংস্কৃতিতে রাজা-মহারাজাদের শ্রেণী-প্রাধান্যের ছাপ থাকে। এই শ্রেণীকে বিনষ্ট করিয়া মধ্যবিত্তশ্রেণী (Bourgeois) ধনতন্ত্রের প্রাধান্য স্থাপন করে। সামন্ততন্ত্রকে বিনষ্ট করিয়া ধনিকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বিপ্লবের মধ্য দিয়া হয়, তাই ইহাকে বুর্জোয়া বিপ্লব বলে। মধ্যবিত্তশ্রেণী রাজতন্ত্রকে সরাইয়া গণতন্ত্র (Democracy) স্থাপন করে। তাই এই বিপ্লবকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবও (Bourgeois Democratic Revolution) বলে। পরবর্তী বিপ্লব ধনতন্ত্রকে বিনষ্ট করিয়া সমাজতন্ত্র স্থাপন করিবে তাই পরবর্তী বিপ্লব "সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব" (Socialist Revolution); এবং শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা বুর্জোয়াদের ধ্বংসের পর এই সমাজতন্ত্র স্থাপিত হইবে তাই ইহাকে সর্বহারার বিপ্লব বা শ্রমিক বিপ্লবও (Proletarian Revolution) বলে। ধনিকতন্ত্র যে যে দেশে যথেষ্টরূপে বর্ধিত হইয়াছে সেইখানেই এই সর্বহারার বিপ্লব ঘটিতে পারে এবং সমাজতন্ত্র স্থাপিত হইতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

ইতিহাসের জড়বাদী বা আর্থিক ব্যাখ্যা (২)

ঐতিহাসিক জড়বাদ অনুসারে (Historical Materialism) সংস্কৃতি ও সমাজ অর্থশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া স্তরের পর স্তর নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে রূপান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। সংস্কৃতি বলিতে একটা জাতি বা সমাজের রাষ্ট্র, ধর্ম, পরিবার, কলা ও সাহিত্য ইত্যাদিকেই বুঝায়। অর্থনীতির রূপান্তরের সাথে সাথে এই সবগুলিরও রূপান্তর ঘটিতেছে ও ঘটিবে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ইহাদের ক্রমবিকাশকে বিচার করিলে ইহাদের অতীত রূপান্তর হইতে ভবিষ্যৎ রূপান্তরের আকৃতি ও প্রকৃতি ধরা পড়িবে। তাই সামন্ততন্ত্র ও ধনিকতন্ত্র এই দুই স্তরে যে সমাজ ও সংস্কৃতি তাহা বিলীন হইয়া (Negated) আগামীযুগে সর্বহারা সংস্কৃতি নামক নূতন সংস্কৃতি আবির্ভাব হইবে, ইহাই ঐতিহাসিক জড়বাদের মূলকথা।

এই নীতিকে অনুসরণ করিয়া মার্ক্সবাদ পরিবার, রাষ্ট্র, ধর্ম, ইত্যাদির অতীত ইতিহাস আলোচনা করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে ইহাদের কী রূপ হইবে তাহাও নির্দেশ করিয়াছে। নিম্নে ইহাদের মতবাদ দেওয়া গেল।

মার্ক্সবাদী রাষ্ট্র-সংক্রান্ত থিয়োরী
(Theory of State)

রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্ক্সীয় মতবাদ এই যে, রাষ্ট্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি-প্রথা (Private Property) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সমাজে যে সময় ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রচলন হইল তখন সমাজের শক্তিশালী নেতৃস্থানীয় লোকেরাই

সম্পত্তির মালিক হইয়াছিল; সম্পত্তি-প্রথা উদ্ভবের সহিত দুইটি শ্রেণীরও উৎপত্তি হইল। যাহারা সম্পত্তির মালিক এবং যাহারা সম্পত্তিবিহীন। সম্পত্তির মালিক যাহারা তাহারাই নিজেদের সম্পত্তিকে নিরাপদে ভোগ করিবার জন্য "রাষ্ট্র" নামক যন্ত্রের উদ্ভাবন করে। প্রচলিত ব্যবস্থা ও সম্পত্তিকে রক্ষা করিবার জন্য এবং যাহারা এই ব্যবস্থার হানি করে তাহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য এই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব।

যুগে যুগে রাষ্ট্র তাই প্রতাপশালীশ্রেণীর আধিপত্যের সহায়ক হিসাবে সমাজে বিদ্যমান আছে। মার্ক্স তাহার বিখ্যাত "কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো" (Communist Manifesto) নামক পুস্তকে রাষ্ট্রকে "প্রবলতমশ্রেণীর" কর্মপরিষদ (Executive Committee of the dominating class) বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। যে যুগে যে শ্রেণী আধিপত্য করে সেই যুগে সেই শ্রেণীর হাতের যন্ত্র হইল সেই যুগের রাষ্ট্র। সামন্তযুগে রাজামহারাজাদের আধিপত্য ছিল, এই যুগে রাষ্ট্রও ইহাদের হাতের যন্ত্র ছিল। আধুনিক যুগে ধনতান্ত্রিকশ্রেণীর আধিপত্য রাষ্ট্রকে এই শ্রেণীর একটি যন্ত্রে পরিণত করিয়াছে।

ভবিষ্যৎ যুগে রাষ্ট্রের রূপ কী হইবে? সামন্তযুগে যেমন রাজতন্ত্র রাষ্ট্রের রূপ তেমনই ধনতান্ত্রিকযুগে গণতন্ত্র (Democracy) রাষ্ট্রের রূপ। কিন্তু ইহার পরবর্তীযুগ সমাজতন্ত্রের যুগ। এই যুগে শ্রমিকদের প্রাধান্য হইবে অর্থাৎ সমাজের সমস্ত লোকই শ্রমিকে পরিণত হইবে। কোন শ্রেণীভেদ থাকিবেনা, সমাজ শ্রেণীহীন হইবে (Classless) এই কারণে যে হেতু কোন শ্রেণীর উপর অন্যশ্রেণীর আধিপত্য ও জুলুম থাকিবেনা সেই হেতু শ্রেণীহীন সমাজে রাষ্ট্রও থাকিবেনা। মার্ক্সের ভাষায় "রাষ্ট্র ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে" (State will wither away)। বাহির হইতে কোন শক্তি প্রয়োগ করিবার দরকার হইবে না কারণ

উহার কোন কার্যকারিতা (Function) না থাকায় উহার আত্মবিলোপ ঘটিবে।

রাষ্ট্রহীন সমাজে সামাজিক জীবন চলিবে কী করিয়া? ন্যায়-অন্যায়ের শাসন কিরূপ হইবে? মার্ক্স বলেন তখন মানুষ সামাজিক বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইবে স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা নয়। কোন শ্রেণী অপর শ্রেণীর উপর জুলুম করিবে না। প্রত্যেক মানুষ সাধ্যমত পরিশ্রম করিবে ও প্রয়োজন মত মাহিনা পাইবে। এই সমাজে শাস্তিদান করিবার জন্য কোন পুলিশ বা রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজন হইবে না।

'কিন্তু আদর্শ কম্যুনিষ্ট-সমাজ গড়িয়া উঠিতে অনেক সময় লাগিবে ধীরে ধীরে মানুষের মনোবৃত্তির পরিবর্তন হইবে এবং যতদিন পূর্ণ কম্যুনিজম স্থাপিত না হয় ততদিন সম্পূর্ণরূপে শ্রেণীহীন (Classless) সমাজ হইবেনা। কাজেই এই পরিবর্তনের মধ্যবর্তী যুগে সর্বহারার একনায়কত্বের (Dictatorship of the proletariat) যুগ হইবে। শ্রমিকদের প্রাধান্যে রাষ্ট্র পরিচালিত হইবে। পরে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের প্রয়োজন বিলুপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাচালিত সমাজ প্রবর্তিত হইবে।)

মার্ক্সবাদী ধর্মসংক্রান্ত থিয়োরী (Theory of Religion)

রাষ্ট্র যেমন অর্থনৈতিক কারণে জাত ও পরিবর্তিত হইয়া ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হইবে তেমনি ধর্মও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি হইতে উৎপন্ন এবং পরিবর্তিত ভবিষ্যৎ সমাজে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল ধর্ম। যুগে যুগে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সংগে সংগে ধর্মেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। (প্রকৃতপক্ষে ধর্মের মূলে কোনও সত্য নাই। কুসংস্কার ও ভয় হইতেই ধর্মের উৎপত্তি।) ধনিকেরা ধর্মের সাহায্যেই জনসাধারণকে দাবাইয়া রাখে। রাষ্ট্র যে প্রকার শক্তিশালী শ্রেণীর আধিপত্যের যন্ত্র, তেমনই ধর্মও শ্রেণী-আধিপত্যের যন্ত্র-স্বরূপ।

সমাজতন্ত্র স্থাপিত হইলে ব্যক্তিগত সম্পত্তিও থাকিবেনা এবং শ্রেণীও থাকিবে না ; কাজেই ধর্মেরও প্রয়োজন থাকিবে না। ইহা ছাড়া মানুষের ভয়ও লুপ্ত হইবে। প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষ সম্পূর্ণ জানিয়া ফেলিবে এবং তাহাকে আয়ত্ব করিয়া মানুষের কল্যাণে লাগাইবে। সুতরাং, ধর্মেরও কোন অস্তিত্ব থাকিবে না।

(কার্ল মার্ক্সের ভাষায় "ধর্ম মানুষের শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে") (Religion is the opium of the people)। তাই ধর্মের বিলুপ্তি না হইলে মানুষেরও মুক্তি সম্ভব নয়। মার্ক্সিয় নিয়ন্ত্রণবাদ (Determinism) অনুসারে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে (Private property) ধর্মের উৎপত্তি হওয়ায় ইহার বিলুপ্তির সংগে সংগে অবলীলাক্রমে ধর্মেরও বিলুপ্তি ঘটিবে ইহা অনিবার্য।

(এই নীতিকে অনুসরণ করিয়া সোভিয়েট রাশিয়াতে ধর্মকে নির্বাসিত করা হইয়াছে।) (শিক্ষা বিভাগে এই ব্যবস্থা হইয়াছে যে সমস্ত পাঠ্যপুস্তক হইতে ধর্ম-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়কে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম-প্রবৃত্তিকে বিনষ্ট করিবার জন্য "ঈশ্বর-বিরোধী-সমিতি" (Anti-God Society) গঠন করিয়া প্রচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।)

পরিবার-সংক্রান্ত থিয়োরী (Theory of Family)

পরিবারের ক্রমবিকাশ ও সমস্যা (Evolution and Problem of Family) :—এই মত অনুসারে পরিবার ও বিবাহ এই দুইটি প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সংগে সংগে পরিবর্তিত হইতেছে। অতীতকাল হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত বিবাহের ও পরিবারের যে ক্রমবিকাশ হইয়াছে তাহার মূলে আর্থিক পরিস্থিতির পরিবর্তন রহিয়াছে। অর্থনৈতিক জীবন যে স্তরের থাকে সর্বদাই সমাজে পারিবারিক ও বিবাহ-সম্বন্ধীয়

জীবনও সেই স্তরে থাকে। প্রাচীনকালে দাসভিত্তিক সমাজ (slav society), মধ্যযুগে সামন্তপ্রথা ও আধুনিকযুগে ধনিকতন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে এই তিনটি অর্থনৈতিক স্তর সমাজের ক্রমবিকাশের তিনটি ধাপ। ইহার পূর্বে আদিমকালে সাম্যবাদী সমাজ (Communistie Society) স প্রথম স্তর বলিয়া মার্ক্সবাদী বলেন। অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা অনুসারে এ চারিটি স্তরের আনুষঙ্গিক চারিপ্রকার পরিবার ও যৌন-সম্পর্ক বর্তমা থাকিতে বাধ্য বলিয়া মার্ক্সবাদ বলে।

১৮৭৭ সালে লিউয়িস মর্গান নামক নৃতত্ত্ববিদ্ (Anthropologist উত্তর আমেরিকার ইরোকোয়া (Eroquois) জাতির মধ্যে বসবা করিয়া উহাদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া একখানা বই লিখেন ঐ বইখানার নাম "আদিম সমাজ" (Ancient Society)। ঐ পুস্তকে মর্গান পরিবার ও বিবাহের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে মতবাদ প্রচার করেন মার্ক্স এ-সম্বন্ধে পৃথক কোন পুস্তক লিখেন নাই। মার্ক্সের লিখিত কিছু নোটকে (Notes) অবলম্বন করিয়া এঙ্গেলস পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি (Origin of Family, Private Property and State) নামক পুস্তক লিখেন ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ। এই পুস্তকে এঙ্গেলস বিবাহ এবং পরিবার সম্বন্ধে মার্ক্সীয় মতামত বিবৃত করিয়াছেন। প্রধান ও মূল মতটি মর্গানের মত। এই মতে বিবাহের ও পরিবারের পাঁচটি স্তর রহিয়াছে।

(১) আদিম অবস্থায় অবাধ যৌনউচ্ছৃঙ্খলতা বা অবাধসংসর্গ— (Promiscuity)

(২) প্রাচীনযুগে, যৌথ-বিবাহের (Group Marriage) বা পরিবারের প্রথম স্তর—সমশোণিত বিবাহ (Consanguine Marriage) বা ভাইবোনে সমষ্টিগত বিবাহ।

(৩) যৌথ-বিবাহের দ্বিতীয় স্তর—পুনালুয়া বিবাহ (Punaluan Marriage)

(৪) যুগ্ম-বিবাহ (Pairing Marriage)

(৫) এক-বিবাহ (Monogamic Marriage)

মর্গান মানুষের সামাজিক ইতিহাসকে তিনটি স্তরে ভাগ করিয়াছেন।

(১) বন্যতা (Savagery)

(২) বর্বরতা (Barbarism)

(৩) সভ্যতা (Civilisation)

বন্যতা—ইহার মধ্যে বন্যতার স্তরে মানুষ ফলমূল হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকহাজার বছরের মধ্যে শীকারের মাংস খাইতে আরম্ভ করে। এই যুগের প্রথমাবস্থায় খাদ্য ছিল ফলমূল। মধ্য অবস্থায় আগুনের ব্যবহার এবং মাছ ও কিছু কিছু শীকারের মাংস প্রচলিত হইয়াছে। অস্ত্র-শস্ত্র—মধ্য অবস্থায়—বর্শা ও লাঠি প্রচলিত ছিল। এই যুগের শেষ অবস্থায় ধনুর্বাণ, কাঠের পাত্র, গ্রামে বাস, বল্কল বস্ত্র, ছোট নৌকা, কাঠের বাড়ী প্রচলিত ছিল।

বর্বরতা—বর্বরযুগ আরম্ভ হয় মাটির পাত্র প্রচলন হইতে। এই যুগে পশুপালন এবং কৃষি প্রচলিত হয়। এই যুগের শেষ অবস্থায় লোহা গালান এবং তরবারি ব্যবহার প্রচলিত হয়। ধীরে ধীরে লোহার লাঙল, লোহার কুঠার ও কোদালি, যুদ্ধরথ, গাড়ি, জাহাজ, নগর, স্থপতিশিল্প ইত্যাদির ব্যবহার ক্রমে প্রচলিত হইয়াছিল। গ্রীক্‌জাতি এইযুগের লোক ছিল। হোমারের (Homer) বিখ্যাত কাব্য ইলিয়াড্ (Iliad) এই যুগের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছে।

সভ্যতা-র স্তর আরম্ভ হইয়াছে অক্ষরের ও লিখনপদ্ধতির প্রচলন হইতে। অস্ত্র-শস্ত্র এই যুগের বন্দুক।

মর্গানের মতে অর্থনৈতিক অবস্থার এই তিনটি স্তরের বিবাহ পদ্ধতিও তিন প্রকারের হইয়াছে। অর্থনৈতিক স্তর পরিবর্তনের সংগে সংগে পরিবার ও বিবাহের স্তর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বন্যতার প্রথম অবস্থায় প্রচলিত ছিল "অবাধ সংসর্গ" স্তর (Promiscuity) তবে বন্যতার যুগের সার্বভৌম প্রথা ছিল "যৌথ-বিবাহ" (Group Marriage)। বর্বরতার যুগের আনুষঙ্গিক বিবাহ ও পরিবার হইল "যুগ্ম-বিবাহ" (Pairing Marriage)। সর্বশেষে, সভ্যতার যুগের আনুষঙ্গিক পদ্ধতি হইল মর্গানের "এক-বিবাহ"।

অবাধ-সংসর্গ (Promiscuity)—১৯ শতকের মধ্যভাগে ক্রমবিকাশবাদের (Evolution Theory) প্রচলন হয় তখন হইতে সকল ক্ষেত্রেই মানুষের জীবনে ক্রমবিকাশ ঘটিতেছে এই মতবাদ স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। ক্রমবিকাশ বলিতে স্বভাবতই উন্নতি বা উর্ধ্বগতি বুঝায়। মানবসমাজ ক্রমেই উন্নতির দিকে যাইতেছে এ কথা স্বীকার করিলে আদিমকালে এক সময় খুবই অবনত ও নিম্নতর অবস্থা ছিল, ইহা মনে আসে। কাজেই আদিমকালে বন্য অবস্থায় বিবাহের রীতি-নীতি-ও নৈতিক জগতের বাধা-নিষেধ একসময় ছিলনা, ইহা স্বভাবতঃই মনে হয়। মর্গানও এই নীতি অনুযায়ী আদিমকালে একটা বন্য অবস্থা কল্পনা করিয়াছেন। সেই বন্য অবস্থা হইতে নানাপ্রকার বিধি-নিষেধ ও সংযমের প্রচলন হইবার ফলে ক্রমশঃ সভ্য অবস্থায় এক-বিবাহ (Monogamy) আবির্ভূত হইয়াছে; আমেরিকার ইরোকোয়া (Eroquois) জাতির সামাজিক জীবনকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার এই সিদ্ধান্ত ১৮৭১ হইতে ১৮৭৭ সালের মধ্যে তিনি গঠন করিয়াছিলেন।

ইরোকোয়ার মধ্যে পরস্পরকে সম্বোধন করিবার পদ্ধতি হইতে অবাধ-সংসর্গ ও যৌথবিবাহের (Promiscuity and Group Marriage) অবস্থা মর্গান অনুমান করিয়া লইয়াছেন। ইরোকোয়ারা তাহাদের ভাইয়ের

ন্তান, ছেলে-মেয়েকেও সন্তান বলিয়া সম্বোধন করে এবং ভাইয়ের ছলেমেয়েরাও তাহাকে বাবা বলিয়া সম্বোধন করে। কিন্তু বোনের ছেলেকে ন্তান বলিয়া ডাকেনা। মেয়েরাও তেমনি ভাইয়ের ছেলেমেয়েদের ভাগে ও াগ্নী বলিয়া সম্বোধন করে। মর্গানের মতে এই সম্বোধন শুধু মাত্র সম্বোধনই য়। ইহার মূলে বাস্তব ও সত্যিকার সম্পর্ক রহিয়াছে; অর্থাৎ, অতীতে একসময় সত্যি সত্যি সব ভাইয়েরা তাহাদের প্রত্যেকেরই সন্তানের পিতা প্রত্যেকেই ছিল। অর্থাৎ, এই প্রকারের যৌথবিবাহ প্রচলিত ছিল কিন্তু কালক্রমে সম্বোধনগুলি তেমনি প্রচলিত থাকিলেও আসলে সম্পর্কটি বিলুপ্ত ইয়াছে। হাওয়াই দ্বীপে ঐ অতীত কালের যৌথবিবাহ এখনও দেখা যায়। ইহা হইতে হাওয়াই দ্বীপের যৌথবিবাহ পৃথিবীতে একসময় সার্ব-জনীন ছিল এই আনুমানিক মতবাদ মর্গান প্রচার করিয়াছেন। হাওয়াই দ্বীপে সম্বোধন-প্রথা অনুসারে সব ভাই ও বোনের সন্তানেরা পরস্পরকে ভাইবোন বলিয়া সম্বোধন করে এবং প্রত্যেকের পিতামাতাকে পিতামাতা বলিয়া সম্বোধন করে। ইহা হইতে মর্গান অনুমান করেন যে অতীতে ভাইবোনের একসময় বিবাহ হইত। এইরূপে মর্গান আনুমানিক ভিত্তির উপর অতীতকালের অবাধ যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতা ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এই অনুমানের কোনই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। নিছক অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই মানবজাতির আদিম ও অতীত জীবন সম্বন্ধে এত বড় গুরুতর সিদ্ধান্ত মর্গান করিয়াছেন। এঙ্গেল্‌স্ নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে ইহার প্রমাণ নাই। এঙ্গেল্‌স্ বলিয়াছেন "আদিমতম অসভ্যদের সামাজিক অবশেষ আবিষ্কার করিয়া সোজাসুজি ইহার (অবাধ যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতার) অস্তিত্ব প্রমাণ করা আমরা আশা করিতে পারিনা।"* তবুও মার্ক্সবাদীরা এই যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় পিতামাতা ভাইবোন সম্বন্ধেও কোন যৌন বাধা-নিষেধ ছিলনা।

* "We can hardly expect to prove its existence directly by discovering its social fossils among backward savages." (p.31)

দ্বিতীয় স্তরে সমশোণিত-বিবাহ
(Consanguine Marriage)

খুল্লতাত, জ্যেষ্ঠতাত এবং অন্যান্য সকল পর্যায়ের ভাই ও বোনের পরস্পরের স্বামী-স্ত্রীরূপে পরিগণিত হইত। কিন্তু এই স্তরেরও অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। পৃথিবীতে কোথাও ইহার কোন চিহ্ন নাই। এঙ্গেল্‌স্‌ নিজেই বলিতেছেন,—"ইতিহাসে আদিমতম জাতিগুলির মধ্যে ইহার প্রমাণযোগ্য কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহা যে অবশ্যই বর্তমান ছিল তাহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য।"†

পুনালুয়া বিবাহ—বিবাহের ইতিহাসে ক্রমে ক্রমেই সংযম ও বাধা-নিষেধের প্রয়োজনকে মানুষ স্বীকার করিয়া লইয়াছে। প্রথম নিষিদ্ধ হইয়াছিল পিতামাতার সহিত সন্তানের যৌন-সংসর্গ। ইহাই মানবজাতির প্রথম অগ্রগতি। ইহার পর ভ্রাতা-ভগ্নীর বিবাহ নিষেধ করিয়া মানুষ দ্বিতীয় অগ্রগতির সূচনা করিল। প্রাকৃতিক নিয়মে এই বাধানিষেধ মানুষের কল্যাণ করিয়াছে এ কথা মর্গান স্বীকার করিয়াছেন। ইহা হইতেই পুনালুয়া বিবাহ ও পরিবারের উদ্ভব হইয়াছে। বৃহৎ যৌথ-পরিবার বর্বরযুগের মধ্য-অবস্থা পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এই সব বৃহৎ পরিবার পারিপার্শ্বিকের প্রয়োজনে যখন ভাঙিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারে পরিণত হইত, তখন ভ্রাতা ও ভগ্নীর বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ায় বোনেরা যে সব সংসার রচনা করিত ভাইরা তাহা হইতে পৃথক সংসার করিয়া পুনালুয়া বিবাহে একদল বোন, একদল পুরুষের পারস্পরিক স্ত্রী বলিয়া

† "Even the most primitive peoples known to history provided no demonstrable instance of it. But that it must have existed we are compelled to admit."

গণ্য হইত। এই সব স্বামীরা পরস্পরকে "পুনালুয়া" বলিয়া সম্বোধন করিত। তেমনি একদল ভাই একদল স্ত্রীকে সকলেই পারস্পরিক স্ত্রী বলিয়া মনে করিত। এই সব স্ত্রীরা পরস্পরকে 'পুনালুয়া' বলিয়া সম্বোধন করিত। এই প্রথায় বোনের ছেলেদের ভাগে ইত্যাদি বলা প্রচলিত হইল। এই পুনালুয়া পরিবার হইতে মাতৃগোষ্ঠির (Gens) উৎপত্তি হইয়াছে। যৌথবিবাহের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে পিতৃত্বের নিশ্চয়তা না থাকায় মাতৃমূলক গোষ্ঠি (Gens) সমাজের ভিত্তি হয়। একই গোষ্ঠির (Gens) ভিতর বিবাহ করা নিষিদ্ধ। পুনালুয়া বিবাহ সমস্ত বর্বর (Barbarian) ও সভ্য জাতির (Civilised) মধ্যে এক সময় প্রচলিত ছিল বলিয়া মার্ক্সবাদীরা ও মর্গান মনে করেন।

যুগ্ম-বিবাহ (Pairing Marriage)

পুনালুয়া পরিবারের মধ্যে কখনো কখনো বিশেষ কোন পুরুষের সহিত বিশেষ কোন নারীর অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দাঁড়াইয়া যাইত; কখনো কখনো কোন পুরুষের অনেক স্ত্রীর মধ্যে একজন প্রধানা স্ত্রী থাকিত এবং ঐ স্ত্রীর কাছে এই পুরুষও অন্যান্য স্বামীদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইত। এই সব সাময়িক যুগল-সম্বন্ধ কখনো কখনো অধিকতর স্থায়ী হইত। ক্রমে বিবাহের বহু দূরবর্তী আত্মীয়দের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ায় যৌথবিবাহ (Group Marriage) ক্রমে ক্রমে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। পুরুষ বহু স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক রাখিলেও নারীর সম্বন্ধে কড়াকড়ি করিয়া সতীত্বের প্রচলন করিল। এইরূপে যুগ্ম-পরিবার (Pairing Family) প্রচলিত হইল। এই সময় নারীর সংখ্যা পুরুষের চাইতে কম হওয়ায় নারী ক্রয় করিবার ও জোর করিয়া ধরিয়া আনিবার প্রথা প্রচলিত হইল। কিন্তু এই যুগ্ম-পরিবারেও যৌথ-গৃহস্থালী

প্রচলিত ছিল এবং নারীর প্রাধান্য গৃহস্থালীতে অব্যাহত ছিল। এঙ্গেলসের মতে নারীর মর্যাদা এবং স্বাধীনতা বন্য এবং বর্বর অবস্থায় অত্যন্ত বেশী ছিল। যৌথ-গৃহস্থালীতে নারীর কর্তৃত্ব স্বভাবতই বেশী থাকে এবং পিতা অজ্ঞাত থাকায় মাতার, অর্থাৎ, নারীর মর্যাদা অতি উচ্চ থাকে। নারীমর্যাদার আর একটি কারণ হইল এই যে, এক গোষ্ঠির (Gens) নারীরা তাহাদের গৃহেই থাকে এবং পুরুষেরা ভিন্ন গোষ্ঠি হইতে আসিয়া এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়। এঙ্গেলসের মতে আদিম নারী (বর্বরযুগের) অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইলেও তাহাদের মর্যাদা অতি উঁচুদরের ছিল।

এঙ্গেল্‌স, ব্যাকোফেনকে (Bachofen) সমর্থন করিয়া বলেন যে যৌথবিবাহের উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে যুগ্মবিবাহের সংযমে উন্নতি বা পরিণতি ঘটিয়াছে নারীজাতির মারফৎ। আরণ্য-জীবনের কম্যুনিজ্‌ম্‌ নূতন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিকাশের ফলে পরিবর্তিত হইল এবং লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইল। এই দুই কারণে নারীদের অবস্থা অত্যন্ত অপমানজনক ও দুঃসহ বলিয়া নারীজাতির মনে হইতে লাগিল। এই দুঃসহ নিপীড়ন হইতে মুক্তির জন্য নারীজাতি সতীত্বের অধিকার দাবী করিতে লাগিল। বহু পুরুষের অধিকারকে খর্ব করিয়া একজন পুরুষের সহিত স্থায়ী অথবা অস্থায়ী বিবাহের জন্য নারীজাতি ব্যগ্র হইয়া উঠিল। এই মুক্তি আকাঙ্ক্ষা হইতেই যুগ্মবিবাহের (Pairing Marriage) উদ্ভব হইয়াছে। এই বিবাহ বর্বর-স্তরের প্রথা। আমেরিকায় এই যুগ্মবিবাহ বিশেষ প্রচলিত হইয়াছিল। ইহার পরে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আরও নূতন পরিণতি প্রাপ্ত হওয়ায় বিবাহ-প্রথাও নূতন ও বর্তমান স্তরে উপনীত হইল। বর্বরযুগের শেষভাগে গৃহপালিত নানাপ্রকার পশুপালন ও কৃষিকার্যের দরুণ মানুষের ধন বৃদ্ধি হইয়াছিল। এঙ্গেল্‌স্‌ বলেন যদিও এই ঐশ্বর্য পূর্বে গোষ্ঠীর (Gens) সমবেত সম্পত্তি ছিল, এই সম্পত্তি ইতিমধ্যেই কোন সময়ে গোষ্ঠিপতিদের

ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছিল। এই ধনদৌলতের বৃদ্ধি প্রচলিত সাময়িক যুগ্ম-বিবাহ (Pairing Marriage) এবং মাতৃতান্ত্রিক গোত্র বা গোষ্ঠিকে (Matriarchal Gens) কঠিন আঘাত করিল। ইহা উল্লেখ-যোগ্য যে ঐ-সময়ে যুগ্ম-পরিবারে শ্রমবিভাগ (Division of Labour) যে প্রকার ছিল তাহাতে পুরুষ, জীবিকার সাজসরঞ্জাম এবং পশু ও দাসদিগের মালিক এবং নারী গৃহস্থালীর জিনিষপত্রের অধিকারী ছিল। আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে যুগ্ম-পরিবারের ফলে নূতন পরিস্থিতি এই হইয়াছিল যে পিতৃত্ব ও জ্ঞাতি নির্ণীত হওয়া সম্ভব ছিল। এখন এই ধনবৃদ্ধির ফলে পরিবারের কর্তাই ধনশালী ও শক্তিশালী হইয়া উঠিল। ফলে পিতার মনে আপন সন্তানকে সম্পত্তির অধিকারী করিবার ইচ্ছা দেখা দিল। কিন্তু প্রচলিত মাতৃকেন্দ্রিক উত্তরাধিকার প্রথা অনুসারে সন্তান পিতার সম্পত্তি পাইত না কারণ তাহারা পিতার গোত্রে (Gens) অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সম্পত্তি মাতৃগোত্রের মধ্যে থাকিতে হইবে। এই পরিস্থিতিতে পুরুষ আপনার সন্তানকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিবার জন্য একটা বিরাট সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত করিল। অর্থাৎ মাতৃকেন্দ্রিক উত্তরাধিকারের ও বংশানুক্রমের পরিবর্তে পিতৃকেন্দ্রিক বংশানুক্রম ও উত্তরাধিকারের আইন প্রবর্তিত হইল।

এই পরিবর্তন কখন কি প্রকারে ঘটিয়াছিল তাহা জানিবার কোন উপায় নাই, এ-কথা এঙ্গেল্‌স্ বলেন। ইহা প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঘটনা। কিন্তু এঙ্গেল্‌সের মতে ইহা নিশ্চিত ঘটিয়াছিল এবং ব্যাকোফেন কর্তৃক সংগৃহীত মাতৃকেন্দ্রিক পরিবারের দৃষ্টান্তগুলি হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। এই বিপ্লবের ফলে আর একটি নূতন জিনিষের আবির্ভাব ঘটিল। পুরুষের অবাধ প্রভুত্ব, একদিকে নারীজাতির অসহায় পরাধীনতা এবং অন্যদিকে নারীর সতীত্ব-প্রথার প্রবর্তন করিল। ইহার স্বাভাবিক ফল হইল এক-বিবাহ।

এক-বিবাহ (Monogamy)

পুরুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে পুরুষ আপনার সন্তানের পিতৃত্ব সুনিশ্চিত করিবার জন্য নারীর স্বাধীনতাকে খর্ব করিল। পুরুষ নারীর সতীত্ব দাবী করিল। এই সময় হইতেই এক-বিবাহের সূত্রপাত। যুগ্ম-পরিবার হইতেই বর্বরযুগের শেষভাগে এক-বিবাহের উৎপত্তি হয়। পুরুষের আধিপত্য এই পরিবারের ভিত্তি। এই এক-বিবাহ প্রথার সহিত যৌনপ্রেমের (Sex-love) কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা অর্থনৈতিক কারণে সৃষ্টি হইয়াছে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টির সহিত ইহারও সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রাচীন গ্রীকজাতির মধ্যেও এই এক-বিবাহের কড়াকড়ি দেখা যায়; তবে এঙ্গেল্‌স্ ও মর্গান ইত্যাদির মতে এই একনিষ্ঠা (Fidelity) শুধু নারীর জন্যই নির্দিষ্ট। কিন্তু পুরুষ এই একনিষ্ঠার ধার ধারে না। নারীর উপর কঠোর একনিষ্ঠার দায়িত্ব চাপাইয়া পুরুষ অবাধে ব্যাভিচার করিয়া চলে। তাই ইহাদের মতে এক-বিবাহের অব্যর্থ আনুষঙ্গিক—ব্যভিচার বা বেশ্যাবৃত্তি। গ্রীকজাতির মধ্যেও ক্রীতদাসীদের সহিত যৌন-সম্পর্ক, বিবাহিত জীবনের পাশাপাশি চলিত। নারীর অবনতির সংগে সংগে গ্রীকদেশে হেটাইরা (Hetaira) নামক এক বিশেষ শ্রেণীর গণিকা সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। এই হেটাইরা (Hetaira) শ্রেণীর মধ্যে বিদ্যা ও বুদ্ধির চর্চা যেমন আশ্চর্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল তেমনি বিবাহিতা নারীর পর্দানশীন জীবন অশিক্ষা ও অজ্ঞতায় নিতান্ত অবনত হইয়াছিল। মর্গান এবং এঙ্গেল্‌সের মতে এই গণিকাবৃত্তি (Hetaira) প্রাচীনযুগ হইতে আধুনিক সভ্যযুগেও বর্তমান রহিয়াছে। এঙ্গেল্‌সের মতে এই গণিকাবৃত্তি (Hetairism বা Prostitution) অতীতকালের যৌথবিবাহেরই (Group Marriage) ধ্বংসাবশেষ। এইরূপে ব্যভিচার ও গণিকাবৃত্তি এক-বিবাহের অনিবার্য সাথী।

এঙ্গেল্‌সের মতে একবিবাহ শুধু গ্রীকদের মধ্যেই সৃষ্টি হয় নাই। রোমানদের মধ্যেও এই একবিবাহ প্রচলিত ছিল এবং রোমানপরিবারে নারীর স্বাধীনতা কিছু বেশী ছিল; তবে জার্মানদের মধ্যে একবিবাহ সবচেয়ে উৎকর্ষ লাভ করে। বর্তমান পরিবার বা বিবাহে প্রকৃত স্বাধীনতা নারীর নাই। নারীকে এই স্বাধীনতা দিতে হইলে পণ্য উৎপাদনে নিযুক্ত করিয়া আর্থিক স্বাধীনতার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এঙ্গেল্‌স্ বলেন এই ব্যবস্থা হইলেই একবিবাহও লুপ্ত হইবে।

কিন্তু ঐ সঙ্গেই এঙ্গেল্‌স্ এ-কথাও বলেন যে সমাজতান্ত্রিক সমাজে গণিকাবৃত্তি বিলুপ্ত হইবে এবং একবিবাহ (Monogomy) বিলুপ্ত না হইয়া সত্যকারের বিবাহে পরিণত হইবে। সমাজে মজুরীপ্রথা (Wage labour) বিলুপ্ত হইবে, সর্বহারার অস্তিত্ব থাকিবে না এবং সংগে সংগে অর্থাভাবে নারীরও দেহ বিক্রয় করিবার প্রয়োজন হইবে না। এইরূপে গণিকাবৃত্তি বিলুপ্ত হইবে। অপর পক্ষে একবিবাহের পরিণতি কী হইবে? এঙ্গেল্‌স্ বলেন, সমস্ত সম্পত্তি সামাজিক সম্পত্তি হইয়া যাওয়ায় রান্নাবান্না শিশুদের শিক্ষা ও যত্ন ইত্যাদি সমস্ত দায়িত্ব পরিবার হইতে সমাজের হাতে ন্যস্ত হইবে। অর্থাৎ, পরিবার সমাজের আর্থিক ক্ষুদ্রতম অংশ (Unit) থাকিবে না এবং সন্তান পালন করিবার দায়িত্ব ও উদ্বেগ না থাকায় নারী কেবল প্রেমের দ্বারা প্রবৃত্ত হইয়াই বিবাহ করিবে। ঐ অবস্থায় যৌনউচ্ছৃঙ্খলতা না বাড়িয়া ব্যক্তিগত যৌনপ্রেম (Sex-love) নারীকে একবিবাহের দিকে প্রবর্তিত করিবে। ভবিষ্যৎ সমাজের ভিত্তি হইবে প্রেম কিন্তু এই প্রেম স্বভাবতঃই একনিষ্ঠ হওয়ায় একবিবাহই কার্যতঃ প্রচলিত হইবে। মর্গানও ভবিষ্যতে পরিপূর্ণ সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত একবিবাহ প্রবর্তিত হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

জড়বাদী বা আর্থিক ব্যাখ্যার সমালোচনা

বর্তমান যুগে সমাজের ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্ তাহাদের মতবাদ ১৮৯৩ সনের পূর্বে গঠন করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পণ্ডিতদের মধ্যে সমাজ ও সভ্যতা সম্বন্ধে যে ধারণা ও মতবাদ প্রচলিত ছিল তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই মার্ক্স তাহার ইতিহাসের ব্যাখ্যা গঠন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে বিধিবদ্ধভাবে মার্ক্স কিছু আলোচনা করেন নাই। তাঁহার "পুঁজিবাদ" পুস্তকের নানাস্থানে, "দর্শনের দারিদ্র্য" (Poverty of Philosophy) ও অন্যান্য বইয়ে ইতঃস্ততঃ ছড়ানো আলোচনা রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া তাহার "ফয়ারবাক সম্বন্ধে এগার সূত্র" নামক (Eleven thesis on Feurbach) এগারটী সূত্রকেই এ-সম্বন্ধে প্রামাণিক ভিত্তি ধরা হয়। ইহার পর এঙ্গেল্‌স্ "ডুয়েরিং বিরোধী," "লুড্‌ভিক্ ফয়ারবাক্" (Ludwig Feurbach) "পরিবার, রাষ্ট্র ও সম্পত্তির উৎপত্তি" (Origin of Family, State and Property) প্রভৃতি বইয়ে এই মতকে বিস্তৃতভাবে গড়িয়া তোলেন। এঙ্গেলসের ব্যাখ্যাই এ সম্বন্ধে প্রামাণিক। ইহার পর প্লেখানভ তাঁহার বই "মার্ক্সবাদের মৌলিক প্রশ্নাবলী" (Fundamental Problems of Marxism) এবং বুখারিন 'ঐতিহাসিক জড়বাদ" নামক (Historical Materialism) পুস্তকে এঙ্গেল্‌সের মতকে যথাসম্ভব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু এই মতবাদের ভিত্তি ১৯ শতকের সমাজতত্ত্ব। আধুনিক সমাজ-তত্ত্ব ইহাকে ছাড়াইয়া আজ অনেক নূতন তথ্য ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নূতন পথে অগ্রসর হইয়াছে। আধুনিক গবেষণায় মার্ক্সের ও এঙ্গেল্‌সের জড়বাদীয় ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ একপেশে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

সমাজের পরিবর্তন ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ হইতেছে এ কথা সর্ববাদীসম্মত। কিন্তু এই পরিবর্তনের ব্যাখ্যা কেবলমাত্র জড় পারিপার্শ্বিক বা অর্থনৈতিক পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনের দ্বারা করা সম্ভব নয়। সমাজের উৎপত্তি ও বিবর্তনের মূলে আছে দুইটি শক্তি—

(১) মানুষ ও তাহার মন এবং

(২) পারিপার্শ্বিক।

মানুষ এবং পারিপার্শ্বিক এই দুই পক্ষের ঘাতপ্রতিঘাত ও পারস্পরিক সংযোগের ফলে সমাজ ও সভ্যতার সৃষ্টি ও বিবর্তন সম্ভব হইয়াছে। যাহারা মানুষের অন্তর্নিহিত নানা শক্তির বিভিন্ন দিককে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটি মাত্র দিককে সমস্ত সভ্যতার বিকাশের মৌলিক শক্তি বলিয়া প্রচার করেন তাহারা একদেশদর্শী। তেমনি যাহারা পারিপার্শ্বিকের কোনও একটি দিককে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইতিহাসের মূলশক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন তাহারাও একদেশদর্শী।

মার্ক্সবাদও এক প্রকারের পারিপার্শ্বিকবাদ (Environmental doctrine)। মার্ক্সবাদ কেবলমাত্র পারিপার্শ্বিককেই সভ্যতার ও সমাজের জন্য দায়ী করিয়াছে। ইহাতে মানবিক শক্তিকে (Human Factor) উপেক্ষা করিয়া সমস্ত বিবর্তনের প্রধান শক্তিকে (Force) অস্বীকার করা হইয়াছে। কোনও কোনও স্থানে অবশ্য মার্ক্স বলিয়াছেন যে, পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে মানুষই সমাজের পরিবর্তন ঘটায় এবং পারিপার্শ্বিকও মানুষের দ্বারা পরিবর্তিত হয়। মার্ক্স "ফয়ারবাক সম্বন্ধে এগারটী সূত্র"

পুস্তকের ৩নং সূত্রে বলিয়াছেন "পরিবেশও মোটামুটিভাবে মানুষের দ্বারাই পরিবর্তিত হয় এবং শিক্ষাদাতার স্বয়ং শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন।" ‡

এঙ্গেল্‌সও তাঁর "ফয়ারবাক্" নামক পুস্তকে কোথাও কোথাও এই ধরণের কথা বলিয়াছেন যথা "মানুষ তাহার ইপ্সিত লক্ষ্যকে স্বয়ং অনুসরণ করিয়া নিজের ইতিহাস রচনা করে।" ¶

কিন্তু মার্ক্সবাদের সারতত্ত্ব যে নিয়ন্ত্রণবাদ (determinism) তাহার মুখ্য সিদ্ধান্তই এই যে মানুষের স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি বা ক্রিয়াশক্তি নাই। এই কারণে উপরোক্ত মানুষের তথাকথিত স্বাতন্ত্র্য একটী ভূয়া জিনিষ বই আর কিছুই নয়। কারণ ঐ স্বাতন্ত্র্যকে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া পরক্ষণেই মার্ক্স ও এঙ্গেলস এই স্বাতন্ত্র্য যে প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য নয় নিতান্ত কাল্পনিক বা Illusory স্বাতন্ত্র্য তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। মানুষের স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তিকে স্বীকার করিলে নিয়ন্ত্রণবাদের কোনও অর্থ থাকেনা। 'অর্থশাস্ত্রের আলোচনা' (Critique of Political Economy) নামক পুস্তকের ভূমিকায় মার্ক্স স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"এই সামাজিক উৎপাদন ব্যাপারে মানুষ পরস্পরের মধ্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট সম্পর্ক সৃষ্টি করে। এই সব সামাজিক সম্পর্ক অবশ্যম্ভাবি এবং মানুষের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ।"*

‡ "Circumstances are changed precisely by men and that the educator must himself be educated."

(Thesis no. 3)

¶ "Men make their own history..........in that each person follows his own consciously desired end."

* "In this social production which men carry on they enter into definite relations that are indispensable and independent of their will."

এখানে 'মানুষের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ' (Independent of human will) এই উক্তিটি পারিপার্শ্বিকের কঠোর ও অনিবার্য শাসনই সূচিত করিতেছে। ইহার পরই মার্ক্স আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—"মানুষের চেতনা তার সত্তার নিয়ামক নয়। অপর পক্ষে বরং মানুষের সামাজিক সত্তাই তার চেতনার নিয়ামক।" †

এই উক্তিটি মার্ক্সীয় দর্শন ও সমাজতত্ত্বের স্তম্ভস্বরূপ। এঙ্গেল্‌স্ 'ফয়ারবাক' পুস্তকে প্রশ্ন তুলিয়াছেন, মানুষের এই তথাকথিত স্বাধীন ইচ্ছা বা চেতনার পেছনে কোন্ শক্তি অব্যর্থভাবে মানবীয় ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে? §

জবাবে এঙ্গেল্‌স্ নিজেই বলিতেছেন অর্থনৈতিক শক্তিই মানুষকে চালাইতেছে, 'নিছক অর্থনৈতিক কারণ' (Purely economic reasons) ইহার পিছনে কাজ করিতেছে। মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি আছে কিন্তু ইহাদের মতে এই ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি সম্পূর্ণরূপে বাহ্য পারিপার্শ্বিকের দ্বারা শৃঙ্খলিত। মানুষ পারিপার্শ্বিকের উপর আঘাত করে ও তাহাকে পরিবর্তিত করে, ইহাতে মানুষের স্বতন্ত্র কোনও কৃতিত্ব নাই। কারণ মানুষের এই ক্রিয়া হইল প্রতিক্রিয়া মাত্র। অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকের প্রভাবেই মানুষ প্রভাবিত হইয়া প্রতিক্রিয়া স্বরূপে বাহ্য জগতকে আঘাত করে। মানুষের সব কাজই পারিপার্শ্বিক তাহার উপর যে ক্রিয়া করিতেছে, তাহার প্রতিক্রিয়া মাত্র। তাই গোড়ার ঘরে ("In the last analysis")

---

† "It is not the consciousness that determines men's existence but on the contrary it is their social existence (being) that determines their consciousness."

§ "What driving forces in turn stand behind these motives?"

পারিপার্শ্বিকই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। অধিকন্তু, মার্ক্স যখন ইতিহাসকে জড়শক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করিতে চান এবং জড়শক্তিকেই সকল পরিবর্তনের মুল শক্তি বলিয়া নির্ণয় করেন তখন মানুষীশক্তির স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হইতেছেনা। মার্ক্সবাদ সমাজতত্ত্বেও একবাদী (Monist)। কাজেই মানুষ এবং পারিপার্শ্বিক এই দুই শক্তির স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা স্বীকার করিলে একবাদের (Monism) অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকেনা; তাহা ইতিহাসের বহুবাদী ব্যাখ্যায় পরিণত হয় (Pluralistic Interpretation of History)।

বিশুদ্ধ পারিপার্শ্বিকবাদের (Environmental Theory) বিরুদ্ধে আজকালকার বেশির ভাগ সমাজতাত্ত্বিক প্রতিবাদ তুলিয়াছেন। লেষ্টার ওয়ার্ড (Lester Ward) মানুষের ইচ্ছাশক্তি ইতিহাসের মুল উৎস বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। গাব্রিয়েল টারদে (Gabriel Tarde), চার্লস এলউড (Charles Ellwood), সুমনার (W. G. Sumner) রাটসেনহোফার (Ratzenhofer) ই, বারগেস (E. Burgess) ম্যাকডুগাল (Mc Doughall), ফ্রয়েড (Freud), য়ুংগ (Yung), এ্যাড্‌লার (Adler), মুয়েলার-লায়ার (Mueller-Lyre), সোরোকিন (Sorokin), টয়েনবী (Toynbee), গিডিংস (Giddings) ইত্যাদি সমাজতাত্ত্বিকেরা মানুষের সৃজনী-প্রতিভা ও অন্তর্নিহিত স্বতন্ত্রশক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন।

কেবলমাত্র মানুষ তাহার আত্মশক্তিতে সমাজ ও সভ্যতাকে সৃষ্টি করে নাই। তেমনি শুধু পারিপার্শ্বিকও মানুষের ও সমাজের রূপান্তর সৃজন করিতে পারে নাই। মানুষ এবং পারিপার্শ্বিক এই দুইশক্তির সহযোগে ও সংঘাতে সমাজ ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। মানুষ তাহার আত্মশক্তিকে নিছক শূন্যে প্রয়োগ করিতে পারে না। তার প্রয়োগের

ক্ষেত্র হইল বাহ্যজগত। ভিতর এবং বাহির, মানুষ এবং বাহ্যজগৎ, এই দুইয়ের সমবায় ও সংঘাতকে বুঝিতে হইলে ইহাদের আরও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই যুগ্ম-শক্তির প্রত্যেকেই জটিল এবং মিশ্র পদার্থ। মানুষীশক্তি বলিতে তাহার জৈবিকশক্তি (Biological Force) ও তাহার মানসিক শক্তি উভয়কেই বুঝায়। বাহ্যজগৎ বা পারিপার্শ্বিক বলিতে ভৌগোলিক বা জড় পরিবেশ ও সামাজিক পরিস্থিতি উভয়কেই বোঝায়। সামাজিক পরিবেশের ভিতর অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীক, ধর্মীয়, সাহিত্যিক শিল্পিক ইত্যাদি সর্বদিকই অন্তর্ভুক্ত।

সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে অনেকেই কোন একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কোন একটি বিশেষ দিককে প্রাধান্য দিয়াছেন এবং একটিমাত্র শক্তির (Factor) সাহায্যে সমস্ত মানবজীবন ও সমাজকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বর্তমান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এই প্রকার প্রণালী হাতে-কলমে গবেষণার পক্ষে প্রয়োজন হইলেও পূর্ণ সত্যকে নির্ধারণ করিবার পক্ষে এই প্রকার বিচ্ছিন্ন-প্রয়োগ (Method of Isolation) কৃতকার্য হইতে পারে না। জটিল সমাজ-জীবনের নানাবিচিত্র দিকের মধ্যে একটি মাত্র দিক্‌কে নজরে রাখিয়া আংশিক সত্তাকে মাত্র জানা যায়। যাহারা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন বা Weltanschauung গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব নেন তাহাদের সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলকে সামঞ্জস্য করিয়া গোটা জীবন ও সমাজপরিবর্তন সম্বন্ধে ব্যাপক ও পূর্ণ সত্যের আশ্রয় নিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিচ্ছিন্ন ও বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীতে গবেষণার সাহায্য হয় কিন্তু দার্শনিক ভিত্তি স্থাপনে এক একটি দৃষ্টিভঙ্গীর আংশিকত্ব ও অসম্পূর্ণতাকে স্মরণ রাখিতে হইবে। এই পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীই বর্তমানযুগের বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির সঙ্গত পরিণতি।

যাহারা এক একটি শক্তির (Factor) উপর জোর দিয়া ইতিহাসের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেকেই আংশিক সত্যকে উদ্ঘাটন করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ণ সত্যের দিক্ হইতে ইহারা নিতান্ত একপেশে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ যাঁরা ইতিহাসের ভৌগোলিক ব্যাখ্যা (Geographical Interpretation) দিয়া থাকেন তাহাদের মধ্যে প্রধান—বাক্‌ল্ (H. T. Buckle) তাঁহার বিখ্যাত "ইংলণ্ডের সভ্যতা" (Civilisation of England) নামক পুস্তকে সভ্যতার নিয়ন্ত্রক বলিয়া ভৌগোলিক পরিস্থিতিকেই নির্দেশ করিয়াছেন। লা প্লে (Le Play) এবং তাঁহার শিষ্যবর্গও প্রাকৃতিক পরিবেশকে সমাজব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ডাঃ হান্টিংটন (Dr. Huntington) ভৌগোলিক পরিস্থিতির মধ্যে আবহাওয়াকেই প্রাধান্য দান করিয়াছেন। তাঁহার মতে আবহাওয়ার (Climatic conditions) পরিবর্তন হেতুই সভ্যতার পরিবর্তন হয়।:

ডুরখীম (Durkheim), ডি, রবার্টি (De Roberty) প্রভৃতি সমাজতাত্ত্বিকেরা সামাজিক পারিপার্শ্বিকের উপর জোর দিয়াছেন। মানুষ ইহাদের মতে সামাজিক পরিস্থিতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ; তাহার ধর্ম, জ্ঞান বিজ্ঞান ইত্যাদি সবই তাহার সামাজিক পরিবেষ্টনীর প্রভাবে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছে। ইহারা ব্যক্তিকে বা প্রতিভাকে বিশেষ স্থান দেন না।

যাহারা বংশ বা রক্তকে মানুষের ভালমন্দ সমস্ত কাজের জন্য দায়ী করেন সেই বংশবাদীরা (Racialist) ইতিহাসের বংশবাদী ব্যাখ্যা (Racialist Interpretation of History) প্রচার করিয়াছেন। ইঁহারা ভৌগোলিক পরিস্থিতির বিশেষ মূল্য স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন পৃথিবীতে নানা জাতি বা বংশের মানুষ আছে যথা নিগ্রো, আর্য, মঙ্গোলিয় ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে কেবল আর্যরাই পৃথিবীতে সভ্যতা সৃষ্টি করিয়াছে। অপর জাতীয় লোকেরা অনুকূল পারিপার্শ্বিকে থাকিয়াও

ঐ পারিপার্শ্বিককে নিজেদের কল্যাণে ব্যবহার করিতে পারে নাই। ইহাতে বোঝা যায় যে কেবলমাত্র রক্তের মধ্যেই প্রতিভার বীজ লুকানো রহিয়াছে এবং এই বীজই সমাজ ও সংস্কৃতিকে গঠন করিয়াছে। এই দলের নেতা গোবিনু (Dr. Gobineau), হাউসটন চেম্বারলেন (H. Houston Chamberlain), লাপুজে (De Lapuge) প্রমুখ বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক।

গাব্রিয়েল টারদে, (Gabriel Tarde), লেষ্টর ওয়ার্ড (Lester Ward), চার্লস এলউড (Charles Ellwood) এলবিয়ন স্মল (Albion Small), রাটসেনহোফার (Ratzenhofer), ই, বারগেস (E. Burgess), টমাস (W. I. Thomas), সুমনার (W. G. Sumner), আর, পার্ক (R. Park) প্রভৃতি মানুষের মনঃশক্তির (Psychological factor) উপর সমস্ত সমাজ ও সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। ইহারা ইতিহাসের বিবর্তনে বহিজগতের চাইতে মনোজগতের উপর জোর দিয়াছেন বেশী। ইহাদের মতে ইতিহাসের পেছনে মূলশক্তি হিসাবে কাজ করিতেছে মানুষের মন, মানুষের ইচ্ছা, বুদ্ধি ও ভাববৃত্তি (Emotion)। লেষ্টার ওয়ার্ড মানুষের বুদ্ধিকে (Intellect) সকল বৃত্তি ও কাজের নিয়ামক বলিয়াছেন। তাঁহার মতে মানুষের ভাববৃত্তি শক্তি জোগায়, কিন্তু বুদ্ধি সেই শক্তিকে পথ দেখাইয়া নিয়ন্ত্রণ করে। যতই মানুষ অগ্রসর হইতেছে ততই অন্ধ ভাববৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া মানুষ বুদ্ধির নির্দেশে সচেতনভাবে সমাজকে গড়িয়া তুলিতেছে! এই উদ্দেশ্যমূলক ও আদর্শমূলক সমাজ গঠনই সভ্যতার বিশেষত্ব। পারিপার্শ্বিককে মানুষ আদর্শ অনুযায়ী গড়িবার ক্ষমতা রাখে। এলউড ও সুমনার মানুষের বুদ্ধিশক্তি ও ভাববৃত্তিকে (Intelligence and Feeling) সামাজিক বিকাশের যুগ্মশক্তি বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। ই, এ, রসও (E. A. Ross) ওয়ার্ডের মতন ইচ্ছাশক্তিকেই প্রাধান্য দান করিয়াছেন। রাটসেনহোফার এবং এলবিয়ন স্মল মানুষের স্বার্থবুদ্ধিকে

সমস্ত সামাজিক ব্যবহারের মূল বলিয়াছেন। টমাস পার্ক, ও বার্গেস—ওয়ার্ড, স্মল ও রাট্সেন্হোফার প্রভৃতির মত—ইচ্ছাবৃত্তিকেই প্রাধান্য দান করিয়াছেন।

ফ্রয়েড প্রমুখ মনোবিকলনীর দল (Psycho-analyst) সমস্ত সামাজিক বিবর্তনের মূলে কামশক্তিকেই (Sex Factor) একমাত্র মৌলিক শক্তি বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। ইতিহাসের সমস্ত ঘটনা ও পরিবর্তনকে ফ্রয়েড এই কামবৃত্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ধর্ম, পরিবার, বিবাহ, যুদ্ধ, রাষ্ট্র ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারের মূলে কামশক্তির নিয়ন্ত্রণ বা শাসন রহিয়াছে। ফ্রয়েড নিজে মানুষের এই মানসিক বৃত্তিকেই সভ্যতার মূল নিয়ামক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। মার্ক্সবাদের একদেশদর্শীতার বিরুদ্ধে ফ্রয়েড তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

কারলাইল্ (Carlyle) প্রমুখ কোন কোন পণ্ডিত ইতিহাসকে ব্যক্তির (Individual) ক্রিয়াকলাপের সমষ্টি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাদের মতে সমাজ ও সভ্যতার সৃষ্টি ও বিবর্তনের মূলে ব্যক্তির শক্তিই সর্বপ্রধান। সমাজের সৃষ্টি ব্যক্তি নয়। সমাজই ব্যক্তির সৃষ্টি। নেপোলিয়ন, আলেকজাণ্ডার, বিসমার্ক, মার্টিন লুথার, যিশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষেরাই সমাজকে পরিবর্তিত করিয়াছেন এবং পুরাতনকে ভাঙিয়া নূতন সভ্যতাকে বারবার গড়িয়া তুলিয়াছেন। হার্বার্ট স্পেনসারও (Herbert Spenser) কার্যতঃ ব্যক্তিকেই সমাজবিকাশের মূলশক্তি বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। ডুরখীম প্রভৃতিরা যেমন ব্যক্তিকে সমাজের সৃষ্টি (Product) বলিয়া তাচ্ছিল্য করিয়াছেন, ইহারা তেমনি সমাজকে প্রাধান্য দিতে কার্পণ্য করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যাকে ইতিহাসের ব্যক্তিত্ববাদী ব্যাখ্যা (Great-man Interpretation of History) বলা যায়।

উপরের ছয়টি সম্প্রদায়ের মত মার্ক্সবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে একটি মাত্র শক্তিকে (Factor) বাছিয়া

াইয়া তাহার দ্বারাই সমস্ত সমাজ-জীবনকে ব্যাখ্যা করিয়াছে। উপরোক্ত াতটি ব্যাখ্যার মধ্যে প্রত্যেকটি ব্যাখ্যাই একটিমাত্র দিক্ বা তত্ত্বকেই াাধান্য দিয়া তাহাকেই সমাজ-জীবনের একমাত্র তত্ত্ব বা মৌলিক ভিত্তি ালিয়া নির্দেশ করিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি যে সমাজ-জীবন একটা জটিল াত্তা এবং সমাজ-বিবর্তনও একটি জটিল প্রক্রিয়া। বহু তত্ত্ব বা শক্তির Factor) সহযোগে ও সংঘাতে সমাজ পরিবর্তিত হয় ও রূপ গ্রহণ করে। আদিম মানুষ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আনুমানিক এবং আদিমসমাজের প্রকৃতি ও পরিবর্তনের রীতি সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিত জ্ঞান নাই। কিছুটা আনু-াণিক সিদ্ধান্ত এবং কিছু বিরল তথ্য সংগ্রহ, এই দুইয়ের উপর ভিত্তি রিয়া আদিমকাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত সমস্ত মানব-জীবনের একটা রাবাহিক নিশ্চিত মতবাদ (Theory) গঠন করিবার মনোবৃত্তি ৯শতকে সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে জন্মিয়াছিল। বিশেষতঃ ক্রমবিকাশবাদের াবে পণ্ডিতেরা নানাপ্রকার আনুমানিক সমাজ-বিবর্তনের ছক্ বা .ttern গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে গবেষণার ফল এত বিস্তৃত বং তথ্য-সংগ্রহ ক্রমশঃ এত বিপুল হইয়া উঠিতেছে যে এইসব আনুমানিক াটার্ণের অসম্পূর্ণতা ও অযৌক্তিকতা সহজেই ধরা পড়িতেছে। অবশ্যি চি অনুযায়ী কোন একটি বিশেষ তত্ত্বের মোহে বিশেষ একটি দৃষ্টিভঙ্গী ড়িয়া তুলিয়া অনাদিকাল হইতে আজ পর্যন্ত মানুষের ইতিহাসের একটি াশিষ্ট ছাঁচ সৃষ্টি করিবার সুবিধা ও প্রলোভন দুইই বাড়িয়া গিয়াছে। াই বিপুল তথ্য সমাবেশের মধ্য হইতে প্রয়োজন ও পছন্দমত তথ্য-সংগ্রহ রিয়া ও তাহাদিগকে একসঙ্গে জুড়িয়া একটি Theory গড়া খুব সহজ। াই গিনস্‌বার্গ (Ginsberg) প্রমুখ আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকেরা সাবধান রিয়াছেন যে ক্রমবিকাশের বিশিষ্ট কোনও ধারা গঠন করা মোটেই

একবাদী ব্যাখ্যা একপেশে

বৈজ্ঞানিক নয়—গবেষণার সুবিধার জন্য অনুমাণ বা প্রকল্প (Hypothesis হিসাবেই মাত্র ইহাদের উপযোগিতা। তাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে উপ সাতটি ব্যাখ্যাই কমবেশী একপেশে।

আধুনিক জ্ঞানের আলোকে ইতিহাসের বহুবাদী ব্যাখ্যাই (Pluralist Interpretation of History) বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসম্মত প্রমাণি হইয়াছে। মানুষ আদিমকাল হইতে বাহ্যপ্রকৃতি মুখোমুখি বাস করিয়াছে। বাহ্যপ্রকৃতির উপর একদি যেমন তাহার নির্ভর করিতে হইয়াছে অন্যদিকে তেমন প্রকৃতিকে ভাঙিয়া গড়িয়া নিজের উপযোগী করিয়া বদলাইয়া লই হইয়াছে। প্রকৃতি কখনও মিত্রের মত সহায়তা করিয়াছে কখন বিরুদ্ধতা করিয়াছে। মানুষও কখনও সহযোগি কখনও সংগ্রাম করিয়া আত্মবিকাশ করিয়াছে

ইতিহাসের বহুবাদী ব্যাখ্যা

ভৌগোলিক পরিবেশ।

মানুষের আছে দেহ, আছে মন। আছে দৈহিক শক্তি ও প্রবৃ আছে মানসিক শক্তি ও বৃত্তি। মানুষকে একদিকে প্রেরণা দিয়া তাহার জৈববৃত্তি (Biological), তাহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা কামবৃত্তি এ আত্মরক্ষা ও আত্মবিস্তারের তাগিদ; অন্যদিকে চাল করিয়াছে তাহার মনোবৃত্তি (mental) তাহ বুদ্ধিশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ভাবশক্তি (Emotion) এই বিভিন্নমুখী শক্তির সমাবেশে তাহার ব্যক্তিত্ব এবং ইহাদের প্রেরণা তাহার মৌলিক প্রেরণা। কিন্তু শক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্র এ ব্যক্তিত্বের বিস্তারের উপাদান চাই। সেই ক্ষেত্র এবং উপাদা হইল প্রকৃতি। প্রাকৃতিক পরিবেশকে বাদ দিয়া মানুষ তাই চালা পারেনা। এই প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী মানুষ আপনার আত্মরক্ষ ও আত্ম-বিস্তারের ব্যবস্থা করিয়া লয়। কাজেই ভৌগোলিক পরিস্থিতি

ব্যক্তিত্ব বিচিত্র

প্রভাব ও দান অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সভ্যতার মূলে ভৌগোলিক পরিস্থিতি রহিয়াছে একথা অকাট্য। কিন্তু তাই বলিয়া মানুষ প্রকৃতির দাস বা অন্ধ যন্ত্রমাত্র নয়। মানুষের স্বতন্ত্রশক্তি সর্বদাই কাজ করিতেছে। তেমনি মানুষ কোন কালেই একক নয়। সকল অবস্থাই সে মানুষের দ্বারা পরিবৃত আছে। তাহার চারিদিকে যে মানবদল রহিয়াছে এই মানবীয় পারিপার্শ্বিকও উপেক্ষার নয়। কারণ মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে যেমন বোঝাপড়া করে তেমনই তাহাকে তাহার আশেপাশের মানুষ-পারিপার্শ্বিকের সহিতও বোঝাপড়া করিতে হয়। কখনও সহযোগ কখনও প্রতিযোগিতা কখনও সংঘর্ষের মধ্যদিয়া মানুষ অপর মানুষের সহিত নানা বিচিত্র সম্বন্ধ স্থাপন করে। ইহাতেই গড়িয়া ওঠে তাহার সমাজ। মানব-ইতিহাসের কোনও অবস্থায়ই মানুষ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হিসাবে ছিলনা। যুগ ও দেশ অনুযায়ী মানুষ চিরকালই কোনও না কোনও সামাজিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বাস করিয়াছে।

মানবীয় পরিবেশ

মানুষের ব্যক্তিত্বের নানাদিক আজও যেমন আছে আদিমকালে তেমনই ছিল। জৈবিক প্রয়োজন বা ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও কামবৃত্তি যেমন আদিমকাল হইতেই মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, তেমনি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে তাহার ভাববৃত্তি, সৌন্দর্য জ্ঞান, প্রেমবৃত্তি, বলৈষণা তাহার ধর্মবুদ্ধি ও নীতিজ্ঞান। আদিম মানুষের (পুরাপলীয় বা Paleolethic ও নবপলীয় বা Neolethic মানুষের) যতটুকু তথ্য উদ্ধার হইয়াছে তাহাতে তাহাদের ব্যক্তিত্বের এই বিচিত্রতার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অসভ্য জীবনে কেবল জৈবিক প্রয়োজনই প্রাধান্য করিয়াছে একথা বলা চলে না। তাহাদেরও জীবনে সৌন্দর্য-বোধ, হিংসা, আনুগত্য ইত্যাদি মানবীয় চিত্তবৃত্তি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যাঁহারা অর্থ নৈতিক বা জৈবিকবৃত্তিকেই একমাত্র অদ্বিতীয়বৃত্তি

বলিয়া আদিমজীবনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহারা একদেশদর্শী—একথা আধুনিক তথ্যসংগ্রহ প্রমাণ করিতেছে। কেবল আদিমযুগে নয়, প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক যুগেও মানুষের এই সব বিভিন্নবৃত্তি, মানুষকে প্রেরণা দিয়াছে। তবে কোনও যুগে বা কোনও দেশে প্রয়োজন মত মানুষের এই বহুমুখী ব্যক্তিত্বের কোন দিক বা বৃত্তি প্রাবল্য বা সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়াছে। দেশ ও কাল অনুযায়ী ব্যক্তিত্ব সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া মানুষের আত্মবিস্তারের সৌকর্য সৃষ্টি করে। কোনও যুগে কোনও ক্ষেত্রে হয়ত বা কামবৃত্তি, কোথাও বা হিংসাবৃত্তি, কোথাও বা জীবিকাবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ইহা হইতে একথা বলা ভুল যে কোনও যুগে মানুষের সকল প্রচেষ্টার অদ্বিতীয় ও একমাত্র প্রেরণা কাম বা হিংসা বা জীবিকান্বেষণ। সমাজের পরিবর্তনের মূলেও কোনও একটিমাত্র শক্তি কাজ করিতেছে ইহা বলাও গোঁড়ামি মাত্র।

সংঘর্ষ ও সহযোগিতা

কখনও সংঘর্ষের মধ্যদিয়া সমাজের পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু সংঘর্ষই একমাত্র শক্তি নয়। সমাজবিকাশে সহযোগিতাও সমানভাবে কাজ করিয়াছে। আদিমকালে উপজাতীয় সংঘর্ষ (Tribal Feuds) হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু উপজাতীয় সংঘর্ষকেই একমাত্র বিবর্তনের কারণ বলা বিজ্ঞানবিরোধী। গামপ্লাউইৎস (Gumplowiez) নামক পণ্ডিত সংঘর্ষকেই সমাজ-জীবনের মূল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। মার্ক্স, নোভিকাউ (Novicow) প্রভৃতিরাও সংঘর্ষকেই প্রাণীজগতের ও মানবজগতের মৌলিক তত্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা আংশিক সত্য মাত্র। ক্রোপোট্‌কিন, বেগহট্ (Kropotkin, Bagehot) ইত্যাদি সমাজতাত্বিকরা সমান জোরের সহিত ঘোষণা করিয়াছেন যে জীবনে সহযোগিতার (Co-operation) স্থান কম নয়। একদলের সহিত অপরদলের সংঘর্ষ যেমন সত্য, তেমনি এ-কথাও

সত্য যে, দল হিসাবে দানা বাঁধিয়া উঠিবার মূলে সহযোগিতাও রহিয়াছে। যখন অপরের সহিত সংঘর্ষ হইতেছে তখনই নিজেদের মধ্যে সহযোগিতাও রহিয়াছে। অনেকের ধারণা অসভ্যরা সভ্যমানুষ অপেক্ষা অধিক হিংস্র। এই ধারণা যে নিতান্ত ভুল তাহা ডাঃ ওয়েষ্টারমার্ক, (Dr. Westermarck) হইতে আরম্ভ করিয়া হবহাউস্, গিন্স্বার্গ, হুইলার, পেরী (Hobhouse, Ginnsberg, Wheeeler, Perry) ইত্যাদি পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন।

মানুষ আত্মরক্ষা ও আত্মবিস্তারের জন্য প্রকৃতিকে ব্যবহার করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মানবিক বা সামাজিক সম্পর্কও গড়িয়া তুলিয়াছে। প্রতি মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন সৃষ্টি করিয়াছে সমষ্টিজীবন এবং সমষ্টিজীবনের নানা বাহ্যরূপ। এই বাহ্যরূপই হইল রাষ্ট্র, ধর্ম, বিবাহ, অর্থনীতি, পরিবার, সাহিত্য, কলা, ইত্যাদি। মানুষের সৃষ্ট এইসব প্রতিষ্ঠান লইয়াই তার সমষ্টিজীবন। এইগুলির মধ্যদিয়াই মানুষ পরস্পরের সহিত সম্বন্ধের ঐক্য স্থাপন করিয়াছে। মানুষ যেমন ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছে তেমনি ক্ষেত্র এবং কাল অনুযায়ী ইহাদের পরিবর্তন সাধন করিয়া বৃহত্তর সামঞ্জস্য পরস্পরের সহিত ও প্রকৃতির সহিত স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু সম্পর্কটি একতরফা নয়। মানুষ যেমন ইহাদিগকে প্রভাবিত করিতেছে ইহাদের প্রভাবও মানুষের উপর পড়িতেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব যেমন আছে তেমনি সামাজিক পারিপার্শ্বিকের প্রভাবও মানুষের উপর প্রবল। প্রভাব এই অর্থে যে পরিবেশ অনুযায়ী মানুষ নিজেকে ও পরিবেশকে বদলাইয়া লইতেছে। কাজেই মানুষের সঙ্গে মানুষের যেমন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানাপ্রকার সম্বন্ধ রহিয়াছে তেমনি সামাজিক জীবনেরও প্রতি অঙ্গের সহিত অন্য সকল অঙ্গের গূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধজালে সমস্ত সামাজিক ও

মানুষ এবং পরিবেশের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া

ব্যক্তিক জীবন আবদ্ধ থাকায় প্রতি অঙ্গের প্রভাব অন্য অঙ্গে সর্বদাই পড়িতেছে। সেই জন্য এক অঙ্গের পরিবর্তনের প্রভাব অন্য সমস্ত অঙ্গেই পরিবর্তন ঘটায়। রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের প্রভাব অর্থনীতির উপর পড়ে, তেমনি অর্থনৈতিক পরিবর্তন আবার রাষ্ট্রে পরিবর্তন ঘটায়। পারিবারিক জীবনের পরিবর্তন যেমন অর্থনীতিকে পরিবর্তিত করে, অর্থনৈতিক পরিবর্তনও সমাজে পারিবারিক জীবনকে প্রভাবিত করে। পরিবর্তনের এই অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক সমাজবিদ্‌রা আজকাল সকলেই স্বীকার করেন। ইহার মধ্যে সামাজিক জীবনের কোনও একটি দিক্‌কে বাছিয়া লইয়া তাহাকেই সমাজের অন্য সমস্ত দিকের সব পরিবর্তনের অদ্বিতীয় কারণ বলিয়া নির্দেশ করা বৈজ্ঞানিক নীতির বিরুদ্ধ। সমাজ-জীবনের এই পাস্পরিকতা অনুসারে জীবনের প্রত্যেক দিকই অপর সব দিকের পরিবর্তনের কারণ বলা যায়। এই বিধিকে বৈজ্ঞানিকরা ক্রিয়াত্মক পারস্পরিকতা বা Law of Functional Interdependence বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও যাহারা একটি দিক্‌কে কারণ বলিয়া ধরিয়া সমস্ত সমাজ-জীবনকে তাহার কার্য বা Effect বলেন তাহাদের একবাদ বা monism একদেশদর্শিতাদোষে দুষ্ট। এ ক্ষেত্রেও বহুবিধ শক্তির পারস্পরিক সমবায়ে ও ঘাতপ্রতিঘাতের ফল স্বরূপ সামাজিক বিবর্তন ঘটে। আধুনিক সমাজবিদ্‌রা তাই ইতিহাসের বিচিত্র ও জটিল বিবর্তনকে বুঝিতে ও ব্যাখ্যা করিতে "বহুবাদী ব্যাখ্যাকেই" অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

চার্লস এলউড[১] শেষ পর্যন্ত ভৌগোলিক ও জৈবিক (Biological) এবং মানসিক (Psychological)—এই ত্রিশক্তির সমবায়ে সামাজিক

১ "Introduction to Social Psychology," "Psychology of Human Society"

ীবনে ক্রমবিকাশ ঘটে বলিয়া নির্ধারণ করিয়া থাকেন। এডওয়ার্ড, এ রসও[২] ভৌগোলিক ও বংশানুক্রমিক এবং মানসিক শক্তিকে সমাজ-জীবনের মূল লিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত সমাজবিদ্ মুয়েলার-লায়ার[৩] বিখ্যাত সমাজবিদ্ সোরোকিন, টয়েনবী ইত্যাদি পণ্ডিতেরা "বহুবাদী-াখ্যা"কেই বিজ্ঞানসম্মত বলিয়াছেন। এমন কি ফ্রয়েড পর্যন্ত স্বীকার রিয়াছেন একটি মাত্র শক্তি বা factor অবলম্বনে ইতিহাসের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ। অসংখ্য সমাজতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের মধ্যে কয়েকজন পণ্ডিতের নাম খানে উল্লিখিত হইল। মুয়েলার-লায়ার বলিতেছেন, "পারস্পরিক ক্রিয়াত্মক -সম্পর্কের ক্ষেত্র খুব বিস্তৃত ও জটিল, কেননা প্রতিটি সমাজগত ক্রিয়া পর ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলির উপর নির্ভরশীল।"*

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন—"মানবিক চরিত্র কেবলমাত্র পরিবেশ-নির্ভর হে, অনেকাংশে বংশগত উত্তরাধিকার বা বংশানুক্রমের উপরেও র্ভরশীল। সর্বদাই সমাজতত্ত্বের এই ভিত্তিগত সূত্রকে মনে রাখিতে ইবে যে, সংস্কৃতিগত বিবর্তনের পিছনে চালক-শক্তি হইয়া কাজ রিতেছে পরিবেশ নয়,—মানুষের মস্তিষ্ক বা মনন-শক্তি, যে মননশক্তি ন্যান্য মানুষদের মননশক্তির সহিত পারস্পরিক সম্বন্ধে আবদ্ধ।" *

---

২ "Principles of Sociology"

৩ "Evolution of Modern Marriage"

* "The field of interfunctional relationship is extra-ordinarily large and complicated, for every sociological unction is dependent on every other in some way."

* "Human character is not simply and solely de-endent on environment but also on inheritence. We nust then keep ever in mind the underlying hypo-hesis of all sociology that the driving force of cul-ural evolution is not the environment but the human rain, in so far as it is in reciprocal relation to other uman brains."

অন্যত্র মুয়েলার-লায়ার বলেন "সভ্যতার ক্রমবিকাশের পিছনে যে শক্তি কাজ করিতেছে তাহা হইল মানুষের ইচ্ছাশক্তি। এই ইচ্ছাশক্তিও আবার পরিবেশের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়া বিবর্তিত হয়।" *

হার্বার্ট স্পেন্সারও মানুষের মন, দেহ এবং পারিপার্শ্বিক এই তিন শক্তিকেই বিবর্তনের মূল বলিয়াছেন। "একটা একক সত্তা হিসাবে দেখিলে প্রত্যেক ব্যক্তির আছে, দৈহিক কতকগুলি গুণ বা লক্ষণ। ....এছাড়াও আবার মানুষের বৈশিষ্ট হইল কতকগুলি মানসিক বৃত্তি; এইসব মনোবৃত্তি সমাজ ও সমাজ-বিবর্তনকে কখনো সাহায্য করে, কখনো বাধা দেয়, কখনো পরিবর্তিত করিয়া দেয়। এছাড়া সর্বদা সর্বক্ষেত্রেই ব্যক্তির বিশিষ্ট ধরণের বুদ্ধিশক্তি এবং মনন-রীতি সমাজস্থিতি বা সমাজ পরিবর্তনের সহযোগী-কারণ রূপে কাজ করিয়া থাকে।" *

এই সহযোগী-কারণগুলি (Co-operative causes) বলিতে বহুবাদী-ব্যাখ্যাকেই বোঝায়। সোরোকিনের (Sorokin) মতও তাই। তিনিও

---

* "The driving force in the evolution of civilisation is the human will: the will evolves through interaction with the environment."

* "Considered as a unit the individual man has physical traits.........he is in every case distinguished by emotional traits which aid or hinder or modify the activities of the society and its development. Always too, his degree of intelligence and tendencies of thought peculiar to him, become co-operative causes of social quiescence or social change." (Principles of Sociology Vol. I.)

বলেন "পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বহুশক্তির একটা সংহত সমাবেশের মধ্য হইতে কেবলমাত্র একটা শক্তির ওপরে নির্ভর করা—যেমন বহু পণ্ডিত করিয়াছেন—একটা গুরুতর পদ্ধতিগত ত্রুটি। ....আসল সত্য হইল, এই যে, কোন একটীমাত্র অংশ বা অঙ্গ এবং তদ্‌গত পরিবর্তন অন্য অঙ্গগুলির উপরে সার্বভৌম প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। আসলে, সকল অঙ্গ বা অংশগুলি একত্রে এবং তাহাদের রূপান্তরের সংযুক্ত অগ্রগতিটী নিয়ন্ত্রিত হয় জীবদেহের অন্তর্নিহিত সাধারণ প্রকৃতির দ্বারা।" ("সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গতিতত্ত্ব," ৫২ পৃ, ১ম খণ্ড) *

সংস্কৃতি ও সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দিকের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই অচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্বীকার করিলে কেবল একটিমাত্র দিককে (factor) অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়া অযৌক্তিক। সমাজ-জীবন ও সংস্কৃতির এই বৈচিত্র্য বা বহুমুখীতা সোরোকিন-এর বিরাট গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে। সোরোকিন দেখাইয়াছেন যে একবাদীরা একপেশে। "একবাদীরা মুদ্রার একদিক লক্ষ্য করিয়া অন্যদিককে ভুলিয়া গিয়াছেন।" *

* "Reliance upon one element of an integrated combination as a main factor in explaining changes within the combination, as many investigators in the field have done, is a serious error in procedure......... the truth is that no one of the parts or the minute changes proper to it, exercises a major influeuce on the other parts, but all the parts together and the common movement of their transformation are controlled by the general inward nature of the organism as a whole." (P. 52, Vol. I. Social and Cultural Dynamics)

* "They have taken only one-side of the coin and forgotten the other."

আর্নল্ড টয়নবী (Arnold Toynbe) বর্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সমাজতাত্ত্বিক। তাঁহার "ইতিহাস বিচার" ("Study of History") সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার একটি আধুনিক স্তম্ভ-স্বরূপ। তিনি এই পুস্তকে সভ্যতার উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলুপ্তি সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বংশবাদী, ভূগোলবাদী ইত্যাদি একপেশে মতবাদের সমালোচনা করিয়া বহুবাদী ব্যাখ্যায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন "এক একটি করিয়া বর্জন করিতে করিতে আমরা শেষ পর্যন্ত একটি সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি। সেই মূলসূত্র হইল এই যে—"সভ্যতার উৎপত্তি হইয়াছে এক শক্তি হইতে নয়, বহুশক্তি হইতে। সভ্যতা একটি বিচ্ছিন্ন ও অবিমিশ্র পদার্থ নয়, ইহা বহুশক্তির সমবায়।" (১ ভাগ, ২৭১পৃ) *

উল্লিখিত আলোচনায় প্রমাণ হইয়াছে যে সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের মূলে কেবল একটিমাত্র নয়, বহুশক্তির (factor) ক্রিয়া রহিয়াছে। এইসব বহুশক্তির মধ্যে কখনও হয়তঃ কোনও একটি প্রবল হইয়া উঠিতে পারে। কোনও একযুগে কোনও একটি শক্তির প্রাবল্য ঘটিয়া অন্য অন্য যুগে অন্য কোনও শক্তির প্রবলতা ঘটিতে পারে। তেমনি একই যুগে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তির প্রাধান্য ঘটিতে পারে। এই প্রকার একই দেশে ও কালে কোন-ও ঘটনায় একটি শক্তির প্রবলতা এবং একই সময় অন্য ঘটনায় অন্য শক্তির প্রাধান্য সম্ভব হইতে পারে। য়ুরোপেই এক সময় ধর্ম লইয়া যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছে। অপর সময়ে বংশ-প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য রক্ত-

* "So far by the process of exhaustion, we have made one discovery; the cause of the genesis of civilisations is not simple, but multiple; it is not an entity but a relation." (P. 271 Vol. I.)

পাত হইয়াছে। কখনও বা অর্থনৈতিক কারণও যুদ্ধবিগ্রহের পশ্চাতে কাজ করিয়াছে। কিন্তু সকল যুগে সকল অবস্থায় সকলদেশেই একটি মাত্র বৃত্তি বা শক্তি মানবসমাজকে স্থায়ীভাবে নিয়ন্ত্রণ ও চালনা করিয়া আসিয়াছে। এই মতবাদ অধুনাতন বিজ্ঞান কর্তৃক বর্জিত হইয়াছে।

পূর্বোক্ত আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করিলে নিম্নলিখিত কারণে মার্ক্সীয় অর্থনৈতিক বা জড়বাদী ব্যাখ্যার গুরুতর ত্রুটিগুলি ধরা পড়িবে।

মার্ক্সীয় ইতিহাস ব্যাখ্যায় জড়শক্তি (Material Forces) বা অর্থ-নৈতিক শক্তি (Economic Forces) এই দুইকেই মূল বলিয়া নির্ধারণ করা হইয়াছে। জড়শক্তি (Material Force) এবং অর্থনৈতিক শক্তি —(Economic Force) এই দুইটি শব্দের অর্থের মধ্যে অস্পষ্টতা রহিয়াছে। "জড় বা ভৌতিক উৎপাদন শক্তির" ('Material Forces of production') উপর "উৎপাদন-সম্বন্ধ" (Relations of Production) নির্ভর করে—মার্ক্স এ'কথা বলিয়াছেন। এখানে 'জড় উৎপাদন শক্তি' ("Material Forces of Production") বলিতে সমাজে পণ্য উৎপাদনের শক্তিকেই বুঝাইতেছে। অন্যত্র "জীবন ধারণের জড় ভিত্তি" (Material conditions of existence) এই ভাষাও ব্যবহার করিয়াছেন ; ইহাতেও পণ্য উৎপাদন শক্তি বা অর্থনৈতিক শক্তিই বুঝাইতেছে। এদিকে জড়বাদের আলোকে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন, এই হেতুও মার্ক্সবাদকে "জড়বাদী ব্যাখ্যা" (Materialist Interpretation) বলা হয়। এই দ্বিতীয় অর্থে Material Force মানে হয় "জড়শক্তি"। এখানে দার্শনিক জড়বাদের আলোকে মার্ক্সবাদী ইতিহাস ব্যাখ্যার মানে একটু স্বতন্ত্ররকমের হয়। এই অর্থে ইতিহাস মানুষের চৈতন্য বা মনোশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত

'আর্থিক শক্তি' অর্থের অস্পষ্টতা

হয় জড়শক্তির প্রভাবে। এই অর্থের অস্পষ্টতার দরুণ মার্ক্সবাদের বিভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যা সৃষ্টি হইয়াছে। বিশ্ববিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক সেলিগ্‌ম্যান (Prof. Seligman) তাঁহার "ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা" ("Economic Interpretation of History") নামক বইয়ে "জড়বাদী ব্যাখ্যা" (Materialist Interpretation)—এই ভাষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে "জড়বাদী" শব্দটি মার্ক্স যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অন্যায় ও ভ্রান্তিকর হইয়াছে। "আর্থিক ব্যাখ্যা" (Economic Interpretation), এই আখ্যাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। "জড়" পারিপার্শ্বিক বলিতে যদি প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক পরিবেশ বোঝান হইয়া থাকে, তবে আর্থিক ও ভৌগোলিক ব্যাখ্যার মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে না। মার্ক্সবাদীদের মধ্যে একদল—কাউটস্কি, সোমবার্ট (Kautsky, Sombart) প্রভৃতি অর্থনৈতিক শক্তি (Economic Factor) বলিতে যন্ত্রকৌশল (technique) মানে করিয়াছেন। অপর-পক্ষে এঙ্গেলস্, (Engels), সেলিগ্‌ম্যান, (Seligman), কুনাউ, (Cunow, ম্যাসারিক, (Masaryck), ষ্ট্যালিন (Stalin) প্রভৃতি ব্যাখ্যাতারা ইহার আরও ব্যাপক অর্থ করিয়াছেন। ইহাদের মতে "আর্থিক শক্তি" (Economic conditions) মানে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান বা শক্তি, যথা, ভৌগোলিক-পরিস্থিতি, প্রাকৃতিক ধনসম্ভার, যানবাহনাদি, বাণিজ্য-পদ্ধতি, শ্রমিকশ্রেণী, জনসংখ্যা ইত্যাদি সমস্ত কিছু। (ষ্ট্যালিন বলেন—" 'অর্থশক্তি'.... মানে হইল, জীবনধারণের উপযোগী জীবিকা সংগ্রহের পদ্ধতি ; অর্থাৎ ভৌতিক প্রমূল্য বা ঐহিক জীবনের এমন সব বস্তুসম্ভার—যথা, খাদ্য, বস্ত্র, পাদুকা, ঘর, ইন্ধন, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি বা কলকারখানা প্রভৃতি উৎপাদন করিবার পদ্ধতি যা জীবনধারণ ও সমাজবিকাশের জন্য অত্যাবশ্যক।"*)

* "This force...... ..is the method of procuring the means of life necessary for human existence. The

অর্থনীতি= টেক্‌নিক্ (উৎপাদন-কৌশল ও যন্ত্রপাতি)

প্রথমতঃ, যদি যন্ত্র-কৌশল (technique) অর্থ ধরিয়া লই তবে দেখা যায় যে technique বা একযুগের বা দেশের উৎপাদন-কৌশল ও যন্ত্রপাতি সেই যুগের সভ্যতা বা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সৃষ্টি বা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। কারণ যন্ত্রপাতি (technique) নিজেই সভ্যতার একটি অঙ্গ বিশেষ এবং উল্‌টাইয়া লইয়া বলিলেই ঠিক বলা হইবে যে সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান যে স্তরে থাকে যন্ত্রপাতিই বরং সেই স্তরে থাকে অর্থাৎ বিজ্ঞানের দ্বারাই যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই এই অর্থে আর্থিক ব্যাখ্যা অর্থহীন হয়।

যদি অর্থনীতি বলিতে এঙ্গেল্‌স্ ইত্যাদির ব্যাপক অর্থ ধরা যায়, তাহা হইলে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা আরও অর্থহীন হইয়া পড়ে। যদি অর্থনীতি বলিতে সমাজের সমস্ত উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং ভৌগোলিক স্থিতি ও জনসংখ্যা বা বংশতত্ত্ব সবই বোঝায় তবে "অর্থনীতির" মানে কিছুই থাকে না। ইতিহাস ব্যাখ্যা করিতে হইলে ইতিহাসের মূলে যে শক্তি প্রেরণা জোগাইতেছে এবং সামাজিক জীবনের সমস্তদিকের পরিবর্তনের নিয়ন্ত্রকরূপে কাজ করিতেছে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ষ্ট্যালিন বলিতেছেন যে ভৌগোলিক শক্তির বা জনসংখ্যার ক্ষয়বৃদ্ধির প্রভাব থাকিলেও ইহারা মূল বা আদি নিয়ন্ত্রক নয়। আদি নিয়ন্ত্রক হইল উৎপাদন-ব্যবস্থা (Production)। ("কোন সমাজের উৎপাদন-পদ্ধতি যেরূপ, সমাজের

---

mode of production of material values—food, clothing, footwear, houses, fuel, instruments of production, etc.—which are indispensable for the life and development of the society."

চিন্তাধারা, রাজনৈতিক মতামত ও প্রতিষ্ঠান এবং সমাজও প্রধানতঃ সেইরূপই হইয়া থাকে।"* (ষ্ট্যালিন))

দ্বিতীয়তঃ, একথা বলা চলে যে যদি মানুষের ধর্ম, বিজ্ঞান, বিবাহ, দর্শন, আইন, শিল্প, সাহিত্য, সবই উৎপাদন-ব্যবস্থার অনুসারে রূপ ধারণ করে তবে ইহাও বলা চলে যে উৎপাদন-ব্যবস্থাও ভৌগোলিক পরিস্থিতির অনুসারে রূপ ধারণ করে। অতএব বরং গোড়াতে মানুষকে প্রাকৃতিক সম্পদ অনুযায়ী উৎপাদন করিতে হয়, এই কারণে ইতিহাসের ভৌগোলিক ব্যাখ্যাই অধিকতর সমীচীন হয়। লা প্লে (Le Play) নামক বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিত অর্থনীতিকে ভূগোলের উপর নির্ভরশীল বলিয়া ইতিহাসের ভৌগোলিক ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ, যন্ত্রকৌশলই হউক (Technique) কিম্বা উৎপাদন-ব্যবস্থাই (Productive system) হউক, ইহার কোনটিই স্থির হইয়া বসিয়া থাকে না, সতত পরিবর্তিত হইতে থাকে। একই ভৌগোলিক পরিস্থিতিতে কয়েকশ' বছরের মধ্যেই বিভিন্ন প্রকারের উৎপাদন-ব্যবস্থা মানুষ সৃষ্টি করিয়া লইতেছে, ইহা সর্বদাই দেখা যায়। ইহাতে প্রমাণ হয় মানুষের উদ্ভাবনী বুদ্ধি-শক্তিই এই উৎপাদন-ব্যবস্থার মূলে। ইহাতে ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা নয়, বরং মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাই অধিক যুক্তিযুক্ত প্রমাণিত হয়। কিন্তু আমরা আগেই বলিয়াছি যে কেবল মানুষী শক্তিই সংস্কৃতির একমাত্র মৌলিক কারণ নয়। মানুষী শক্তি এবং বাহ্য প্রকৃতি এই দুই শক্তির বহুমুখী সমবায়ের ফলেই সমাজ ও সভ্যতার গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই ইতিহাসের একবাদী ব্যাখ্যা ভুল এবং বহুবাদী ব্যাখ্যাই বিজ্ঞান-সম্মত।

---

* "Whatever is the mode of production of a society, such in the main is the society itself, its ideas and theories, its political views and institutions." (Stalin)

(অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার মূলকথা হইল এই যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন পূর্বে ঘটে এবং তাহারই ফলে সামাজিক জীবনের অন্যান্য দিকে (ধর্মে, বিবাহে, সাহিত্যে, শিল্পে, রাষ্ট্রে ইত্যাদিতে) অবার্থভাবে পরিবর্তন ঘটে।' এখানে অর্থনীতি হইল কারণ এবং সমাজ-জীবনের অন্যান্য দিক হইল তাহারই কার্য বা ফল। / এখানে সামাজিক জীবনে যে কার্যকারণক্রম (Law of Causality) ধরিয়া লওয়া হইয়াছে তাহা একপেশে এবং বিজ্ঞানবিরোধী। বর্তমান বিজ্ঞানে একপেশে কার্য-কারণবাদ ও নিয়ন্ত্রণবাদ (Causality and determinism) বর্জিত হইয়া ক্রিয়াত্মক সহসম্পর্ক (Functional Co-relation) স্বীকৃত হইয়াছে। কার্য এবং কারণের কোনও চিরস্থায়ী ও একমুখী সম্বন্ধ নাই। যাহা কারণ তাহাই আবার অন্য অবস্থায় বা অন্যদৃষ্টিতে কার্য হইতে পারে। এইরূপে যাহা কার্য তাহা আবার কারণও হইতে পারে। এই কারণে সমাজ-জীবনে সকল অঙ্গই পরস্পরের সহিত এমনভাবে জড়িত যে এক অঙ্গের কোনও পরিবর্তন ঘটিলে অপর সকল অঙ্গেই তাহার প্রতিক্রিয়া ঘটিবে। এই পারস্পরিকতাই (co-relation) বিজ্ঞান-সম্মত। কাজেই অর্থনৈতিক জীবনে পরিবর্তন ঘটিলে সমাজের অন্যান্য দিকেও পরিবর্তন কিছু না কিছু ঘটিবে। তেমনি সমাজের অন্য যে কোনও দিকে পরিবর্তনের ফলেও অর্থনৈতিক জীবনে পরিবর্তন ঘটিবে। এখানে সমাজ-জীবনের যে কোনও একটি দিককে কারণ ধরিয়া লইয়া অপরাপর দিকের উপর তাহার প্রভাব বাহির করা বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য প্রয়োজন হইতে পারে। (সেই হিসাবে অর্থনীতিকে কারণ ধরিয়া তাহার প্রভাব বাহির করার বৈজ্ঞানিক মূল্য আছে। কিন্তু ইহাকে আংশিক সত্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহাই একমাত্র সত্য নয়। কারণ, অর্থনীতিকেও ধর্মজীবন প্রভাবিত করিতেছে,

রাষ্ট্রের প্রভাবের দ্বারাও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, সাহিত্যের প্রভাব ও পারিবারিক জীবনের প্রভাব, শিল্পের প্রভাব অর্থনীতিকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।) এই হেতু কারণ (Cause) এবং কার্য (Effect) এই দুই শব্দের পরিবর্তে আজকাল পরিবর্ত্য (Variable) শব্দ ব্যবহার করাই অধিক সংগত। যাহাকে সাময়িকভাবে কারণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় তাহাকে স্বতন্ত্র পরিবর্ত্য (Independent Variable) বলা হইয়া থাকে এবং যাহার উপর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ঘটিয়াছে তাহাকে পরনির্ভর পরিবর্ত্য (Dependent Variable) বলা যুক্তিযুক্ত। যেমন, (ম্যাক্স ভেবর (Max Weber) তাহার গবেষণায় ধর্মের প্রভাবই অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, এই মতবাদ প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ধর্মই কারণ (Cause) এবং অর্থনীতি তাহার কার্য (Effect) মাত্র।) তেমনি বিজ্ঞানকে কারণ ধরিয়া অর্থনৈতিক জীবনে তাহার প্রভাব বাহির করাও চলিতে পারে। এই পারস্পরিকতা স্বীকার করিলে একমাত্র অর্থনীতিকেই চিরস্থায়ী কারণ এবং অপর সকলদিকের জীবন শুধু অর্থনীতিরই সৃষ্টি, এই তত্ত্ব ও মতবাদ নিতান্ত একপেশে হইয়া দাঁড়ায়। আমরা ক্রিয়াত্মক সহসম্পর্কের (Functional Co-relation) নীতিকে সমর্থন করি; অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ (Determinism) অন্ধকার বিজ্ঞানে একপেশে প্রমাণিত হওয়ায় আমরা ইহার বিরোধী।

অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ যুক্তিশাস্ত্রের বিরোধী এবং ইহা অর্থনীতিকে এক সর্বশক্তিমান রহস্যময় Metaphysical বা Mystic শক্তি-সম্পন্ন বস্তুতে পরিণত করে। (যদি অর্থনৈতিক শক্তি সমাজ-জীবনের নিয়ামক ও আরম্ভক বা starter হয় তবে অর্থনীতিকে কে নিয়ন্ত্রণ করে? মার্ক্সীয় মতে অর্থনীতিতে সর্বাগ্রে পরিবর্তন ঘটে এবং তাহার ফলে অন্যক্ষেত্রেও পরিবর্তন শুরু হয়। কিন্তু প্রশ্ন আসে অর্থনীতিতেই বা

পরিবর্তন কেন ঘটে? ইহার উত্তর মার্ক্সবাদী দিতে পারেন নাই।) যদি বলা হয় অর্থনীতিতে **স্বভাবতঃই** পরিবর্তন ঘটে বা অর্থনীতি স্বয়ং-ক্রিয়াশীল (Self-starter) তবে অর্থশক্তিকে একটি অজ্ঞেয় রহস্যময় শক্তি অনুমান করিয়া লইতে হয়। (সোরোকিনের ভাষায় " 'স্বয়ং-চালক' অর্থনীতির মতবাদ মানেই হইল অতি চরম ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর দুর্জ্ঞেয়বাদ, কারণ ইহাতে অর্থনীতি ঈশ্বরের মতন একটা সর্বশক্তিমান সত্তা হইয়া দাঁড়ায়।"†)

অর্থনীতির এইরূপ ব্যাখ্যায় অর্থনীতির ভিতর পরিবর্তন কেন হয়, কখন হয় এবং কি পদ্ধতিতে হয় তাহা অনির্দেশ্যই থাকিয়া যায়। আর এই সমস্ত পরিবর্তনের কারণকে একটা প্রকাণ্ড অনুমানের উপর দাঁড় করানো হয়। ইহা যুক্তি-বিরুদ্ধ।

যদি অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মূলে আবার অন্য কোনও কারণকে স্বীকার করা হয় তাহা হইলে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা আর "অর্থনৈতিক" থাকেনা। যদি বলা হয় অর্থনীতিতে পরিবর্তন শুরু হয় রাষ্ট্রিক, ধর্মগত ও আইনগত পরিবর্তনের প্রভাবে তাহা হইলে অর্থনৈতিক শক্তির প্রাথমিক বা মৌলিক প্রাধান্য ঘুচিয়া যায়। ইহাতে আমাদের সমর্থিত পারস্পরিকতাবাদ বা (Interfunctional Co-relation) নীতিকেই স্বীকার করিতে হয়। ইহাতে সমস্ত সংস্কৃতি ও সমাজ-জীবনের অন্যান্য দিকগুলির অর্থনীতির উপরে স্থায়ী ও একদেশদর্শী নির্ভরতা বা অধীনতা (One-sided dependence) আর থাকে না; চালক ও চালিত, আরম্ভক ও আরদ্ধ, starter ও started এই দুইয়ের মধ্যে কোনও চিরন্তন পার্থক্য থাকেনা। যাহা চালক (Starter) তাহা আবার

† "The hypothesis of the 'self-starter' amounts to the worst kind of mysticism where the economic factor becomes a kind of God." (Sorokin)

চালিতও (started) বটে। সবদিকগুলিই পরস্পরের কারণ ও কা
দুইই। ইহাতে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা বর্জিত হয়। এই যৌক্তিক ত্রুটি এ
ব্যাখ্যাকে বিজ্ঞান-বিরোধী করিয়া তুলিয়াছে। এঙ্গেলস্, লাব্রিওলা, প্লেখানভ
প্রমুখকে বাধ্য হইয়া কখনো কখনো এই ব্যাপক ও বহুবাদী (Plura
listic) ব্যাখ্যা স্বীকার করিতে হইয়াছে, কিন্তু পরক্ষণেই অর্থনীতির প্রাধা
ঘোষণা করিয়া তাহারা আবার এই একপেশে ও যান্ত্রিক (one-sided
mechanical) অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাকেই কায়েম করিবার চেষ্টা করিয়াছেন
হয় তাহাদিগকে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা বহুবা
ক্রিয়াত্মকতাকে (Pluralistic Functionalism) স্বীকার করিতে হইবে
এই দুই ব্যাখ্যাকে একসঙ্গে গ্রহণ করা অসম্ভব। তাই তাঁহারা শেষ পর্য
অন্যান্য শক্তির (Factor) ক্রিয়াশক্তি স্বীকার করিয়াও অর্থনীতির চরম
অন্তিম প্রাধান্যকে ঘোষণা করিয়াছেন।

অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় সব পরিবর্তনের মূলে অর্থ নৈতিক শক্তিই কারণরূপে
রহিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। অর্থনীতির এই প্রাধান্য বা Primac
বা প্রাথমিকত্বের অর্থ কী? ইহার অর্থ দুই-ই হইতে পারে। প্রথমতঃ, ইহা
এইরূপ অর্থ হইতে পারে যে অর্থনীতিই "একমাত্র" কারণ, (Onl
Cause)। এই অর্থ গ্রহণ করিলে যে যৌক্তিক (Logical) সঙ্কট হ
এবং একপেশে কারণিকতাকে স্বীকার করিয়া অর্থনীতির অজ্ঞেয় অপরিমে
শক্তি অনুমাণ করিয়া লইতে হয় ইহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয় অ
এই হইতে পারে যে অর্থনীতি অন্যান্য বহু শক্তির (Factor) ভিত
একটি; কিন্তু ইহারই প্রভাব সর্বগ্রাসী বা বার আনা এই অর্থ ধরিলে
ইহার সত্যিকার অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাও বজায় থাকে না। কারণ ইহাতে
সামাজিক বিবর্তনকে বহুশক্তির (Factor) সমবেত ফল (Resultant
বলিতে হয়। তাহা ছাড়া অর্থনীতির প্রভাব বার আনা কিংব

কতটা এবং অন্যান্য শক্তিগুলির দানই বা কতটুকু তাহা যাচাই করা বা নির্ধারণ করার কোনো বৈজ্ঞানিক উপায় মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ প্রকাশ করেন নাই। প্রফেসার সেলিগম্যানও তাঁহার "ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা" পুস্তকে মার্ক্সের মৌলিকত্বের প্রশংসা করিয়াছেন। তবে তিনি অর্থনীতির একমাত্র (Exclusive) প্রভাব না বলিয়া বহুল (Preponderent) প্রভাব বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা অনুসারে বৈজ্ঞানিক নীতিতে ইতিহাস-ব্যাখ্যা দাঁড়ায় না। ইহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। এখানে অনেক মার্ক্সবাদী, এঙ্গেলসের ১৮৯৪ সালের এক পত্র উল্লেখ করিয়া থাকেন—"অন্যান্য শক্তিকে অস্বীকার করিয়া কেবল আর্থিক শক্তিরই অপ্রতিদ্বন্দ্বী কার্যকারিত্ব দাবি করা মার্ক্সের কখনোই উদ্দেশ্য ছিল না। আর্থিক পরিবেশই কারণ ও নিয়ামক, এ-কথার অর্থ এই নয় যে, অর্থনীতিই সক্রিয় শক্তি এবং অন্যান্য ঘটনা ও শক্তি কেবল নিষ্ক্রিয় পরিণাম বা কার্য। এক্ষেত্রে বরং পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াই প্রকৃত সত্য। তবে এই পারস্পরিক ক্রিয়ার ভিত্তি হইল অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং এই অনিবার্য **আর্থিক নিয়ন্ত্রণই শেষ পর্যন্ত অন্য সব কিছুকে ছাড়াইয়া কার্যকরী হইয়া উঠে।**" ‡

‡ "Marx never meant to claim an absolute validity for economic considerations to the exclusion of all other factors. It is not that the economic situation is the cause, in the sense of being only active agent while all phenomena are only a passive result. It is on the contrary a case of mutual action on the basis of economic necessity which in the last instance, always works itself out." (Letter of Engels)

এইপত্রে যদিও এঙ্গেল্‌স অন্যান্য শক্তিকে স্বীকার করিয়াছেন এবং পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের (Mutual Action) কথা বলিয়াছেন, তবু এঙ্গেল্‌সের শেষ কথাটি ঐ সমস্ত কথাকে ("mutual action" ও "other factors") ব্যর্থ ও নিরর্থক করিয়া তুলিয়াছে। এখানে "আর্থিক নিয়ন্ত্রণই শেষপর্যন্ত সবকিছু ছাড়াইয়া কার্যকরী হইয়া ওঠে" ("Economic necessity which in the last instance always works itself out")—এই কথাটিতেই অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। অর্থনীতি অন্যসব শক্তিকে দলিয়া পিষিয়া সর্বজয়ী হয় এবং পরিণামে অর্থনীতির দ্বারাই অন্য সবকিছু অমোঘরূপে নিয়ন্ত্রিত হয়, একথা বলার পর "পারস্পরিক ক্রিয়া" (mutual action) বা "অন্যান্য শক্তিকে" (other factors) নাম মাত্র স্বীকার করার কোনও অর্থ থাকে না। পারস্পরিকতা এবং অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ (economic necessity) এই দুইয়েরই সামঞ্জস্য "সোনার পাথর বাটি"র মতই অবাস্তব।

তথ্যের দিক হইতেও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা একপেশে এবং ভ্রান্ত। অর্থনীতি বা উৎপাদনের যন্ত্রকৌশল (Technique of Production) ভৌগোলিক শক্তিকে বাদ দিতে পারে না। বরং ভূগোলেরই উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয়।

তাহা ছাড়া মানুষের ব্যবহার ও সংস্কৃতি সামাজিক পরিবেশের (Social Environment) উপর নির্ভর করে। কিন্তু সামাজিক পরিবেশের মধ্যে কেবল অর্থনৈতিক শক্তিই একমাত্র কার্যকরী শক্তি নয়। এস্পিনাস (Espinas) সামাজিক পরিবেশের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াও মানুষের চিন্তাধারা ও জ্ঞানকে যন্ত্রবিজ্ঞানের (Technologyর) নিয়ন্ত্রক ও স্রষ্টা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কোন যুগের চিন্তাধারার সঙ্গে সেই যুগের যন্ত্রপাতির পারস্পরিক

সম্পর্ক আছে। ইহাদের মধ্যে কোনটি আগে কোনটি পরে তাহা একমুখী সিদ্ধান্তের দ্বারা নির্ণয় করা চলেনা। মার্ক্সবাদ বলিবে যে, কোন যুগের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রকৌশলের (Technology) উপরেই সেই যুগের জ্ঞানবিজ্ঞান নির্ভর করে। কিন্তু এই একপেশে সিদ্ধান্ত ভুল। এস্পিনাস (Espinas)† বলেন সেই যুগের চিন্তাধারা ও প্রচলিত ব্যবস্থাই বরং যন্ত্র-পদ্ধতিকে (Technology) বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করে।*

সম্পর্কটা আসলে দুইমুখী। পূর্ববর্তী জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়াই নূতন যন্ত্র তৈয়ার সম্ভব হইতে পারে এবং সেই প্রচলিত জ্ঞান তদানীন্তন ভৌগোলিক, আর্থিক ও অন্যান্য সামাজিক পরিস্থিতিকে অবলম্বন করিয়াই পরিস্থিতি অনুযায়ী যন্ত্র ও যন্ত্রের ব্যবহার-পদ্ধতি গঠন করে। থার্ণওয়ার্ল্ড (Thurnworld), এস্পিনাস (Espinas), ভেবলেন (Veblen), শ্লেটার (Slater) এমনকি ডি রবার্টিও (De Roberty) প্রকৃতপক্ষে বহুবাদী (Pluralist)। তাঁহার মতেও বিজ্ঞান বা analytical thought যন্ত্রপাতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাঁহার পুস্তকে তিনি বিস্তৃতভাবে এই মতবাদ ব্যাখ্যা ও প্রকাশ করিয়াছেন। যন্ত্রবিজ্ঞান (Technology) সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা মার্ক্সবাদের বিপরীত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছে। (সমাজতন্ত্রের স্রষ্টিকর্তা অগাষ্ট কোঁতও (August Comte) চিন্তাধারাকেই (Synthetic Thought) সমাজ বিবর্তনে স্তরভেদের মূলকারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ‡)

† 'The Ancient Society' 1878, 'The Origin of Technology' 1898.

* "It is impossible to deny the co-relation between mental and practical functions."

‡ 'A New Programme of Sociology', '1904' ; ' Sociology and Action, 1908.'

আদিমকালে মানুষ অর্থনীতি দ্বারা যতটা নিয়ন্ত্রিত হইত তাহার অপেক্ষা জৈবিক (Biological) ও ভৌগোলিক শক্তির (Geographical Factor) দ্বারা অনেকবেশী নিয়ন্ত্রিত হইত। এ কথা এঙ্গেলস্ও † স্বীকার করিয়াছেন। এই দুই শক্তি অর্থনৈতিক শক্তি (Technique) হইতে অনেক আদিম ও মৌলিক বৃত্তি। মানুষের ইতিহাসে এই দুই শক্তির ক্রিয়া অর্থনীতির অনেক পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছে।

আদিম মানব যৌনবৃত্তি (Sex Factor) দ্বারা প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত। এঙ্গেলস্ও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। ফ্রয়েড্ তো (Freud) সমগ্র মানব ইতিহাসকেই যৌনবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অবশ্য ফ্রয়েড্ও তাঁহার একপেশে মতকে শেষজীবনে সংশোধন করিয়া বহুবাদী ব্যাখ্যাকে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সংক্ষেপে এ কথা বলা চলে যে অন্তকার বিজ্ঞান ফ্রয়েডের গবেষণাকে বাদ দিয়া চলিতে পারে না। ফ্রয়েড্ নিজেই অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা যে কত একপেশে ও অসম্পূর্ণ তাহা প্রতিবাদের সহিত ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

আদিম মানব কেবল যে যৌনবৃত্তি (Sex) ও বুভুক্ষা (Hunger) দ্বারাই প্রভাবিত হইয়া ব্যক্তিগত জীবনযাপন করিত তাহা নয়। আদিম মানুষের বুদ্ধি তাহাদের ম্যাজিক (Magic) এবং তাহাদের টাবু ও ধর্ম-সম্পর্কীয় ধারণা ইত্যাদি দ্বারাও তাহারা প্রভাবিত হইত। তাহাদের সামাজিক এবং অতএব, অর্থনৈতিক জীবনও, সম্পূর্ণরূপে এইসব ধারণা দ্বারা (ম্যাজিক ইত্যাদি) প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হইত। অর্থনীতি ইহাদের সৃষ্টি করে নাই ইহারাই অর্থনীতিকে সৃষ্টি করিয়াছে। ম্যালিনাউস্কী (Malinowsky), লাউয়ী (Lowie), ম্যারেট (Maret), টাইলর

† তাঁহার "পরিবারের উৎপত্তি" বইয়ের ভুমিকা দ্রষ্টব্য।

(Tylor), ফ্রেজর (Frazer), ওয়ালিস্ (Wallis), প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ্‌দের গবেষণায় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।

যেমন আদিম মানুষের জীবন ম্যাজিক ইত্যাদিকে বাদ দিয়া সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য, তেমনি ধর্মকে বাদ দিয়া আদিম, প্রাচীন বা আধুনিক কোন সমাজের জীবনকে বোঝা অসম্ভব। ধর্মের প্রভাব সমাজকে তথা অর্থনীতিকে প্রবলভাবে চিরদিনই নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। কনফুসিয়াস, বুদ্ধ, মহম্মদ, খৃষ্ট ইত্যাদির প্রবর্তিত ধর্মগত চিন্তাধারা সমাজের অর্থনৈতিক জীবন ও প্রণালীকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। ইহাদের প্রভাবে প্রচলিত অর্থনৈতিক প্রণালীতে যে সব গভীর পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা কেবলমাত্র সেই যুগের পারিপার্শ্বিকের দ্বারা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। এ ক্ষেত্রেও পারস্পরিকতা বা বহুমুখী কার্যকারণ-শৃঙ্খলা এই সব পরিবর্তনের মূলে রহিয়াছে।

অর্থনীতি যে ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে ম্যাক্স ভেবার (Max Weber) তাহা বিস্তৃত গবেষণায় প্রমাণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে, চীনদেশে প্রাচীন জগতে, মধ্যযুগে, এবং আধুনিক কালের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে ধর্ম, ম্যাজিক ও ঐতিহ্যের দ্বারা সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (প্রটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম ধনতন্ত্রের (Capitalism) উৎপত্তির মূলে এবং রিফরমেশন (Reformation) ব্যতীত ধনতন্ত্র স্থাপিত হইতে পারিত না।) ধনতন্ত্রের গোড়ায় আছে—ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং যন্ত্র। কিন্তু ব্যক্তিস্বাধীনতা ব্যতীত বিজ্ঞান ও যন্ত্র কোনটি সম্ভব হইত না। (মধ্যযুগীয় সমাজে যে গিল্ড (Guild) ব্যবস্থা, এবং রাষ্ট্র ও চার্চের যে কঠোর পীড়ন মানুষের চিন্তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল তাহা হইতে মুক্তি আনিয়াছে ষোড়শ শতাব্দীর রিফরমেশন (Reformation)। মানসিক মুক্তি ও ব্যক্তিস্বাধীনতা স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়াই আঠার

শতকে ধনতন্ত্রের স্থাপন সম্ভব হইয়াছিল। অর্থাৎ আগে মানুষের চিন্তাধারায়, ধারণায় ও মনোলোকে পরিবর্তন হয় এবং তারই প্রভাবে সামাজিক প্রথা ও ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

ফ্রেজার (Frazer) নৃতত্ত্বে এ যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। তাহার মতে ম্যাজিক ও কুসংস্কার পর্যন্ত মানুষের সমাজকে গড়িয়াছে। এমনকি কুসংস্কারের মোটামুটি প্রভাব সমাজের পক্ষে কল্যাণকরই হইয়াছে, একথা তিনি বলেন। অর্থনীতি নিয়ন্ত্রক তো নহেই, বরং অর্থনীতি এই সব নানা প্রথা ও ধারণার দ্বারা সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

রস (Ross), সোরেল (Sorel), এলউড্ (Ellwood), লা বোঁ (Le Bon), প্রভৃতির মতেও সভ্যতার বৃদ্ধি এবং ক্ষয়ের মূলে ধর্মের বৃদ্ধি এবং ক্ষয় রহিয়াছে। বেঞ্জামিন কিডের * (Benjamin Kidd) মতেও সমস্ত সামাজিক প্রগতির মূলে রহিয়াছে ধর্ম। সমাজ প্রগতি সম্ভব হইয়াছে পরহিতবৃত্তি ও মানুষের আত্মত্যাগের দ্বারা। সমাজে যে জীবনসংগ্রাম চলিয়াছে তাহাতে বহুর আত্মত্যাগের দ্বারাই প্রগতি সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু এই আত্মত্যাগের প্রেরণা বুদ্ধিবৃত্তি হইতে আসে নাই কারণ বুদ্ধিবৃত্তি স্বার্থপর। এই পরার্থপরতা ও আত্মত্যাগবৃত্তি আসিয়াছে একটি পরা-মানসিক (Ultra-rational) বৃত্তি হইতে। কিডের মতে এই বৃত্তিই ধর্ম।

অর্থনীতি সমাজ-জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক্। ইহার সহিত অন্যান্য দিকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। এই সম্পর্ক বিভিন্ন ডিগ্রীর বা পরিমাণের হইতে পারে। ইহা কখনও বেশী কখনও কম এবং কোনও দিকের সঙ্গে বেশি, ও কোনও দিকের সহিত কম হইতে পারে। এই সম্পর্কের (Co-relation) তারতম্য নানাদিক হইতে পণ্ডিতেরা অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং এই

আত্মহত্যা ও সামাজিক অপরাধ

* "Social Evolution" (1898)

সব গবেষণার সিদ্ধান্ত মার্ক্সীয় একদৈশিক ক্রিয়াকারিত্বকে (One-sided causality) খণ্ডন করিয়াছে। অর্থনীতির সহিত অন্যান্য দিকের একটা চিরস্থির অনড় সম্পর্ক রহিয়াছে এ কথা গবেষণার তথ্যসংগ্রহ হইতে প্রমাণ হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটি লওয়া যাক। যথা, অপরাধ ও আত্মহত্যা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ব্যাপার। সাধারণ দৃষ্টিতে ও মার্ক্সীয় মতে, স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত এই হইবে যে দারিদ্র্যই ইহাদের স্রষ্টা। কিন্তু দুরখীমের (Durkheim) বিখ্যাত পুস্তকে আত্মহত্যার যে সংখ্যাতালিকা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে প্রমাণ হয় যে অর্থনীতির সহিত আত্মহত্যার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ নয়। দরিদ্রশ্রেণী হইতেই যে অধিকতর সংখ্যায় আত্মহত্যা ঘটিয়াছে তাহা নয়। উনিশ শতকে জীবনযাত্রার মানে উন্নতি সত্ত্বেও আত্মহত্যার হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। 'সামাজিক অপরাধের' (Crimes) সহিতও অর্থনীতির তেমন স্থায়ী সম্পর্ক দেখা যায় না। অবশ্য সম্পত্তিগত অপরাধ স্বভাবতঃই অনেকাংশে অর্থনৈতিক কারণে হয়। কিন্তু অন্যান্য অপরাধ দূরের কথা, এমন কি সম্পত্তিগত অপরাধও (Crimes against property) শেষ পর্যন্ত কেবলমাত্র অর্থনৈতিক শক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে না। জর্জ রিচার্ড (George Richard) নামক পণ্ডিতের গবেষণা এবং সোরোকিনের গবেষণা * ইত্যাদির দ্বারা প্রমাণ হয় যে উনিশ এবং বিশ শতকের আর্থিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অপরাধেরও বৃদ্ধি হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ দরিদ্রশ্রেণী হইতেই যে অধিকতর অপরাধ হয় তাহা নয়। বরং বহুসংখ্যক ধনী ব্যক্তিই সম্পত্তি-সম্পর্কিত অপরাধে জড়িত থাকেন।

(অপরাধ-বিজ্ঞানে (Criminology) যে কেবল অর্থনীতিই প্রধান নায়ক তাহা নয়। অন্যান্য শক্তিও (Factor) যথা, যৌনবৃত্তি (Sex),

* "Crime and Punishment"

ক্ষমতালিপ্সা (Love of Power) ইত্যাদি জৈবিক (Biological) ও মানসিক (Psychological) প্রেরণাও সামাজিক অপরাধের কারণ।)

বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক প্রফেসর গিন্‌স্‌বার্গ (Ginsberg), হবহাউস (Hobhouse) ও হুইলার (Wheeler), চারিশত হইতে অধিক আদিম জাতির সমাজজীবন তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, অর্থনীতির সহিত এই সব অসভ্যদের ধর্ম, রাষ্ট্র, পরিবার, যুদ্ধ, ন্যায়ধর্ম (Justice), নারী-মর্যাদা ইত্যাদির সম্পর্ক কতখানি গভীর ও শাশ্বত তাহা নির্ধারণ করা। তাঁহাদের গবেষণার ফল "অসভ্য জাতিদের ঐহিক কৃষ্টি এবং সামাজিক রীতিনীতি" † নামক বিখ্যাত পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন। আর্থিক (Material বা Economic) জীবন-পদ্ধতির সহিত সংস্কৃতির (Culture) যে সম্বন্ধ ইহারা এই সম্পর্কে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে মার্ক্সীয় আর্থিক নিয়ন্ত্রণবাদ (Economic Determinism) সমর্থিত হয় না। একই প্রকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সহিত বিভিন্ন প্রকারের সংস্কৃতি (রাষ্ট্র, পরিবার ইত্যাদি) পাওয়া যাইতেছে। অর্থনীতির সহিত এই সব রীতিনীতির প্রত্যক্ষ কার্যকারণ সম্বন্ধ পাওয়া যায় না। একই প্রকার রাষ্ট্রের সহিত বিভিন্ন প্রকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত রহিয়াছে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্তর অনুসারে ইহারা অসভ্যজাতিগুলিকে নিম্নলিখিত প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন—

শিকারী (Hunter)—(১) নিম্ন (Lower)
(২) উচ্চ (Higher)

† "The Material Culture And Social Institutions of The Simpler Peoples."

কৃষিজীবী—(১) নিম্নতম (Agricultural lowest)
কৃষিজীবী—(২) উচ্চতর (Agricultural higher)
পশুপালক—(৩) নিম্নতর (Pastoral lower)
পশুপালক—(৪) উচ্চতর (Pastoral higher)
কৃষিজীবী—(৫) উচ্চতম (Agricultural still higher.)

এই সব তালিকা হইতে দেখা যায় শাসনব্যবস্থা বা রাষ্ট্রপ্রথা ইহাদের ...থিক প্রথার সহিত তাল রাখিয়া চলে না। পশুপালকদের অর্থ-...বস্থা বা জীবিকারীতি শিকারীজীবীদের চাইতে উন্নত; অথচ দেখা ...ইতেছে পশুপালকদের মধ্যে বংশানুক্রমিক শাসনব্যবস্থা কম এবং ...কারজীবীদের মধ্যেই বরং বেশী সংখ্যায় প্রচলিত। এমন কি উন্নত ...ষিজীবীদের চাইতেও শিকারজীবীর মধ্যে এই শাসনপ্রথা বেশী। ...বাহপ্রথা সম্বন্ধেও একই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। শিকারী বা পশুপালকদের ...ইতেও কৃষিজীবীদের মধ্যে মাতৃতন্ত্রীর সংখ্যা বেশি। অথচ আর্থিক ...রপর্যায় অনুসারে মার্ক্সীয় মতে শিকারী ও পশুপালকদেরই মাতৃতন্ত্রী হওয়া ...চিত ছিল। আবার বিবাহ কৃষিজীবীদের চাইতেও নিম্ন-শিকারীদের ...ধ্যেই বেশি স্থায়ী। এই সব বিশ্লেষণ এবং বিচার হইতে গিন্‌স্‌বার্গ ...মুখ পণ্ডিতেরা অর্থনীতি এবং সমাজ-জীবনের মধ্যে কার্যকারণের কোন ...মোঘ সম্পর্ক নাই বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

উল্লিখিত শ্রেণী-বিভাগের ভিত্তিতে তাঁহারা যে সংক্ষিপ্ত তালিকা ...রিয়াছেন তাহার কিছু দৃষ্টান্ত পরিশিষ্টে দেওয়া গেল।

এই সব তালিকা হইতে এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হইয়াছে যে অর্থনীতিকে ...মাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের একমাত্র নিয়ন্ত্রক বলা চলে না।

ডায়ালেক্‌টিক প্রয়োগে ত্রুটি

সংক্ষেপে মার্ক্সীয় আর্থিক ব্যাখ্যার একদেশদর্শিত্ব আমরা দেখাইয়াছি ইহার পর মার্ক্সবাদে ভিত্তিগত অন্যান্য পরস্পর-বিরোধ (Contradiction আমরা আলোচনা করিব। অর্থনৈতিক শক্তি ও (Economic factor এবং Dialectic) ডায়ালেকটিক, এই দুইটি তত্ত্বই মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্বের মৌলিক তত্ত্ব। কেবল অর্থনীতিই যে সমাজ-জীবনের বিবর্তনে একমাত্র ও অদ্বিতীয় শক্তি নয় তাহাই সংক্ষেপে ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এখন ডায়ালেক্‌টিকের প্রয়োগ যে ত্রুটি সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই আলোচনা করিব।

ইতিহাসকে জড়তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মার্ক্স জড়শক্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত একটা বিশিষ্ট শক্তির ও স্বভাবের কল্পনা করিয়াছেন। এই মতে পৃথিবীর উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষ জড়বস্তুর একটি উপসৃষ্টি বা Bye-product মাত্র। কিন্তু এই জড়বস্তুর মধ্যে এমন একটা অব্যক্ত ও গূঢ় শক্তি আছে যাহার প্রভাবে জড়বস্তু সততই আত্মবিরোধ ও সংঘর্ষ সৃষ্টি করিতেছে। বিরোধ সৃষ্টি করিয়া তাহার সমাধানও এই অজ্ঞেয়শক্তির বলেই হইতেছে। এই নীতিকে ডায়ালেক্‌টিক্ বলা হয়। স্থিতি (Thesis) ও প্রতিস্থিতির (Anti-thesis) বিরোধের মধ্য দিয়া একটি নতুন ও উচ্চতর সামঞ্জস্য সৃষ্টি হইতেছে। এই প্রণালীতেই বিশ্বসংসারের সবকিছু ঘটিতেছে। জড় হইতে প্রাণ ও মনের উৎপত্তি এই অব্যর্থ ডায়ালেক্‌টিক্ নীতিকে অনুসরণ করিয়াই হইতেছে। এই তিন ধাপের ফরমুলা প্রকৃতির স্তরে স্তরে অনিবার্যরূপে কাজ করিতেছে। মানুষের সমাজেও যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহা এই নীতিরই অমোঘ ফরমুলা অনুসারে ঘটিতেছে। মানব-সমাজের বিবর্তন এই ফরমুলার লৌহশিকলে বাঁধা। মানুষ ও পারিপার্শ্বিক এই দুই শক্তিও পরস্পরের সহিত সংঘর্ষে আসিতেছে এবং নিত্য নূতন পরিবর্তন সৃষ্টি করিতেছে। মানুষ জড় পারিপার্শ্বিকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

এখানে প্রশ্ন হইতেছে এই যে মানুষের স্বাতন্ত্র্য আছে কিনা। মার্ক্সবাদ অনুসারে, আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি,—মানুষের স্বাতন্ত্র্য নাই। মানুষ ও তাঁর চেতনা পারিপার্শ্বিকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা determined। এই হেতু মার্ক্সবাদের ভিত্তি হইল নিয়ন্ত্রণবাদ (Determinism)। মার্ক্স-বাদীরা নিয়ন্ত্রণবাদ ও যান্ত্রিকতাবাদ এই দুই নীতির মধ্যে পার্থক্য আরোপ করিয়া বলিয়া থাকেন যে তাহারা নিয়ন্ত্রণবাদের সমর্থক কিন্তু যান্ত্রিকতাবাদ তাহারা সমর্থন করেন না। জীববিজ্ঞান Biology, মনোবিজ্ঞান, ও দর্শন শাস্ত্রে যেমন তাহারা যান্ত্রিকতাবাদকে অস্বীকার করিয়াছেন, তেমনি সমাজতত্ত্বেও তাহারা যান্ত্রিকতাবাদকে অস্বীকার করেন। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ-বাদের সহিত যান্ত্রিকতাবাদের পার্থক্য কোথায় তাহা ইহারা স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করিতে পারেন নাই। মানুষের সমস্ত ব্যবহার ও চিন্তাধারা যদি জড় পরিবেশদ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রবর্তিত হয় তাহা হইলে মানুষ পারিপার্শ্বিকের হাতে যন্ত্র বই আর কিছু নয় ; এঙ্গেল্সের উক্তিতে তার সমর্থন পাই—"সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ, ধর্ম ও আইন ব্যবস্থা, সমাজ বিবর্তনের মুখে যে সব চিন্তাধারা ও আদর্শ উদ্ভূত হয়,—এ সবের অর্থ বোঝা সম্ভব হয় তখন, যখন ঐ যুগের জড় পরিবেশ বা আর্থিক পরিবেশকে ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা হয়। কারণ ঐ সব আইন, ধর্ম, রাষ্ট্র ইত্যাদি জড় পরিবেশ হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে।" *

যান্ত্রিকতাবাদ ও নিয়ন্ত্রণবাদ

* "All social and political relations, all religious and legal systems, all the theoretical out-looks which emerge in the course of history are to be comprehended only when the material conditions of life of the respectively corresponding epochs are understood and former are derived from these material conditions." (Review on Critique of Political Economy, p. p. 95.)

মার্ক্সের বিখ্যাত উক্তি "মানুষের চেতনা তার সত্তার নিয়ামক নয়·····
—"It is not consciousness which determines being.. ..."
ইত্যাদি মানুষের স্বাতন্ত্র্যকে কোন স্থান দেয় নাই। সমাজতত্ত্বেও এঙ্গেলে
ভাষায় রাজত্ব করে গতিতত্ত্বের বিধানগুলি (Laws of Motion)। †

যদিও এঙ্গেল্স, মানবসমাজের প্রকৃতির রাজ্য হইতে কিছু পার্থ
আছে এবং মানুষের ব্যক্তিগত চেতনা ও ইচ্ছা আছে বলিয়া স্বীক
করিয়াছেন, তবু এই পার্থক্যের বা মানুষের এই বৈশিষ্ট্যের শেষ পর্য
কোনও মূল্য নাই এই কথাই ঘোষণা করিয়াছেন। §

এঙ্গেল্সের আলোচনায় ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে প্রথম দৃষ্টি
মানুষের ব্যক্তিগত রুচি ও ইচ্ছার অস্তিত্ব চোখে পড়িলেও এই ব্যক্তিগ
ইচ্ছা বা motive আসলে একান্ত নিরর্থক ও অক্ষম। ইতিহাসে যা
ঘটে তাহার সহিত কোনও ব্যক্তির ইচ্ছার দূর সম্পর্কও নাই। আস
মানবসমাজও জড় প্রকৃতিরই মত নিরপেক্ষ ও অমোঘ কতকগুলি বিধানে

† "General laws of motion which assert themselv
as the ruling ones in the history of human society."
আবার, (Feurbach, p. 59

"Thus Dialectics reduces itself to the science
the General laws of motion." (Feurbach p. 58)

§ "But this distinction.........cannot alter the fact th
the course of history is governed by inner general law
.........thus the conflict of innumerable individual wi
and individual actions in the domain of history produces
state of affairs entirely analogous to that in the real
of unconscious nature." (Feurbach, p.59)

(Laws) বশীভূত। গতিতত্ত্ব (Laws of motion) জড় বস্তুকে যেমন চালাইতেছে মানব সমাজকেও তেমনি চালাইতেছে। এ কথা মার্ক্স-ও "ক্যাপিটাল" পুস্তকের ভূমিকায় ও অন্যত্র বলিয়াছেন। তাঁহার "অর্থশাস্ত্রের আলোচনা" (Critique of Political Economy) পুস্তকের ভূমিকায়ও "অপরিহার্য ও মানুষের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ" ('Indispensable and independent of human will")—এই ভাবায় তিনি মানুষের স্বতন্ত্র ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে আপাতদৃষ্টিতে যে স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি মানুষের দেখা যায় তাহা একান্ত কাল্পনিক (Illusory)

এই নীতিকে যান্ত্রিকতাবাদ (mechanism) ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? প্রকৃতির ক্ষেত্রে জড়বস্তু যখন গতিতত্ত্ব দ্বারা চালিত হইয়া নানা বস্তু বা ঘটনা সৃষ্টি করে তখনই আমরা যান্ত্রিকতাবাদের কথা বলিয়া থাকি। পৃথিবীর ঘটনাগুলি যন্ত্রবিজ্ঞান বা গতিতত্ত্ব (Laws of Motion) অনুসারে ঘটে, এই তত্ত্বকেই যান্ত্রিকতাবাদ বলা হয়। মানুষের ক্ষেত্রেও যদি সমস্ত ঘটনা গতিতত্ত্বের দ্বারা চালিত হইয়া যন্ত্রবিজ্ঞানের (Law of Mechanics) নিয়মানুসারে ঘটে তবে এ ক্ষেত্রেও যান্ত্রিকতাবাদের (Mechanism এর) শাসন রহিয়াছে এ কথা মার্ক্সবাদ কী করিয়া অস্বীকার করিবে?

পুরুষকার ও দৈব (Freedom ও Necessity) এই দুই শব্দের যে অর্থ হেগেলকে অনুসরণ করিয়া মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ করিয়াছেন তাহাতে পুরুষকার (Freedom) অর্থ হয় সজ্ঞানে দৈবকে (Necessity) স্বীকার করা এবং দৈব (Necessity) অনুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করা। প্রকৃতির রাজ্যে (এবং মানব সমাজে) যে অকাট্য প্রাকৃতিক বিধির শাসন রহিয়াছে, যে সব বিধান বা laws-এর শৃঙ্খলে জড়জগৎ ও মানুষ বাঁধা রহিয়াছে তাহাকে জানিয়া শুনিয়া মানিয়া লওয়াই হইল পুরুষকার বা স্বাতন্ত্র্য বা Freedom। ইহা ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার Freedom সম্ভব

নয়। ইহাতেও এই কথাই প্রমাণিত হয় যে মানুষ প্রাকৃতিক শাসনের দাস মাত্র। "ফয়ারবাক সম্বন্ধে এগার সূত্র" (Eleven Thesis on Feurbach) বইয়েও মার্ক্স "পরিবেশ মানুষ কর্তৃক পরিবর্তিত হয়" ("Circumstances are changed by men") ইত্যাদি বলিয়াও মানবত্বকে (৬নং সূত্র বা Thesis এ) সামাজিক সম্বন্ধের সমষ্টিমাত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। মার্ক্সের ভাষায় মানবত্ব বা মানবিক সারপদার্থ "Human essence"আর কিছুই নয়—ইহা আসলে "সামাজিক সম্পর্কেরই সমবায় মাত্র"—"The ensemble of the social relations" মাত্র মার্ক্স বলিয়াছেন প্রাকৃতিক বিধিকে জানিয়া মানুষ যখন কেবল সেই বিধি অনুসারেই জীবন ও সমাজকে রচনা করিবে তখন মানবজাতি 'দৈবের রাজ্য হইতে পুরুষকারের রাজ্যে প্রবেশ করিবে।'* এখানে পুরুষকার মানে হইল পূর্বোক্ত প্রাকৃতিক বিধানের বাধ্যতা বা আনুগত্য। কাজেই মার্ক্সবাদ আসলে যন্ত্রবাদ বা mechanism এ-ই পর্যবসিত হয়।

ডায়ালেকটিকের প্রভাবে যেমন একদিকে **বাঁধাধরা নিয়মে সামাজিক স্তর** সৃষ্টি হইবে এবং প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ বা যান্ত্রিকতা (Determinism বা mechanism) স্বভাবতঃই একটা অবশ্যম্ভাবী পদ্ধতিরূপে পরিণত হইবে, তেমনি ডায়ালেকটিকের আর এক পরিণতি হইবে সংঘর্ষ বা conflict। সমস্ত পরিবর্তনের মূলে রহিয়াছে সংঘর্ষ, স্থিতি ও প্রতিস্থিতির (Thesis, Antithesis) চিরন্তন দ্বন্দ্ব। সামাজিক বিবর্তন সম্বন্ধে মার্ক্সবাদীয় বিশেষত্ব হইল এই সংঘর্ষ (Conflict)। "পৃথিবীর ইতিহাসই হইল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস,'†

সংঘর্ষ বা Conflict

*"Jump from the kingdom of necessity into that of freedom."

† "History of the world is the history of class-struggle."

—মার্ক্স এই বাক্যের দ্বারাই ইতিহাস ব্যাখ্যার দ্বিতীয় তত্ত্বটিকে স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইতিহাস ব্যাখ্যার এই দৃষ্টি-ভঙ্গী নিতান্তই একপেশে ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। মানবজাতির অগ্রগতি, সমাজ ও সংস্কৃতি সব কিছুই সংঘর্ষের মধ্য দিয়া ঘটিয়াছে ইহা ঐতিহাসিক তথ্যের দ্বারা সমর্থিত হয়না। সমাজ গঠনের মূল যে সহযোগিতাই (Co-operation) বেশি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা বহু সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিতের গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে। ডারুইনের প্রভাবে উনবিংশ শতাব্দীর পণ্ডিতদের মধ্যে একটা ঝোঁক সৃষ্টি হইয়াছিল সব কিছুকেই সংগ্রামের মধ্যদিয়া ব্যাখ্যা করিবার। কিন্তু এ দৃষ্টিভঙ্গী যে একমুখী তাহা পরবর্তী পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন। ক্রপোট্‌কিন তাঁহার পারস্পরিক সহযোগিতা" ("Mutual Aid") নামক পুস্তকে এ সম্বন্ধে প্রামাণিক আলোচনা করিয়াছেন। আদিম সমাজে clan বা tribe গঠনের মূলে সহযোগিতা রহিয়াছে। এমন কি প্রাণীজগতে যূথ-জীবনের (Herd) ভিত্তিও এই পারস্পরিক সহযোগিতা। মানবজীবনেও এক দিকে যেমন উপজাতীয় সংঘর্ষ (Tribal conflict) সমাজকে প্রভাবিত করিয়াছে তেমনি উপজাতীয় সহযোগিতাও (Tribal co-operation) সমাজকে গঠন করিয়াছে। উপজাতিগুলি (Tribe) একত্র হইয়া যে জাতি (Nation) গঠিত হইয়াছে তাহার মূলেও রহিয়াছে সহযোগিতা (Co-operation)। মানব-সমাজে এই নীতির ক্রিয়াশক্তি অধিকতর প্রবল বলিয়া দেখা গিয়াছে। হাক্সলি (Huxley) প্রাকৃতিক জগতের সহিত মানবজগতের পার্থক্য নির্ধারণ করিয়াছেন, এই পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে। মানুষের সঙ্গে পশুর এইটুকুই তফাৎ। টার্ডে (Tarde), সভ্যতার মূল এই সহযোগিতাকেই বলিয়াছেন। বিখ্যাত আমেরিকান পণ্ডিত জন ডিউই (John Dewey) বলেন, বর্তমানকালে সমাজে

সহযোগিতা এবং সংঘর্ষ এই দুইশক্তিই কাজ করিতেছে; ইহার কো একটি শক্তিকেই বিবর্তনের মূলশক্তি বা প্রবর্তক বলা বৈজ্ঞানিক তথে বিরোধী। "সকল ঐতিহাসিক সমাজ-প্রগতির মূলে সহযোগিতা রহিয়া সংঘর্ষ নয়—একথা বলিলেও অতিশয়োক্তি করা হইবে। কিন্তু দুই অতিশয়োক্তির মধ্যে এইটিই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু একথা ব অবশ্যিই অতিশয়োক্তি হইবে না যে পশুবলোচিত সংঘর্ষের পরিবর্তে বুদ্ধি সহযোগিতা যে পরিমাণে যে সমাজে স্থাপিত হইয়াছে সেই পরিমাণে সে সমাজ সভ্য।*"

তারপর মার্ক্স সংঘর্ষের (Conflict) একটি বিশেষ প্রকার বা ভঙ্গী ইতিহাসের বিবর্তনের মূল বলিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে এই সংঘ দুইটি অর্থনৈতিক শ্রেণীর (Economic Class) মধ্যে। তাঁহ শ্রেণী বা Class হইল শুধু অর্থনৈতিক শ্রেণী কিন্তু সমাজ যে শুধু অর্থনৈতি দলের বা শ্রেণীর সংঘর্ষেই রূপান্তরিত হইয়াছে এ কথাও বিজ্ঞান-বিরোধ

আর্থিক শ্রেণী ছাড়াও অন্যান্য প্রকার গোষ্ঠী বা শ্রেণী আছে

কারণ, মানুষ-জীবনে গোষ্ঠীজীবন (Group life নানাপ্রকারের ঐক্যকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে যেমন অর্থনৈতিক স্বার্থকে ভিত্তি করিয়া গোষ্ঠী শ্রেণী (Group) জমিয়া উঠিয়াছে তেমনি জীবনে অন্যান্য স্বার্থকে (যথা—বংশ, 'ধর্ম' ভূগোল ইত্যাদি) কেন্দ্র করিয়াও

* "To say that all past historic social progress ha been the result of co-operation and not of conflict wou be also an exaggeration. But exaggeration again exaggeration, it is the more reasonable of the two. An it is no exaggeration to say that the measure of civil sation is the degree in which the method of co operative intelligence replaces the method of bru conflict." ("Liberalism and Social Action",—Dewey.)

গঠন চলিয়াছে এবং এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের যূথ বা দলের (Group Conflict) সংঘর্ষও ইতিহাসে বিপ্লব সাধন করিয়াছে। আদিম কালে রক্ত সম্পর্কিত গোষ্ঠীদের পরস্পরের সংঘর্ষ ইতিহাসকে অনেকাংশে গঠন করিয়াছে। মধ্যযুগে ধর্ম সংঘর্ষও সমাজে গুরুতর পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। সোরোকিন বলেন "অর্থনৈতিক শ্রেণীর বিরোধ হইতে এই সকল বিরোধ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং কোন কোন সময় পূর্ববর্তী বিরোধ হইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ.*"

অধ্যাপক পেরীও (Perry) সমাজের মূলে শ্রেণী-বিভাগ (Class System) আছে বলিয়া বলিতেছেন। কিন্তু তাঁহার মতে এই শ্রেণী (Class) অর্থনৈতিক শ্রেণী (Class) নয়। একই সমাজের মধ্য হইতে এক শ্রেণীর লোক অর্থনৈতিক শক্তির প্রাধান্যহেতু সমাজের কর্তা হইয়া বসেন নাই। তাঁহার মতে দুর্দান্ত শক্তিশালী একটা শাসকগোষ্ঠী (Ruling Class) পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া সকল সমাজের প্রভুত্ব-সম্পন্ন শ্রেণী (Dominating Class) হইয়া বসিয়াছে। †

এই কারণে মার্ক্সীয় শ্রেণীবাদ ও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা একদেশিক বলিয়া বিজ্ঞানসম্মত নয়। কিন্তু এ-কথা উল্লেখ করা সঙ্গত যে শ্রেণীসংগ্রাম-ও সমাজে বর্তমান রহিয়াছে। (অর্থনৈতিক স্বার্থ মানুষের চিরকালই আছে, সেই স্বার্থ-প্রসূত সংঘর্ষও আছে।) **শ্রেণী সংগ্রাম সত্য হইলেও সমগ্র ইতিহাসকে ও মানবজীবনকে শ্রেণী-সংগ্রামের দ্বারা ব্যাখ্যা**

* "These antagonisms being quite different from the antagonisms of the economic classes, have been sometime more important than the former."

† "They are simply, in the last analysis, consequences of dynastic processes of the struggles of ruling groups for domination over native populations." (Origin of Civilisation)

করা অবৈজ্ঞানিক। মানব সমাজের মূলে বিবিধ শক্তি কাজ করিতেছে এবং এইসব বিভিন্ন শক্তির মধ্যে কেবল মাত্র অর্থনৈতিক **শক্তি ও তাহার সংঘর্ষকেই সমস্ত বিবর্তনের প্রাথমিক ও অদ্বিতীয় কারণ বলাতেই আমাদের আপত্তি।** শ্রেণীসংগ্রাম সমাজে বিদ্যমান **কিন্তু তাই বলিয়া শ্রেণীসংগ্রামই ধর্ম, রাষ্ট্র, শিল্প, সাহিত্য সবকিছুকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে ইহা অস্বীকার্য।** আমাদের মতে নানাবিধ সংগ্রাম (ইহার ভিতর অর্থনৈতিক শ্রেণীসংগ্রামও আছে) নানাবিধ গোষ্ঠী, স্বার্থ, এবং নানাবিধ শক্তি (কাম, মানসিকতা, ধর্ম, রাজনীতি ইত্যাদি) সমাজবিবর্তনের মূলে কাজ করিতেছে। ইতিহাসের বিবর্তনে শুধু সংগ্রাম নয় সহযোগিতাও কাজ করিয়াছে। ডিউয়ীর (Dewey) ভাষায় হেগেলীয় ডায়ালেক্‌টিকে অন্ধভক্তিই এই একদেশিক মনোবৃত্তির জনক। *

এক কথায় ইতিহাসের বহুবাদী ব্যাখ্যাই (Pluralistic Interpretation) বিজ্ঞানসম্মত।

মার্ক্সীয় ক্রমবিকাশতত্ত্বের আর একটি প্রধান ত্রুটি পণ্ডিতেরা উল্লেখ করিয়াছেন। ডায়ালেক্‌টিক পদ্ধতির সহিত জড়বাদের সামঞ্জস্য হয় না। হেগেলীয় চৈতন্যবাদ হইতে ডায়ালেক্‌টিক্ ফরমূলাকে উৎপাটিত করিয়া আনিয়া মার্ক্স জড়বাদের সহিত যোগ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই যোগ বাস্তব জগতে অর্থহীন। কেবল কল্পনাজগতে ইহাকে কৃত্রিম একটা সৃষ্টি বা Structure হিসাবে কল্পনা করিয়া লওয়া হইয়াছে। ডায়ালেক্‌টিকের প্রধান সার্থকতা হইল প্রগতিবাদে। ডায়ালেক্‌টিক্ অনুযায়ী ক্রমবিকাশ ঘটিলে ইহা অনন্ত উন্নতি বা Progress-এর পথে জড়জগৎ, জীবজগৎ ও মানবসমাজকে লইয়া যাইবে। কারণ ধাপে ধাপে প্রত্যেকটি সমন্বয় বা

জড়বাদের সহিত ডায়ালেকটিক খাপ খায় না

* "It requires an unusually credulous faith in the Hegelian Dialectic of opposites to think............................"

Synthesis এক একটি উচ্চতর স্তরে উন্নীত হইতেছে। এই অব্যর্থ বা অনিবার্য উন্নতি বৈজ্ঞানিকরা স্বীকার করেন না। তাহা ছাড়া যাহা জড়, চেতনাহীন তাহা একটি নির্দিষ্ট ফরমূলা অনুসারে নিজেকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলিবে এই প্রকার বাধ্যবাধকতার মূলে কোনই যুক্তি নাই। বরং হেগেলীয় চৈতন্যবাদের সহিত ডায়ালেক্‌টিকের সামঞ্জস্য যুক্তিসঙ্গত। কারণ সচেতন চৈতন্যশক্তি একটি উদ্দেশ্যমূলক পদ্ধতিতে নিজেকে পরিচালিত করিতে পারে। কিন্তু জড়বস্তু বা কণিকাগুলি কেন যে একটা বাঁধাধরা পথে আত্মপরিচালনা করিবে তাহা বোঝা যায় না। এই কারণে জড়বাদের সহিত ডায়ালেক্‌টিক্‌তত্ত্বের সামঞ্জস্য হয় না। মার্ক্স জোর করিয়া জড়কে এই ডায়ালেকটিক্ অনুসারী বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। রাসেল* এই যোগাযোগকে অস্বাভাবিক বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন। এমনকি আমেরিকার বিখ্যাত মার্ক্সবাদী সিড্‌নী হুক্‌ও (Sydney Hook) † এঙ্গেল্‌স্‌কে আক্রমণ করিয়াছেন এই কারণে যে, এঙ্গেল্‌স্ জড়প্রকৃতিতেও ডায়ালেক্‌টিক প্রয়োগ করিয়াছেন। সিড্‌নি হুক্‌ (Sydney Hook) একজন মার্ক্সবাদের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। তাঁহার পুস্তকে তিনিও বলেন যে মানুষ-সমাজে সচেতন মানুষের সহিত মানুষের সংঘর্ষ বা Class Struggle সম্ভব। কিন্তু অচেতন জড়বস্তুতে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ বা Conflict কল্পনা করা নিতান্তই বিজ্ঞান-বিরোধী কাল্পনিকতা বই আর কিছু নয়। মানুষের ইচ্ছা আছে, ঘৃণা আছে, বিদ্বেষ আছে, স্বার্থ আছে। এ-ক্ষেত্রে Conflict সম্ভব। কিন্তু জড়বস্তু নিতান্তই নিরপেক্ষ ও চেতনাহীন ; তাহারা কেন পরস্পরের সহিত সম্পর্কে ডায়ালেক্‌টিক ফরমূলাকে মানিয়া Struggle

* Freedom and Organisation

† Towards understanding of Karl Marx, Hegel & Marx.

করিবে। আমরা সিড্‌নি হুকের এই সমালোচনা সমর্থন করি। হুকের মতে মার্ক্সবাদ স্রেফ সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ। জড় জগতে ইহাকে প্রয়োগ করিলে mechanism বা যান্ত্রিকতা আসিতে বাধ্য।

এঙ্গেল্‌স্ মার্ক্সবাদকে বিশ্বজনীন দর্শনে পরিণত করিয়া এবং জড় জগতে ডায়ালেক্‌টিক্‌কে প্রয়োগ করিয়া মার্ক্সবাদকে যান্ত্রিকবাদে (Mechanistic Materialism) পরিণত করিয়াছেন। ইহাতে মার্ক্সবাদের সর্বনাশ হইয়াছে। আমরাও হুকের এই মত যুক্তিযুক্ত মনে করি। তবে এঙ্গেল্‌স নয় মার্ক্সই এমন সব উক্তি করিয়া গিয়াছেন যাহাতে যান্ত্রিক জড়বাদই মার্ক্সবাদেব সত্যিকার মতবাদ হইয়া দাঁড়ায়। ডায়ালেক্‌টিককে বিশ্বজনীন ফরমূলাতে পরিণত করায় সমাজব্যাখ্যায়ও মার্ক্সবাদ স্ববিরোধিতায় জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। প্লেখানভ্‌ প্রমুখ মার্ক্সবাদীরা এই সমালোচনাকে স্বীকার করেন নাই। কিন্তু এই সমালোচনাকে আক্রমণ করিলেও ইহার জবাব তাহারা কোথাও দেন নাই।

মার্ক্সবাদের অপর ত্রুটি ইহার প্রগতিবাদ। ক্রমবিকাশ পরিবর্তন নয়, ইহা একটা অনিবার্য উন্নতি বা ঊর্ধ্বগতি বলিয়া ইহারা ধরেন। ইহাদের ডায়ালেকটিক নীতির ইহা যুক্তিসঙ্গত ফল। প্রত্যেক স্তরে যে সমন্বয় (Synthesis) সৃষ্টি হইতেছে তাহা পূর্বস্তর হইতে উচ্চতর (Higher)। এই নীতিতে যখন যাহা ঘটিতেছে তাহাই পূর্বঘটনা হইতে অধিকতর উন্নত এবং মানব জীবন, তথা বিশ্বসংসার সমস্ত কিছু অনন্ত উন্নতির দিকে যাইতেছে। হেগেলীয় চৈতন্যবাদ অনুসারে ডায়ালেকটিকের সার্থকতা বোঝা সহজ এ কথা আগেই বলিয়াছি। সেই নীতিতে অনন্ত উন্নতির পথে চৈতন্যশক্তির অভিযান ঘটিতেছে ইহাও যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু জড়-জগৎ ও প্রাণহীন,

মার্ক্সীয় প্রগতিবাদ অবৈজ্ঞানিক

চেতনাহীন, জড়কণিকারাও ক্রমাগত উন্নতির পথে যাইতেছে এ কথা দুর্বোধ্য। কিন্তু ডায়ালেকটিক জড়বাদ এই ঘোষণাই করে যে বিবর্তন (Evolution) মানেই অনন্ত প্রগতি।

এ সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান ভিন্নমত পোষণ করে। উন্নতি (Progress) মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর ও আদর্শের উপর নির্ভর করে। মানবসমাজ ক্রমেই উন্নতির দিকে যাইতেছে এ' কথার কোনও নির্দিষ্ট বা সর্ববাদীসম্মত অর্থ নাই। কারণ "উন্নতি" বলিতে নানাপ্রকার অর্থ বোঝা যাইতে পারে। প্রাচীন বা মধ্যযুগ হইতে আধুনিকযুগ উন্নত এ কথা স্বীকার করিতে বা অস্বীকার করিতে প্রত্যেক মানুষকেই নিজ নিজ রুচি বা আদর্শের উপর নির্ভর করিতে হইবে। ইহা ভাল-মন্দ জ্ঞানের সহিত জড়িত এবং নীতি শাস্ত্রের (Ethics) অন্তর্ভুক্ত। সমাজে ঐশ্বর্যের ও শক্তির দিক দিয়া উন্নতি ঘটিলেও হয়ত নৈতিকদিকে অবনতিও ঘটিয়াছে। যে যে প্রকার মানদণ্ড (Standard) অনুসারে বিচার করিবে তাহার কাছে সেই প্রকার সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত মনে হইবে। এই কারণে বিজ্ঞান ক্রমবিকাশকে শুধুমাত্র "পরিবর্তন" বলিয়া গ্রহণ করে। গিন্‌স্‌বার্গ বলেন "বিবর্তন ও প্রগতির মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা আজ সাধারণভাবে স্বীকৃত। তা ছাড়া, ইহাও স্বীকৃত যে সমাজ বিবর্তনের ধারা অনুসন্ধানের সমস্যা তার নৈতিক পরিমাপের সহিত সম্পর্ক বিরহিত।" *

ক্রমবিকাশের কয়েকটি বাঁধাধরা স্তর নির্ণয় করিয়া মার্ক্সবাদ বলিতেছে যে পৃথিবীর সমস্ত সমাজ এই কয়েকটি নির্দিষ্ট ধাপের মধ্য দিয়া অগ্রসর

---

* "The distinction between evolution and progress is now generally accepted and it is recognised that the problem of tracing the actual course of social development is distinct from its ethical valuation."

হইতে বাধ্য। এই প্রকারের ক্রমবিকাশকে একরৈখিক বিবর্ত (Unilinear Evolution) বলা যাইতে পারে। পূর্বতন ক্রমবিকাশ বাদীরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে এবং বিভিন্নকালের তথ্য সংগ্রহ করি তাহাদের বাহ্য সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া একটা মনগড়া ছক্ বাহি করিয়াছেন। এখনকার গবেষণায় এইসব বিবর্তনবাদীদের একরৈখি (Unilinear) ক্রমবিকাশ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। গিন্‌স্‌বার্গের ভাষায়— "একরৈখিক বিবর্তনবাদ বহুল সমালোচিত এবং সর্বজন প্রত্যাখ্যাত পূর্ববর্তী নৃতাত্ত্বিকদের উপস্থাপিত শীকার, পশুচারণ ও কৃষির ধারাবাহিকত পরবর্তীরা ভিত্তিহীন প্রমাণিত করিয়াছে। সেই প্রকার, পরিবারের বিবর্তনে একটি ছককে সার্বজনীন বলিয়া গ্রহণ করিবার কোন কারণ নাই অথব সর্বত্রই মাতৃস্বত্বের পর পিতৃস্বত্বের স্তর উপস্থিত হইয়াছে এ-কথা গ্রহ করারও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।" †

† "The first type of theory namely, that of uni linear recurrence has been subjected to much criticisn and is now perhaps hardly held by anyone. Th sequence, for example, of hunting, pastoral and agri cultural stages often put forward by earlier writer has been shown by ethnologists to be quite unfounde ... ...similarly there is no reason for accepting an particular scheme of the forms of family.........as uni versal or to hold that mankind everywhere passe from a stage of mother-right to one of father-right.' (Studies in Sociology p. 90)

উনিশ শতক হইতে সমাজবিদ্‌দের মধ্যে বিবর্তনের নির্দিষ্ট স্তর (stages of evolution) বাঁধিয়া দিবার একটা ফ্যাশান্ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। অগাষ্ট কোঁতে (August Comte) তাঁহার 'তিনস্তরের বিধান' (Law of three stages) প্রবর্তন করিয়া এই ফ্যাশানের পথ দেখাইয়াছেন। মর্গান মার্ক্সবাদীর গুরুস্থানীয়। মর্গান যে ক্রমবিকাশ পদ্ধতি প্রচার করিয়াছেন এবং এঙ্গেল্‌স যে পদ্ধতিকে সমর্থন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের প্রবর্তিত বিবর্তন "রৈখিক" (Linear) ক্রমবিকাশেই পরিণত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পরিবারের পাঁচটি স্তর অনিবার্য এবং পৃথিবীর সমস্ত সমাজ এই পাঁচটী স্তরের মধ্য দিয়া গিয়াছে এবং যাইবে। অর্থনীতিরও এইরূপ নির্দিষ্ট স্তর ইহারা ঘোষণা করিয়াছেন। এই অর্থনীতি এইজন্য মার্ক্সবাদ ও রৈখিক বিবর্তনের (Linear Evolution) সমর্থক। বোয়াস, রির্ভারস, গোল্ডেনভাইসার, ভিস্‌লার, রবার্ট লাউয়ী প্রভৃতিরা (F. Boas, Rivers, Golden-Weiser, Wissler, Robert Lowie) এই রৈখিক বাঁধাধরা স্তর অনুযায়ী ক্রমবিকাশের মতবাদকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। সোরোকিনের গবেষণাও এসম্বন্ধে যুগান্তকারী। আমরা বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক সমাজতত্ত্ববাদের গবেষণার ভিত্তিতে এই মার্ক্সীয় Linear Evolution বা বাঁধাধরা ক্রমানুসারী বিবর্তনকে সমর্থন করিনা। আধুনিক বিজ্ঞানে ক্রমবিকাশের মূলতত্ত্ব হইল "পরিবর্তন"। পরিবর্তন কল্যাণকর বা অকল্যাণকর, তাহা আদর্শানুযায়ী নির্ধারিত হইবে। ক্রমবিকাশ শুধুমাত্র রৈখিক (Linear) নয়। আমাদের মতে ক্রমবিকাশ সৃজনপর (Creative) এবং নিত্য নূতন সৃজনের মধ্যদিয়া বিবর্তন অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। বার্গসঁ সৃজনমুখী ক্রমবিকাশকে প্রচার করিয়াছেন। সোরোকিন-ও ক্রমবিকাশকে 'Creative-Erratic' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ক্ষুদ্রতর কালের পটভূমিকায় ইতিহাসের গতি

রৈখিক বা চক্রিক (Cyclic) হইতে পারে। কিন্তু বৃহত্তর পটভূমিকায় যাহা রৈখিক তাহা চক্রিকও হইয়া প্রতিভাত হইতে পারে। এই প্রকারে ইহার বিপরীতও সম্ভব হইতে পারে। আসলে অনন্তকালের গতিকে কোনও ফরমুলাতে বাঁধা সম্ভব নয়। মনগড়া ছক্ আঁকিয়া ইতিহাসের কোনও অংশ বা খণ্ডকে কোনও বিশেষ পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা চলিতে পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্যের মাপকাঠিতে তাহার স্থায়ী মূল্য নাই। কোন সমাজে সভ্যতার গতি সমরেখায় অগ্রসর হইলেও সেই যুগেই পৃথিবীর অপর অংশে ক্রমবিকাশ বৃত্ত বা চক্রিক গতিকে অনুসরণ করিতে পারে। কোথাও বা দোলক-গতি, (Pendular) কোথাও বা কম্বুরৈখিক (Spiral) গতি ইত্যাদি নানা গতি-বৈচিত্র ক্রমবিকাশে লক্ষিত হয়। আবার সমগ্র মানবজাতি হিসাবে বিচার করিলে ইতিহাসের গতি অন্য প্রকারের বলিয়া প্রতিভাত হইবে। এই কারণে বিজ্ঞানের আধুনিক পরিণতি ক্রমবিকাশের এই ছক্ কাটার বিরোধী। গিন্‌সবার্গ বলিতেছেন, "ইহা একবার বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, কোন ক্রমিক পরিবর্তন ধারার সার্বিক প্রয়োগ সম্ভব নয় এবং এক ক্ষেত্রের ফল অন্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।"*

মার্ক্সীয় আর্থিক ব্যাখ্যায় যদি নিয়ন্ত্রণ-বাদকে (Determinism) স্বীকার করিতে হয়, তবে ব্যক্তির কৃতিত্ব অস্বীকার করিতে হয়। ইতিহাসে মানুষ আর্থিক শক্তির যন্ত্রমাত্র—ইহাই মার্ক্সীয় নিয়ন্ত্রণবাদের ভিত্তি। যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিভাশালী পুরুষ ইতিহাসে কোন ভাঙাগড়ার জন্য দায়ী হন তবুও মার্ক্সের মতে ঐ ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য নাই। সে ইতিহাসের যন্ত্র। অবশ্য

* "If this be once realised it will be seen that we connot generalise any serial order of change found to hold good and extend it readily to other cases."

াক্সবাদীরা "ফয়ারবাকের সূত্র" ইত্যাদি হইতে বিরল দুই একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া ব্যক্তির ভূমিকা বা role সম্বন্ধে নজীর দেখাইয়া থাকেন। ইতিহাসকে কেবল পারিপার্শ্বিকের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। মার্ক্সবাদ পারিপার্শ্বিকবাদ তাহা ইতিপূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। আমাদের মতে কারলাইল ইত্যাদি ব্যক্তিবাদীরা যেমন একদেশদর্শী তেমনই মার্ক্স ইত্যাদি পারিপার্শ্বিকবাদীরাও একদেশদর্শী। ব্যক্তিকে যেমন পারিপার্শ্বিক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা চলিবেনা তেমনই পারিপার্শ্বিককে ব্যক্তি হইতে আলাদা করিয়া দেখা অসঙ্গত। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীই অসম্পূর্ণ। আমরা **ব্যক্তির প্রতিভার বিশেষত্ব স্বীকার করি কারণ আধুনিক বিজ্ঞান এই বিশেষত্বকে অস্বীকার করিতে পারে নাই।** তেমনই পারিপার্শ্বিকের প্রভাবও শক্তিশালী। এই দুইয়ের মৌলিক শক্তি ও পারস্পরিক সম্বন্ধ হইতেই সামাজিক পরিবর্তন সৃষ্ট হয়।

ইতিহাসে ব্যক্তিত্বের স্থান

(মার্ক্সবাদ অনুসারে স্বদেশ-প্রেম বা Nationalism একটা শ্রেণী-স্বার্থের সৃষ্টি।) (ধনতন্ত্রের (Capitalism) সৃষ্টি হইল জাতীয়তাবাদ Nationalism)।) সমাজে দুইটি শ্রেণী আছে এবং এই দুই শ্রেণীর স্বার্থে চিরন্তন বিরোধ রহিয়াছে। এই দুই বিরুদ্ধ শ্রেণীস্বার্থ একত্র করিয়া কোন প্রকারের "জাতীয় স্বার্থ" সৃষ্টি হইতে পারে না। (জাতি বলিয়া অখণ্ড কোনো সত্তা নাই।) যাহা আছে তাহা দুইটি ও বিরুদ্ধ খণ্ডমাত্র, ধনিক ও শ্রমিক। এই দুই স্বার্থের কোথাও কোনো যোগাযোগ বা মিল নাই। কাজেই জাতীয় স্বার্থ বলিতে কিছু নাই। প্রত্যেক সমাজই এইভাবে দ্বিখণ্ডিত। কাজেই পৃথিবীর শ্রমিক স্বার্থ সর্বত্রই এক, ইহাতে ভৌগোলিক সীমার কোনও প্রভাব নাই। তেমনি পৃথিবীর ধনিকের স্বার্থ সর্বত্র এক ও অবিচ্ছিন্ন। কাজেই ধনিক

…ানিজম ও জাতীয়তা-বাদ পরস্পর-বিরোধী

এক জাতি এবং শ্রমিক অপর জাতি। ইহাদের স্বার্থ, সংস্কৃতি ও মানস গঠন বিপরীত। কাজেই জাতীয়তাবাদ বলিয়া কোনও কিছুর অর্থ নৈতিক ভিত্তি যেমন নাই তেমনই ইহার মনস্তাত্ত্বিক (Psychological ভিত্তিও কিছু নাই। দ্বিতীয়তঃ, জাতীয়তাবাদ দাঁড়াইয়া আছে অনেকাংে সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করিয়া। জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ এবং তাহাকে উন্ন করিবার চেষ্টা জাতীয়তাবাদের মুখ্যকথা। কিন্তু মার্ক্সীয় অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা মূল কথাই হইল এই যে সংস্কৃতির ভিত্তি অর্থনীতি। কাজেই সমাজের শ্রে দুইটির সংস্কৃতি আলাদা হইতে বাধ্য। যে যুগে যে শ্রেণী প্রধান, সে যু সেই শ্রেণী-সংস্কৃতি প্রবল। বর্তমান যুগ ধনিক-সংস্কৃতির যুগ। কি শ্রমিকশ্রেণীর জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক-সংস্কৃতি প্রবল হইয়া উঠিতেছে শ্রমিক-সংস্কৃতি পৃথিবীব্যাপী এক এবং অবিচ্ছিন্ন। কারণ যে শ্রেণী স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া সংস্কৃতি গড়িয়া ওঠে তাহা সর্বত্রই এক। ধনি স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া যে সংস্কৃতি—জাতীয়তাবাদ তাহারই অংশ তৃতীয়তঃ জাতীয়তাবাদ ধনতান্ত্রিক (Capitalist) শোষণের ও স্বাথ সিদ্ধির যন্ত্রমাত্র। ইহা সাম্রাজ্যবাদেরই অন্তরূপ। ধনিকেরা জাতীয়তা নামে শ্রেণী-স্বার্থের বিরোধকে চাপা দিয়া তাহাদের শ্রেণী-স্বার্থকে সি করে। এই সব কারণে জাতীয়তাবাদ কম্যুনিজমের পরিপন্থী এব তাই মার্ক্সবাদের শ্লোগান, "দুনিয়ার মজদুর এক হও"—(Worker of the world unite)—ইহার ব্যাখ্যায় মার্ক্সবাদীরা জাতীয়তা বিরুদ্ধতা করিয়া থাকেন।

আমাদের মতে কিন্তু সমাজতন্ত্রের সহিত জাতীয়তাবাদের সামঞ্জ হয়। ইতিহাসের মূলে বহুশক্তির ক্রিয়া রহিয়াছে। তাহার মধে মানুষের ভাবাবেগ শক্তিও (Emotional factor) রহিয়াছে জাতীয়তাবাদ ভৌগোলিক. মানসিক (Emotional), সামাজি

ংস্কৃতি, বর্ণ (Race) ইত্যাদি বহুশক্তির সমন্বয়ে সৃষ্ট একটা জটিল সত্তা ! ভৌগোলিক সীমা ও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব অস্বীকার করা য়ায় না। তেমনি জাতি ও সংস্কৃতিগত সাদৃশ্যও মানুষকে প্রভাবিত করে। ঐতিহ্যের (Historical Tradition) বা সামাজিক জীবনের সুখদুঃখের সমষ্টিগত ইতিহাসের ছাপও মানুষের উপর কম নয়। দীর্ঘদিনের ইতিহাস মানুষের জীবনে একটা প্রবল সত্য। দ্বিতীয়তঃ বিশ্বসংস্কৃতিতে আমরা বিশ্বাস করিলেও জাতীয় সংস্কৃতিরও মূল্য আমরা স্বীকার করি। ঐক্যের মধ্যে অনৈক্য আছে এই ভেদাভেদবাদ সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও খাটে। ঐতিহাসিক কারণে ও ভৌগোলিক সমাবেশের ফলে মানবসমাজের বিভিন্ন অংশগুলির (Unit) কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে এবং থাকিবে। বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই বৈশিষ্ট্য কমিয়া ক্রমশঃ সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য বাড়িয়া যাইবে ইহা সত্য কিন্তু মানব-সমাজের সর্বত্র সাদৃশ্য ষোলআনা সাদৃশ্যে পরিণত হইবে না। কারণ রুচি, চিন্তাধারা পারিপার্শ্বিক ইত্যাদির বৈচিত্র্য লুপ্ত হইবে না। ইহা ছাড়া ঐতিহ্যের শক্তিও মানুষ কাটাইয়া উঠিতে পারিবেনা। আধুনিক মনো-বিজ্ঞানও বিভিন্ন আদিরূপ বা সনাতন ও মৌলিক সত্ত্বারূপের (Archetype'র) গভীর ভিত্তি আছে বলিয়া স্বীকার করিতেছে। সুদূর ভবিষ্যতেও মানুষের প্রকৃতি আমূল পরিবর্তিত হইবে বলিয়া আশা করার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আজও পাওয়া যাইতেছে না। এই কারণে জাতীয়সংস্কৃতি বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করিতেই হয়।

তৃতীয়তঃ, জাতীয়সংস্কৃতির সহিত বিশ্বসংস্কৃতির বিরোধ নাই। বিরোধ সৃষ্টি হয় গোঁড়ামির সহিত গোঁড়ামির। জাতীয় বৈশিষ্ট্যের কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন অর্থ করিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধিকে প্রবল করিয়া তুলিলেই গোঁড়ামির সৃষ্টি হয়। বৈশিষ্ট্যের আতিশয্য কল্পনা করিয়া বর্তমান পৃথিবীতে

অনেক জাতি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি শুধু ভেদই নয় অভেদও সমান সত্য। সংস্কৃতিগত কোনও দিক হইতে যেমন বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে তেমনি জ্ঞানের ক্ষেত্রেও মানবপ্রকৃতির গভীরতর প্রদেশে যে বিশ্বব্যাপী ঐক্য রহিয়াছে তাহাও প্রবল ও বাস্তব সত্য। কাজেই এই ঐক্যের ভূমিকায় বৈশিষ্ট্যকে দেখিলেই জাতীয়তাবাদের সত্যিকার স্বরূপ বোঝা যাইবে। তাহা হইলেই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ (Internationalism) পরস্পরের সহায়ক। ইহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। বহুজাতির সমস্বার্থের ও সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া আন্তর্জাতিকতা গড়িয়া উঠিবে। রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, গান্ধী ইত্যাদির জাতীয়তাবাদ এই শ্রেণীর। চতুর্থতঃ, সমাজে শ্রেণী থাকিলে ও শ্রেণীসংগ্রাম একটা অকাট্য সত্য হইলেও মানুষের জীবনে শ্রেণীস্বার্থই একমাত্র স্বার্থ নয় এবং অর্থনীতিই জীবনে একমাত্র নীতি নয়। সমষ্টি জীবনের (Group Life) একপ্রকার প্রকাশ হইয়াছে অর্থনৈতিক শ্রেণীর মধ্য দিয়া। জীবনের অন্যান্য দিককে আশ্রয় করিয়া সমষ্টি জীবনের অন্যরূপও দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। ধর্ম, রক্ত, সমাজ, ভৌগোলিক পরিবেশ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করিয়াও মানুষের সংস্কৃতির ও গোষ্ঠী জীবনের এক একটা দিক গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সব বিভিন্ন দিক গোটা সাংস্কৃতিক জীবনের এক একটি Cross Section। একই ভৌগোলিক পরিস্থিতিতে বাস করিয়া একই ঐতিহ্যের প্রভাবে লালিত পালিত হইয়া এক একটি সমাজে কতকগুলি সমস্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া "জাতি"-চেতনা গড়িয়া ওঠে। ইহাকেও সমষ্টিজীবনের এক প্রকাশ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। শ্রেণীস্বার্থও রহিয়াছে কিন্তু অন্যদিক হইতে ধনিক এবং শ্রমিক উভয়েরই কতকগুলি সমস্বার্থ রহিয়াছে। সেই সমস্বার্থকে ভিত্তি করিয়া মানসিক বৃত্তিও সৃষ্ট হইতেছে। ইহাই জাতীয়স্বার্থের ভিত্তিতে

জাতীয়তাবোধ (Nationalism)। শ্রেণীস্বার্থের সহিত জাতীয়স্বার্থের এই প্রকারে সামঞ্জস্য হয়। পঞ্চমতঃ, জাতীয়তাবাদ পররাজ্যগ্রাসী (Acquisitive) হইতেই হইবে তাহা নয়। আন্তর্জাতিক স্বার্থবোধ সম্মুখে থাকিলে জাতীয়স্বার্থবোধ অপরকে গ্রাস করিবার মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিতে পারে না। ব্যক্তির সহিত যেমন সমাজের সামঞ্জস্য প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সম্পর্কেও সামঞ্জস্য প্রয়োজন, তেমনি জাতির সহিত আন্তর্জাতির এবং জাতির সহিত অপর জাতির পারস্পরিক সামঞ্জস্যও প্রয়োজন। যেমন ব্যক্তির জীবনে স্বাধিকারের সীমা টানিতে হয় তেমনি জাতির জীবনেও স্বাধিকারের সীমা টানিয়া আন্তর্জাতিক সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে হইবে। এই সামঞ্জস্যের দৃষ্টিভঙ্গী হারাইয়া ফেলিলে সংঘর্ষ ও বিপর্যয় অনিবার্য হইবে। যুগে যুগে এই সামঞ্জস্যকে নতুন করিয়া খুঁজিয়া লইতে হইবে, চিরদিনের কোনও শাশ্বত সমাধান এ-সমস্যার নাই। ষষ্ঠতঃ, সমাজতন্ত্র পৃথিবীতে সকল সমাজে স্থাপিত হইলেও জাতীয়তাবাদ লুপ্ত হইবে না। সেই যুগেও, একটি সমাজতান্ত্রিক জাতি বা দেশের সহিত অপর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সামঞ্জস্য স্থাপন সেই যুগের সমস্যারূপে দেখা দিবে। সেই যুগেও যদি কোনো দেশের স্বার্থবুদ্ধি প্রবল হইয়া সীমা ছাড়ায় তবে সংঘর্ষ সৃষ্টি হওয়ার বাধা নাই। সমাজতন্ত্র, অর্থনীতির ক্ষেত্রে, মানুষের জীবনোপকরণের কল্যাণকর বণ্টনের দ্বারা মানুষের আত্মবিকাশের দরজা খুলিয়া দিবে। কিন্তু মানুষের অধিমানস অন্যান্য শক্তির লীলাক্ষেত্র থাকিবেই। কাজেই নানাপ্রকার শক্তির প্রভাবে মানুষের ভাবগত জীবন (Emotional life) প্রভাবিত হইবে। কাজেই জাতীয় চেতনা, স্বদেশপ্রীতি মানুষের মন হইতে লুপ্ত হইবে এ-কথা মনে করিবার ও কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। আত্মপ্রীতি ও আত্মীয়প্রীতি যেমন

মানুষের মনোধর্মের অংশ, তেমনি স্বদেশপ্রীতিও মানুষের প্রকৃতিগত ধর্ম। এইসব কারণে জাতীয়তাবাদের বাস্তব ভিত্তি রহিয়াছে। এবং সমাজতন্ত্রের সহিত জাতীয়তার কোন বিরোধ নাই বলিয়া আমরা মনে করি। অবশ্য মার্ক্সবাদী পরিকল্পনায় অর্থনীতিই একমাত্র শক্তি ও সংস্কৃতির ভিত্তি বলিয়া গৃহীত হওয়ায় কম্যুনিজমের সহিত জাতীয়তাবাদের সামঞ্জস্য হয় না এ-কথাও ঠিক।

মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের ভিত্তি জড়বাদ এবং নিয়ন্ত্রণবাদ। জড়শক্তি ও ডায়ালেক্‌টিকের অনিবার্য প্রভাবে সমাজে সমাজতন্ত্র দেখা দিবে। সমাজবিকাশের এই মূলতত্ত্ব তাহারা আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া তাহাদের জড়বাদী সমাজতন্ত্রকে তাহারা বৈজ্ঞানিক বলিয়া দাবী করেন। কিন্তু আমরা দেখাইয়াছি আধুনিক বিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞান এই প্রকার নিয়ন্ত্রণবাদকে একদেশদর্শী বলিয়া মনে করে। ইতিহাসে জড়শক্তিই একমাত্র শক্তি নয়। মনোশক্তি এবং তাহার প্রাধান্য বিজ্ঞান স্বীকার করে। কাজেই সমাজতন্ত্রের সহিত জড়বাদের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে ইহা একটা মারাত্মক বৈজ্ঞানিক ভ্রান্তি।

সমাজবাদ ও জড়বাদ

মানুষের সমাজে সমাজতন্ত্র যদি আসে তবে তাহা মানুষের চেষ্টায় ও আদর্শানুগত কার্যের ফলে আসিবে। (জড়শক্তির প্রভাবে যেমন ধনিকতন্ত্র সৃষ্ট হইতে পারে তেমনি সমাজতন্ত্রও সৃষ্ট হইতে পারে।) তেমনি মনঃশক্তির প্রভাবেও ধনিকতন্ত্র ও শ্রমিকতন্ত্র উভয়ই সৃষ্ট হইতে পারে। আসলে জড় এবং মনঃশক্তি পরস্পরের সহিত একযোগেই কাজ করিয়া চলিয়াছে। কাজেই সমাজতন্ত্রের সহিত কেবল জড়বাদেরই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে এ-কথার কোনই ভিত্তি নাই।

মানুষের মধ্যে বহুশক্তির ক্রিয়া আছে। তাহার এই বিচিত্র ব্যক্তিত্ব জড়শক্তিকে নিজের কল্যাণে ব্যবহার করে। তাহার কল্যাণের পরিকল্পনাও

বহুমুখী, ভৌতিক জীবনের উপকরণ যেমন ইহার অংশ তেমনি আত্মিক জীবনের প্রগতিও সেই আদর্শের অংশ। নানা বিচিত্র শক্তির প্রভাবে মানুষ আধ্যাত্মিক সাধনায় জড়বাদী বা অধ্যাত্মবাদী হইতে পারে। ঐহিক জীবনের প্রচেষ্টায় মানুষ সমাজতান্ত্রিক বা ব্যক্তিবাদী হইতে পারে। মানুষ যদি কেবল জড়শক্তির যন্ত্রমাত্র হইত তবে জড়বাদের সহিত সমাজতন্ত্রের অনিবার্য যোগসাধন করিত। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি জড়শক্তিই একমাত্র শক্তি নয়। মনঃশক্তিও প্রধানশক্তি। কাজেই যে-কোন সমাজ-ব্যবস্থা মানুষের মন সৃষ্টি করিয়া লইতে পারে। ঐহিক জীবনের সাম্য বা বিলি-ব্যবস্থা অনুযায়ী মানুষ মানসজীবনে জড়বাদী বা চৈতন্যবাদী দুইই হইতে পারে। সমাজতান্ত্রিককে জড়বাদী হইতে হইবে, সমাজতন্ত্রের ভিত্তি জড়বাদ, এ-কথা জড়বাদীয় ব্যাখ্যার মুখ্যকথা হইতে পারে কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রিয়াত্মক পারস্পরিকতা (interfunctionalism) অনুসারে এই কার্যকারণ সম্পর্ক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। কোনও প্রকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সহিত কোনও বিশিষ্ট দার্শনিক মতবাদের অন্তর্নিহিত ও অচ্ছেদ্য যোগ নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মর্গান-মার্ক্সবাদী রাষ্ট্রতত্ত্বের সমালোচনা

রাষ্ট্রের উৎপত্তি

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মার্ক্সবাদী মত সম্পূর্ণরূপে মর্গানের মতকে ভি
করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। মর্গানের সমাজ-বিবর্তনের ছকটী কয়েক
নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় স্তরের সমষ্টি। মধ্যবর্বর যুগের পূর্ব পয
প্রত্যেক জাতির সমাজ-ভিত্তি যৌথবিবাহ এবং যৌথসম্পত্তি (Communisti
Property)। যৌথবিবাহের 'পুনালুয়া'স্তরে গোষ্ঠীপ্রথার উদ্ভব হয়
পৃথিবীতে সর্বত্র এই গোষ্ঠী ছিল মাতৃতান্ত্রিক, কারণ মাতাই কেব
নিশ্চিত এবং যৌথবিবাহের পিতা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। মাতৃতন্ত্রী গোষ্ঠী এ
যুগে একমাত্র সমাজ প্রতিষ্ঠান। এই গোষ্ঠী প্রথাই মানুষের জীবনে
সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করিত। রক্তসম্পর্কের সর্বগ্রাসী প্রভাবের দ্বারা ব্যক্তি
সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক, যৌনজীবন, আর্থিক পদ্ধতি, প্রভৃতি সমস্ত কি
পরিচালিত হইত। গোষ্ঠীসমাজই পৃথিবীতে মানব সমাজের প্রথম প্রকৃ
সমাজ-সংহতি।

কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি-প্রথার উদ্ভব হইল মধ্যবর্বর যুগে। পশুপাল
জনিত ধনদৌলতের বৃদ্ধিই ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সৃষ্টি করিল। ইতিপূ
যুগ্মবিবাহ আসিয়াছে। সন্তান সম্বন্ধে পিতার বিশেষ সম্পর্কবো
খানিকটা সৃষ্টি হইয়াছে। ব্যক্তিসম্পত্তির উদ্ভব হওয়ায় সন্তান সম্ব
পিতার দায়িত্ববোধ বাড়িল এবং সন্তানকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিবা
জন্য একবিবাহপ্রথা সৃষ্টি হইল। এই ব্যক্তিসম্পত্তি আসিয়া গো
প্রথাকে ভাঙিয়া দিল। সমাজে ধনী-দরিদ্র সৃষ্টি হইল, পণ্যবিনিময় এ

মুদ্রা (Money) আসিল। গোষ্ঠী-সমাজের ভিত্তি সাম্য। সম্পত্তি ছিল সকল গোষ্ঠী-সভ্যের। এই সাম্যতান্ত্রিক সম্পত্তি প্রথায় উচ্চনীচের স্থান ছিল না। নূতন ব্যক্তি-সম্পত্তি প্রথা এবং পুরাতন গোষ্ঠী-সম্পত্তিপ্রথা, এই দুই পরস্পর-বিরুদ্ধ। পণ্য বিনিময় ও বাণিজ্যের উদ্ভব হওয়ায় ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিরাও সান্নিধ্যে আসিতে লাগিল এবং একত্র বাস করিতে লাগিল। ইহাদের বিভিন্ন সম্পত্তি-অধিকার রক্ষা করিবার জন্য একই ভৌগোলিক ক্ষেত্রের অধিবাসীদের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল। কিন্তু যে শ্রেণী ধনী ও শক্তিশালী তাহারাই রাষ্ট্রচালক হইয়া ধনীর স্বার্থরক্ষা ও দরিদ্রের শোষণ করিতে লাগিল। **শ্রেণী সংগ্রাম হইতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি।**

মর্গান-মার্ক্সবাদী এই রাষ্ট্রতত্ত্বের মৌলিক কয়েকটী তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া নৃতত্ত্ব এই সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে মর্গান-মার্ক্সীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব একপেশে।

প্রথমতঃ, মর্গানী ছকের একরৈখিক বিবর্তন, সমাজতত্ত্ব কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় রাষ্ট্রসম্বন্ধে ইহাদের একরৈখিক বিকাশের মতবাদও গ্রহণযোগ্য নয়। সমাজের বিকাশ বাঁধাধরা ছকের স্তরকে অনুসরণ করিয়া হয় নাই, ইহা পূর্ব অধ্যায়েই আলোচিত হইয়াছে। সেই দৃষ্টিতে বিচার করিয়া বলা চলে যে পৃথিবীতে গোষ্ঠীপ্রথা একটা সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান এবং সার্বিক স্তর, তাহা নৃতত্ত্ব স্বীকার করে না। লাউয়ী, ম্যালিনওয়াস্কী, গোল্ডেন-ভাইজার, ওয়েষ্টারমার্ক প্রভৃতি নৃতাত্ত্বিকেরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে গোষ্ঠী-প্রথা সার্বিক নয়। পরিবারই সার্বজনীন। পৃথিবীতে বর্তমান অসভ্যজাতির সামাজিক প্রথা সন্ধান করিলে প্রমাণ হয় পরিবার কোন না কোন আকারে সব জাতিতেই আছে কিন্তু পৃথিবীতে গোষ্ঠী-প্রথা-বিহীন জাতি বহু রহিয়াছে। এই সব গোষ্ঠীবিহীন জাতি চিরকালই এই অবস্থায় আছে। পূর্বে কোনও কালে ইহাদের মধ্যে গোষ্ঠীর সৃষ্টিই

হয় নাই। পৃথিবীতে সব জাতি গোষ্ঠী-প্রথার মধ্য দিয়া আসে নাই এ-সম্বন্ধে সোয়ানটনের (Swanton) গবেষণায় ইহা প্রমাণ হইয়াছে এস্কিমো, এণ্ডামাস্কান, সলীশ প্রভৃতি বহুজাতি অতি আদিম হওয়া সত্ত্বে গোষ্ঠী-বিহীন। লাউয়ী, গোল্‌ডেন্‌-ভাইজার এই তত্ত্বই আরো সুপ্রমাণ করিয়াছেন। মর্গান-এঙ্গেলসের কালে কেবল অষ্ট্রেলিয়ার দিকেই ইহাদের চক্ষু নিবদ্ধ ছিল। অষ্ট্রেলিয়ায় গোষ্ঠী আছে। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের তথ্য তখন অজ্ঞাত ছিল। কাজেই তখন গোষ্ঠীপ্রথার সার্বজনীনতা সম্বন্ধে মর্গানের দৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছিল।

কাজেই গোষ্ঠী যদি সার্বজনীন না হয়, তবে রাষ্ট্রও গোষ্ঠী হইতে সার্বিকভাবে উৎপন্ন হইয়াছে, একথাও সত্য নয়। প্রাচীন সভ্যজাতিগুলি (গ্রীক, রোম, আর্য প্রভৃতি) লাউয়ীর মতে পূর্বে গোষ্ঠীহীন ছিল। পরে সাময়িক কিছু কালের জন্য গোষ্ঠীর উদ্ভব হইয়া বিলোপ হইয়া গিয়াছে গোষ্ঠী ভাঙ্গিয়া রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে, এই মত ভিত্তিহীন।

পূর্বে সর্বত্রই গোষ্ঠী-সম্পত্তি-প্রথা ছিল এবং ব্যক্তি-সম্পত্তি পরবর্তি পশুপালনযুগে উদ্ভূত হইয়াছে, এই মতও আজিকার নৃতত্ত্ব স্বীকার করিবে না একদল যেমন আদিম সম্পত্তির মালিকানা প্রথা সম্বন্ধে চরম মত দেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তিই একমাত্র প্রথা ছিল (Buecher), তেমনি মর্গানীদের মতে অসভ্য হইল সাম্যবাদী বা কম্যুনিষ্ট। এই দুই চরম মতই একপেশে— তাহা লাউয়ী প্রমুখ নৃতাত্ত্বিকেরা প্রমাণ করিয়াছেন। ম্যালিনাউস্কীও বলেন, সম্পত্তি-প্রথা আদিমদেরও মিশ্র; ব্যক্তিসম্পত্তি ও সমষ্টিসম্পত্তি দুই প্রথাই প্রচলিত পাওয়া যায় সর্বত্র। *

---

* "As a matter of fact property which is but one form of legal relationship, is neither purely individualistic nor communal, but always mixed. (B. Malinowski—III, Crime & Custom,)

মর্গানী মতে ব্যক্তি-সম্পত্তি কেবল পশুপালন হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এই কথাও ভুল। শিকারজীবী অসভ্যদের মধ্যেও নৃতত্ত্ব ব্যক্তিসম্পত্তির অস্তিত্ব পাইয়াছে। কালিফোর্নিয়ার মাইডু এবং টমসন ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে যৌথ-সম্পত্তি ও ব্যক্তি-সম্পত্তি দুইই রহিয়াছে। ওয়েষ্টারমার্ক এ-সম্বন্ধে বহু দৃষ্টান্তসহ প্রমাণ করিয়াছেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি আদিমদের মধ্যেও আছে। এঙ্গেল্‌স্ বলেন, পণ্যবিনিময় এবং বাণিজ্য উদ্ভব হওয়াতেই মানুষ জমিতে ব্যক্তিগত চাষ আরম্ভ করে এবং তখন হইতেই জমি ব্যক্তিসম্পত্তি হয়।* এই মত আধুনিক নৃতত্ত্বের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত।

এঙ্গেলস্ বলেন যে গোষ্ঠীসমাজের ভিত্তি সাম্য, এই সমাজে "মুদ্রা" বা Money উদ্ভব হইতেই পারে না। কারণ এই দুই-ই পরস্পর-বিরোধী।¶ আধুনিক যুগে ডাঃ রিভার্স ও (Rivers) এই মর্গানী মতকে প্রমাণ করিবার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, মেলানেশীয়ায় পূর্বে কম্যুনিজ্‌ম ছিল এবং পরে বহির্জগতের সংস্পর্শ হইতে মুদ্রা বা money আমদানী হইয়াছে।† রিভার্সের এই মত ম্যালিনাউস্কী প্রভৃতিরা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। রিভার্স মেলানেশীয়ায় মাদুর, শূকরের চোয়াল, ঝিনুকের চাক্‌তী প্রভৃতিকে "Money"

---

* "With the coming of commodity production, individuals began to cultivate the soil on their own account which soon led to individual ownership of land." (Engels, p 138)

¶ "The gentile constitution is absolutely irreconcilable with money economy." (Engels, p. 136)

† "A thoroughly communistic people can have no use for money among themselves." (History of Melanesian Society, II, p. 385)

আখ্যা দিয়াছেন, কারণ ইহাদের একটা নির্দিষ্ট মূল্যক্রম (Scale of Value) আছে। কিন্তু নির্দিষ্ট মূল্যক্রমের হিসাব থাকিলেই কি Money হয়? আমাদের সভ্যজীবনের ব্যবহার্য সব জিনিষেরই মূল্যক্রম আছে। তাই বলিয়া কি ইহারা আমাদের কাছে Moneyতে পরিণত হয়? ম্যালিনাউস্কী বলেন, Money না-থাকিলেও কম্যুনিজ্‌ম্ থাকিবে এমন নয়। থাকিলেও কমুনিজম্ থাকিবে না, তাহাও নয়। মধ্য অষ্ট্রেলিয়ানী, ফুয়েজিয়ানী ও পূর্ব-নিউগিনীর (Eastern New Guinea) মেলানেশীয়গণ ব্যক্তিগত-সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রখর চেতনাশীল অথচ তাহাদের মধ্যে কোন Money বা বিনিময় মুদ্রা নাই।*

বর্তমান রুশদেশে ব্যক্তি-সম্পত্তির উচ্ছেদ হইলেও "মুদ্রা" বাঁচিয়া আছে, লুপ্ত হয় নাই। আবার ব্যক্তি-সম্পত্তিশীল সমাজেও মুদ্রা ছাড়া বিশুদ্ধ পণ্য বিনিময় চলিতে পারে। অসভ্যসমাজে Money না থাকিলে-কম্যুনিজ্‌ম্ প্রমাণ হইয়া যাইবে ইহা ভুল। আসল কথা ব্যক্তিসম্পত্তি সত্বেও অসভ্য সমাজে 'Money'র প্রয়োজন পড়ে না, তাই মুদ্রার প্রচলন হয় না।

এঙ্গেল্‌স্ বলেন, অসভ্যসমাজে পণ্য এত সামান্য উৎপাদন করা হয় যে সেখানে শ্রেণী বা শ্রেণী সংগ্রাম থাকিতেই পারে না। এ-মতও ভিত্তিহীন। স্বল্প পরিমাণ সম্পত্তিকে কেন্দ্র করিয়াও বৈষম্য, বিভেদ ও সংঘর্ষ সৃষ্টি হইতে পারে এবং হইয়া থাকে।

* "The fact is that neither in primitive nor in advanced cultures is there any co-relation between communism and absence of money. (B. Malinwaski III)

মানুষের মধ্যে স্বার্থবুদ্ধি আদিকালেও ছিল। এঙ্গেল্‌স বলেন এই বৃত্তি আগে ছিল না, পরে আসিয়াছে। এঙ্গেল্‌স, রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূলে এই অতি নীচ লোভবৃত্তিই কাজ করিয়াছে বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। গোষ্ঠীসমাজে কোন লোভ, দ্বেষ, স্বার্থ, সংঘর্ষ ইত্যাদি ছিলনা এবং পুলিশ, চুরি, জুলুম ইত্যাদি হইতে মুক্ত একটা স্বর্গরাজ্য বলিয়া এঙ্গেল্‌স ইহাকে কল্পনা করিয়াছেন। এই স্বর্গীয় সমাজে একদা মানুষের মনে বিষ ঢুকিল এবং স্বার্থবোধ সৃষ্টি হইল। 'আমার সম্পত্তি' বলিয়া অহং-বোধ জাগিয়া সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার উদ্যম আকাঙ্ক্ষা জাগিল। সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য ও বঞ্চিত গোষ্ঠীসমাজের লোকদের দাবাইয়া রাখিবার জন্য 'রাষ্ট্র'কে বানাইল স্বার্থপর মানুষ। বর্বর মানুষ সভ্য হইয়াছে এই স্বার্থপরতার সাহায্যে। বর্বর-জীবনের আনন্দময় গোষ্ঠী-জীবনকে ধ্বংস করিয়াছে এই নীচ ঘৃণ্য স্বার্থবৃত্তি। *

এঙ্গেল্‌সের এই মত ভ্রান্ত। স্বার্থবুদ্ধি মানুষের জীবনে পরে উদ্ভব হইয়াছে, পূর্বে ছিলনা—এই মত বিজ্ঞানবিরোধী। মনোবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব উভয় বিজ্ঞানই বলে আদি মানুষের মধ্যেও স্বার্থবৃত্তি ছিল। শুধু আর্থিক স্বার্থই নয়, জীবনের অন্যান্য ব্যাপারেও স্বার্থবুদ্ধি ছিল। এঙ্গেল্‌স ও মার্ক্সীয়গণ কেবল আর্থিক স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য স্বার্থও ক্রিয়াশীল ছিল। এই আর্থিক স্বার্থ অসভ্য মানুষের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি করিত না একথা ভুল। পশুপালন স্তরে ধনবৃদ্ধি হওয়ার পরেই কেবল স্বার্থবুদ্ধি মানুষের মধ্যে সংঘর্ষ আনিয়াছে তাহা নয়। পূর্বেও করিয়াছে, পূর্বেও সংঘর্ষ ছিল। বৈষম্য ছিল, সংঘর্ষও ছিল।

* "It is the by vilest means—theft, violence, fraud, treason—that the oid classless gentile society is undermined and overthrown." (Engels, p 120.)

কেবল আর্থিক নয়, অন্য নানা প্রকারের স্বার্থ ও অহংবোধ হইতে নানাপ্রকার সংঘর্ষ মানুষ-জীবনে বরাবরই আছে। কাজেই অসভ্যজীবনে সম্পত্তির বাহুল্য ছিল না বলিয়া স্বার্থবুদ্ধিও ছিল না, একথা অযৌক্তিক। কাজেই সমাজ বিকাশের একটি বিশেষ স্তরেই—অর্থাৎ পশুপালনজনিত ধনবৃদ্ধির যুগে এবং সভ্যতার স্তরে—কেবল রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিয়াছে ইহা ঠিক নয়। মানুষ যদি স্বার্থরক্ষার তাকিদেই রাষ্ট্রসৃষ্টি করিয়া থাকে তবে অসভ্য জীবনের আদিস্তরে রাষ্ট্র বিদ্যমান থাকা সম্ভব, কারণ আদি স্তরেও স্বার্থবোধ মানুষের ছিল। গোষ্ঠীসমাজের স্বর্ণযুগ মর্গান-মার্ক্সবাদী সম্প্রদায়ের কল্পিত একটা মানস সৃষ্টি মাত্র।

ব্যক্তি-সম্পত্তি হইতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি, এই মত যে একদেশদর্শী তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। আদিস্তরে কেবল গোষ্ঠীসম্পত্তি বা সামাজিক সম্পত্তিই বিদ্যমান ছিল, এ কথা কোন নৃতত্ত্ববিদ বলিবেন না। পরিবার-প্রথা যেখানে বিদ্যমান সেখানে ব্যক্তিসম্পত্তিও বিদ্যমান থাকিবে। পৃথিবীতে পরিবারই আদিমতম প্রথা এবং গোষ্ঠীপ্রথারও পূর্বে বিদ্যমান ছিল তাহা লাউয়ী প্রমাণ করিয়াছেন। ইহা হইতে স্বভাবতই প্রমাণ হয় যে ব্যক্তি-সম্পত্তিপ্রথাও চিরকাল বিদ্যমান আছে। বর্তমান পৃথিবীর অসভ্য সমাজেও ব্যক্তিসম্পত্তি ও সমাজসম্পত্তি এই দুই প্রথাই পাওয়া যায়। আদিকালেও যে ব্যক্তিসম্পত্তি প্রচলিত ছিল তাহা লাউয়ী, ম্যালিনাউস্কী প্রভৃতি প্রমাণ করিয়াছেন। এমন কি রিভার্সও (Rivers)—যিনি মর্গানী মতের অনেকখানি মানেন—বলিয়াছেন যে সম্পত্তি-সমস্যা অত সহজ নয়। বাঁধাবাঁধিভাবে গোষ্ঠীসম্পত্তিকে লুপ্ত করিয়া সর্বত্র ব্যক্তি-সম্পত্তি আসিয়াছে, একথা এঙ্গেল্‌সের যুগে বলা গেলেও অদ্যকার যুগে বলা চলে না। *

* "We shall find that the matter is far from simple..."

যেখানে যেখানে গোষ্ঠীসমাজ রহিয়াছে সেখানে সেখানেই পরিবারও রহিয়াছে। কাজেই সম্পত্তি ব্যাপারেও তাই কোন সহজ সূত্র বার করা চলে না। তাই গোষ্ঠীসম্পত্তির মধ্যেই আবার প্রায়ই লুকাইয়া থাকে ব্যক্তিসম্পত্তি। কাজেই দেখা যাইতেছে যে মর্গান-মার্ক্সবাদী রাষ্ট্রের উৎপত্তি-তত্ত্ব টিকে না। ব্যক্তিসম্পত্তি যদি চিরকাল থাকিয়া থাকে তবে রাষ্ট্রও চিরকাল আছে, এইরূপই দাঁড়ায়। তবে আসলে রাষ্ট্রের এই আর্থিক ব্যাখ্যাই ভ্রান্ত। সম্পত্তি হইতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে এই গোড়ার কথাই ভুল।

এই সূত্রে মার্ক্সীয় মতের আরেক দিকও ভ্রান্ত প্রমাণ হইতেছে। মাতৃক্রমিক গোষ্ঠীই এই মতে পূর্বতম। আর ব্যক্তি-সম্পত্তির আবির্ভাব হওয়ায়ই পিতৃক্রমিক গোষ্ঠীর উদ্ভব হইয়াছে, ইহারা বলেন। আধুনিক নৃতত্ত্ব এই পৌর্বাপর্য বা বিবর্তন-ক্রম স্বীকার করে না। বাঁধাধরা ছকই আজ অগ্রাহ্য। তাই রিভার্সও স্বীকার করেন যে "মানবজাতির বর্তমান প্রথাগুলি কোনটিই বিবর্তনের একটা সরল রৈখিক গতির পরিণতি নয়"। * কাজেই মাতৃক্রমকে বিনষ্ট করিয়া ব্যক্তি-সম্পত্তি কোন এক যুগে পিতৃক্রম আনিয়াছে এই মত আজ পরিত্যক্ত। রিভার্সও বলেন, "যারা তুলনা-মূলক গবেষণা করিয়াছেন তারা আজকাল এই সিদ্ধান্তেই আসিয়া পৌঁছিতেছেন যে আদিম স্তরে মাতৃসত্ত্ব বা পিতৃসত্ত্ব কোন একটিই আদিতর ছিল তাহা বলা চলেনা। †"

* "The existing institutions of mankind are not the result of a simple process of evolution." (Rivers. p. 97,)

† "The conclusion to which those students, whose ideas are based on a wide comparative study, are now coming is that we cannot regard the early state of human society as one in which it is possible to speak either of father-right or of mother-right." (Rivers, p 98.)

মাতৃসত্ত্ব বা মাতৃক্রমিক সম্পত্তিপ্রথা যদি পূর্বতন না হয় তবে মর্গানী-ক্রমের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রাষ্ট্রের বিবর্তন-তত্ত্বও ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই মতে ব্যক্তি-সম্পত্তির সঙ্গে আসিল পিতৃক্রম বা পুরুষপ্রাধান্য এবং তারই ফল হইল রাষ্ট্র সৃষ্টি। রাষ্ট্র সৃষ্টি হইল ব্যক্তি-সম্পত্তি রক্ষার জন্য। যদি গোষ্ঠীসমাজ, গোষ্ঠীসম্পত্তি, মাতৃক্রম হইতে পিতৃক্রম বা ব্যক্তি-সম্পত্তি উদ্ভব না হইয়া থাকে এবং যদি পূর্বাপর ব্যক্তি-সম্পত্তি বিদ্যমান থাকিয়া থাকে, তবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মর্গান-মার্ক্সবাদী মতও ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে।

ব্যক্তি-সম্পত্তি শ্রেণী সৃষ্টি করিল, এবং ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে নানা দেশের নানা গোষ্ঠীর লোককে একই স্থানে একত্রিত করিল। এই সব বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের সংঘাত লাগিয়াই থাকিত। এই সংঘর্ষকে কমাইয়া দাবাইয়া রাখিবার জন্যই 'রাষ্ট্র' নামক একটা বাহিরের শক্তি সৃষ্টি করা হইল। সাম্যবাদী সংঘর্ষহীন গোষ্ঠীসমাজের মধ্যে সম্পত্তি আসিয়াই এই সংঘর্ষ সৃষ্টি করিল। এই হইল এঙ্গেল্সের ব্যাখ্যা। †

কেবল নূতন দৌলত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য হইতেই 'রাষ্ট্র' নামক অভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব হইল এই মত একপেশে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, মর্গানী বিবর্তন-ছক ভাঙ্গিয়া পড়িলে, মার্ক্সীয় রাষ্ট্রতত্ত্বও ভাঙিয়া পরে। পিতৃক্রম আসিল বলিয়াই সন্তানকে সম্পত্তি-দানের আকাঙ্ক্ষায় সঞ্চয়-বৃত্তি আসিল এবং সঞ্চিত অর্থের ফলে ধনবৈষম্য দেখা দিল। বৈষম্যের

† "But in order that these antagonisms, classes with conflicting economic interests shall not consume themselves and society in fruitless struggle, a power, apparently standing above society, has become necessary to moderate the conflict and keep it within bounds of 'order,' and this power..........is the state." (Engels, p.216 & 132.)

ফল হইল এই যে ধনীরাই শক্তিশালী হইয়া উঠিলে পরে পুরুষানুক্রমিক রাজতন্ত্র দেখা দিল। এইভাবে পরিবারপ্রথা হইতেই গোষ্ঠীসমাজের ধ্বংস আসিল। গোষ্ঠীসমাজের সামাজিক ও সার্বজনীন প্রথা ধ্বংস হইয়া গেল। ব্যক্তি-সম্পত্তি ও ধনিকপ্রভুত্বকে রক্ষা করিবার জন্যই রাষ্ট্রকে আবিষ্কার করা হইল।

রাষ্ট্রের এই ব্যাখ্যা আজ অচল। মাতৃক্রম-পিতৃক্রম, গোষ্ঠীসম্পত্তি ও ব্যক্তিসম্পত্তি, গোষ্ঠী ও পরিবার, এইভাবে সমাজের বিবর্তনই হয় নাই। রাজতন্ত্রের উদ্ভবের এই ব্যাখ্যাও অবাস্তব ও একপেশে। মাতৃক্রম হইতে যদি পিতৃক্রম না উদ্ভূত হইয়া থাকে, গোষ্ঠীসম্পত্তি হইতে যদি ব্যক্তিসম্পত্তি না আসিয়া থাকে, গোষ্ঠী হইতে যদি পরিবারের উদ্ভব না হইয়া থাকে—তবে এই রীতিতে রাষ্ট্রও সৃষ্টি হয় নাই। তাছাড়া সংঘর্ষ কেবল ব্যবসা-বাণিজ্য হেতুই হয় না। আদিকালে উপজাতীয় সংঘর্ষ ছিল, ইহা সর্বস্বীকৃত। তাছাড়া, ভূমি বা দেশ লইয়াও সংঘর্ষ ছিল। ইহা ছাড়া, পরিবারের সঙ্গে পরিবারের ও ব্যক্তির সহিত ব্যক্তিরও সংঘাত ছিল। এ-অবস্থায় এই সব রকমের সংঘর্ষকে দাবাইয়া রাখিয়া শান্তিরক্ষার জন্যও-তো 'রাষ্ট্র' সৃষ্ট হইতে পারিত। কেবল একই পথে একই রীতিতে বাণিজ্য-জনিত শ্রেণী-সংঘর্ষকে শান্ত করিবার জন্য এবং সম্পত্তির দাবিদারদের দাবাইয়া রাখিবার জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন হইয়াছে একথার পিছনে যুক্তি নাই।

প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র কেবল অর্থনীতি হইতেই জন্ম নেই নাই। অপরাপর বহু কারণ হইতে ইহার জন্ম হইয়াছে। বহুবিধ শক্তি ও কারণের সমবায়ে ও প্রভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি। এই সব কারণ কেবল কোন একটিমাত্র যুগেই দেখা দিয়াছিল তাহা নয়। মানব-জীবনে বহুবিধ শক্তি ও প্রয়োজনের তাকিদ চিরদিনই ছিল। মানুষ যতদিন আছে, পৃথিবীতে

রাষ্ট্রও কোনো-না-কোনো আকারে ততদিনই আছে। মানুষের ভিতরে দেহের ও মনের নানা দিক, নানা রুচি, নানা শক্তি ও প্রয়োজন চিরকালই রহিয়াছে। সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত বিকাশ ঘটিয়াছে কিন্তু মৌলিক বৃত্তিগুলি মানুষের ঠিকই রহিয়াছে। তাই অসভ্য ও সভ্য মানুষের গভীরতম অন্তরে একই সত্তা এবং একই প্রবণতা রাজত্ব করিতেছে। কাজেই প্রয়োজন এবং প্রয়োজনানুরূপ প্রতিষ্ঠান ও প্রথা চিরদিনই মানুষের একই রকম রহিয়াছে। বিবাহ, পরিবার, রাষ্ট্র, ধর্ম, শিল্প, কলা —এসবই স্থূল আকারে আদিম মানুষে রহিয়াছে, তেমনি পরিণত আকারে সভ্য মানুষেও রহিয়াছে। এই দৃষ্টিভংগীতে রাষ্ট্রও আদিম প্রতিষ্ঠান। কারণ রাষ্ট্রও মানুষের মৌলিক কতকগুলি বৃত্তির প্রকাশ এবং কতকগুলি মৌলিক প্রয়োজনের সৃষ্টি। কোন একটা মাত্র প্রয়োজন বা বৃত্তি নয় বহু বৃত্তি ও প্রয়োজন রাষ্ট্রের সৃষ্টির মূলে। রাষ্ট্রের এই বহুবাদী ব্যাখ্যাই বিজ্ঞানসম্মত।

ভূগোলবাদীরা রাষ্ট্রকে ভৌগোলিক পরিস্থিতির প্রকাশ ও সৃষ্টি বলেন। ভূগোলের প্রভাব স্বীকার্য। কিন্তু রাষ্ট্রগঠনে ইহাই সব নয়। তাই ব্লুণ্ট্‌শ্‌লীর (Bluntschli) ভাষায় বলা যায়, "প্রাকৃতিক শক্তির গুরুত্বকে আতিশয্য দেওয়া ঠিক নয়। আসলে মানুষের পরস্পরের নৈতিক ও বুদ্ধিগত সহায়তা ও শিক্ষার উপরে রাষ্ট্র যতখানি নির্ভর করে প্রাকৃতিক শক্তির উপরে ততখানি করে না।......মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির সৃষ্টি নয়.... ।‡

‡ "But must not exaggerate the importance of natural phenomena. After all, less depends on them than on the moral and intellectual education of man by man....... Man is not the creature of natural forces" ....(The Theory of State—Bluntschli p. 231)

তেমনি **সামাজিক চুক্তিবাদীরাও** (Social Contract) আর এক দিকে আতিশয্য করিয়াছে। এই মতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে মানুষের স্বেচ্ছাকৃত পারস্পরিক চুক্তির ফলে। তিনজন পণ্ডিত এই মতবাদ প্রচার করিয়াছেন,—হবস্ (Hobbes) লক্ (Locke) এবং রুশো (Rousseau)। এই তিনের মতবাদে পার্থক্য রহিয়াছে। তিনেরই মতে, আদিকালে রাষ্ট্র ছিল না। মানুষ এক 'প্রাকৃতিক অবস্থায় (State of Nature)' বাস করিত। শাসন ছিল না, সমাজ ছিল না, নীতি ছিল না। পরে একদা সবাই মিলিয়া এক চুক্তি সম্পাদন করিয়া চুক্তি অনুসারে ব্যক্তির অধিকারকে খর্ব করিয়া এক রাষ্ট্র স্থাপন করে এবং রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে। একেই 'সামাজিক চুক্তিবাদ' বলা হয়। ইতিহাসের কোন এক ক্ষণে মানুষ সচেতনভাবে ও স্বেচ্ছায় রাষ্ট্র স্থাপন করিল, ইহাই এই মতের মূল কথা। হব্‌সের মতে আদিম প্রাকৃত স্তর হইল একটা সংঘর্ষময় বিশৃঙ্খল অবস্থা। মানুষ রাষ্ট্রশক্তির কাছে তার ব্যক্তি-অধিকারকে ছাড়িয়া দিয়া তবে সামাজিক জীবন গঠন করিল, রাষ্ট্র কায়েম করিল। রুশোর মতে, প্রাকৃত স্তরই মানুষের সাম্য ও শান্তির স্বর্ণযুগ। সার্বিক এষণার (General Will) প্রকাশ হয় রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া। আসলে যে রাষ্ট্রের কাছে মানুষ আনুগত্য দেয়, অধিকারকে ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইল স্বয়ং জনসাধারণ। এই প্রাকৃত যুগে সম্পত্তি ছিল না, মর্যাদার তারতম্য ছিল না, অন্যায় ছিল না। পরে মানুষের অবনতি হওয়ার জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন হইল।

এই কল্পিত স্বর্ণযুগের সহিত মার্ক্সবাদী গোষ্ঠীসমাজের একদিক দিয়া সাদৃশ্য রহিয়াছে। রাষ্ট্রহীন এবং সংঘর্ষহীন এই অবস্থা মার্ক্স-মর্গানী মতবাদও কল্পনা করিয়াছে। কিন্তু কল্পিত রাষ্ট্রহীন স্বর্ণযুগ একান্ত

অবাস্তব এবং অযৌক্তিক। মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই রহিয়াছে রাষ্ট্রে প্রয়োজন, শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজন। তাই রাষ্ট্রহীন অবস্থা কাল্পনিক কোন-না-কোন আকারে রাষ্ট্রব্যবস্থার কোন রূপায়ন চিরদিনই সমাজে আছে। এরিষ্টট্ল্ (Aristotle) বহুপূর্বে বলিয়া গিয়াছেন, মানুষ 'রাষ্ট্রনৈতিক জীব'। রাষ্ট্র ব্যতীত মানুষের চলে না। যেখানে মানুষ থাকিবে সেখানেই সে রাষ্ট্র পত্তন করিবে। তাই ব্লুণ্ট্‌শ্‌লী বলেন "সামাজিক চুক্তিবাদ মানুষের রাষ্ট্রনীতিপ্রবণ স্বভাবের কথাই বা দিয়া গিয়াছে। আর মানুষ যে 'রাজনৈতিক জীব' এরিষ্টট্লের এই সত্যকে উপেক্ষা করিয়াছে।" এই চুক্তিবাদে—এবং মার্ক্সবাদেও—রাষ্ট্র একট অবাঞ্ছিত অপপদার্থ, একটা necessary evil বলিয়া ধরা হইয়াছে কিন্তু রাষ্ট্র নীচ ও মিথ্যা একটা বৃত্তি হইতে জাত হইয়া মানুষকে হাজার হাজার বছর ধরিয়া বিভ্রান্ত ও অধঃপতিত করিতেছে, একথ বলিলে ইতিহাসকে বিকৃত করা হইবে। রাষ্ট্র মানবজীবনের অমো প্রয়োজন হইতে সৃষ্টি হইয়াছে; আধুনিক সমাজতত্ত্ব তাই রাষ্ট্রকে এ দৃষ্টিতে দেখে না। মার্ক্সবাদেরও ত্রুটি এইখানে। রাষ্ট্রকে কেবলমা অর্থলোভ ও নীচপ্রবৃত্তির সৃষ্টি বলিয়া নির্ধারণ করার মূলে রহিয়াছে মার্ক্সবাদের যান্ত্রিক দৃষ্টিভংগী।

সামাজিক চুক্তিবাদ, বিজ্ঞান অগ্রাহ্য করিয়াছে। ইহাই বাস্তব যুক্তির বিরোধী বলিয়া। তবে এই মতবাদেও কিছু সত্য রহিয়াছে ভূগোলবাদী যেমন ভূগোলকে সর্বমূল বলিয়াছে, চুক্তিবাদী মানুষের ইচ্ছ শক্তি, স্বাতন্ত্র ও বুদ্ধির উপরে জোর দিয়াছে। মানবিক দিকটা উপরে গুরুত্বদান করিয়া ইহা একটা সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে প্রকৃতিই সব নয়, ভূগোলই সব নয়, মানুষেরও কৃতিত্ব আ

রাষ্ট্রগঠনে।† এইটুকু সত্য চুক্তিবাদে আছে কিন্তু মতবাদ হিসাবে ইহা আজ অচল।

রাষ্ট্রের অধ্যাত্মবাদী ব্যাখ্যাও (Idealistic Interpretation of State) অসম্পূর্ণ। হেগেল রাষ্ট্রকে অধ্যাত্ম ও নৈতিক শক্তির বিগ্রহ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং রাষ্ট্র-শক্তির বিপুল সর্বগ্রাসী মাহাত্ম্যের মধ্যে ব্যক্তিকে লুপ্ত করিয়া দিয়াছেন। এই ব্যাখ্যাও একপেশে। রাষ্ট্রই অধ্যাত্মশক্তির একমাত্র এবং অদ্বিতীয় আধার—এখানে যুক্তিতে ত্রুটি রহিয়াছে। রাষ্ট্রকেই বাছিয়া লইয়া এই গৌরব দান করিবার কোন কারণ নাই। রাষ্ট্র সমাজ-জীবনের একটা দিক মাত্র এবং বহুমুখী সমাজ জীবনের এক অঙ্গ। ঐহিক জগতে জড়শক্তি ও তাহার বহু ব্যঞ্জনাকে হেগেল এড়াইয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহার মতবাদ একপেশে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যক্তির রাষ্ট্রিক অধিকার এ-মতে জলাঞ্জলি দেওয়া হইয়াছে এবং প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রই সমাজের চরম পরিণতি বলিয়া ধার্য হইয়াছে।

রাষ্ট্রের দৈবিক ব্যাখ্যা (Divine Theory) অনুসারে রাষ্ট্র হইল দেবতার সৃষ্টি এবং দৈব অংশ। মধ্যযুগে বিশেষ করিয়া এই মতবাদ প্রচারিত হয়। খৃষ্টধর্মের প্রভাব এই মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। ঈশ্বরের আদেশ পালন এবং তাঁহার ইচ্ছাকে রূপ দিবার জন্যই রাষ্ট্র। মুসলীম ও খৃষ্টধর্মের রাষ্ট্রতত্ত্বই এই। ভারতবর্ষেও প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই মতবাদ প্রচলিত ছিল। এই মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ব্যাখ্যার উপর স্থাপিত।

---

† "Nevertheless it contains an element of truth. In opposition to the theory which sees in the state a mere product of nature, it accentuates the truth that the human will can determine and influence the formation of the state......" (Bluntschli p. 197).

ঐহিক জগতের বিবর্তন ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দৈবী শক্তির আমদানী করিয়া এই সম্প্রদায় ব্যাখ্যা করিবার দায়িত্বকে এড়াইয়াছেন।

রাষ্ট্রের বংশবাদী (Racialist) **ব্যাখ্যাও** তেমনি একপেশে। গোবিনু (Gobineau), চেম্বারলেন, আমন (Ammon), বারজেস (Burgess) প্রমুখ বংশবাদী পণ্ডিতেরা রাষ্ট্রের উৎপত্তি বংশ বা রক্তদ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। রাষ্ট্রের রূপও নিয়ন্ত্রিত হয় রক্তের প্রভাব দ্বারা। এই ব্যাখ্যাকে জনন-বিদ্যা, নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব একযোগে বর্জন করিয়াছে।

রাষ্ট্রের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেন ম্যাকৃডুগাল, ট্রটার * (Trotter), ফ্রয়েড প্রভৃতি। ইহারা সবাই কতকগুলি সহজাত মনোবৃত্তি (Instinct)' এবং চিত্তাবেগ (Impulse) হইতে রাষ্ট্র—এবং অন্যান্য সমাজপ্রথা—উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বলেন। ট্রটার যূথবৃত্তিকে, ম্যাকৃডুগাল এগারটী বৃত্তিকে এবং ফ্রয়েড যৌনবৃত্তিকে সমষ্টিজীবনের উৎস বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই মত জীবনের একদিকের উপরে অত্যধিক জোর দিয়া একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়াছে।

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা প্রধানতঃ মার্ক্সবাদেরই মূল তত্ত্ব। রাষ্ট্র-গঠনে যে অর্থনীতির প্রভাব রহিয়াছে তাহা লোরিয়া (Loria), ওপেনহাইমার (Oppenheimer), গুমপ্লাবিজ্ (Gumplowicz), ডুরখীম (Durkheim) প্রভৃতি সমাজতাত্ত্বিকেরা বিশেষভাবে স্বীকার ও বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু মার্ক্সবাদ যে-ভাবে রাষ্ট্রের বিবর্তনকে ছক কাটিয়া অনড় স্তরপর্যায়ের মধ্য দিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছে তেমনভাবে আর কেহ করেন নাই। এই মতবাদে রাষ্ট্র হইল অর্থনীতির ছায়া মাত্র। অর্থনীতি, এই মতে, সমাজের সর্বশক্তিমান সার্বভৌম প্রভু। অথচ, অর্থনীতি হইল

* Instincts of Herd in peace and war.

সমাজ-জীবনের অন্যান্য দিকের মধ্যে একটা দিকমাত্র। যাহারা রাষ্ট্রকেও সমাজে সার্বভৌম অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি বলিয়া পূজা করিতে চাহেন তাহারা যেমন আতিশয্য-দুষ্ট, তেমনি যাহারা অর্থশক্তিকেও সার্বভৌম রাষ্ট্র বা রাজার আসনে বসাইতে চাহেন তাহারাও একদেশদর্শী। কোল (Cole) সাহেব তাই বলেন যে, এই মার্ক্সবাদ অগ্রহনীয়। "মার্ক্সীয় অর্থবাদও রাষ্ট্রিক সার্বভৌমত্ববাদেরই আরেক পিঠ মাত্র। সার্বভৌম রাষ্ট্রবাদ যেমন অগ্রাহ্য হইয়াছে, ইহাও তেমনি অগ্রাহ্য।" ¶ রাষ্ট্রের উপরে অর্থনীতির প্রভাব আছে এবং চিরকালই এ প্রভাব থাকিবে। কিন্তু এ প্রভাব সর্বগ্রাসী এবং সার্বিক নয়। মার্ক্সবাদ এখানেই ভুল করিয়াছে। গোটা সমাজ-জীবনকেই অর্থনীতি বলিয়া মার্ক্সবাদ মনে করিয়াছে। অংশকে পূর্ণ বলিয়া ভুল করিয়াছে। অবশ্য এই ভুলেরও কারণ রহিয়াছে। বর্তমান সমাজে রাষ্ট্রের উপরে পুঁজি-বাদীদের অতিরিক্ত প্রাধান্য দেখিয়াই এই সম্প্রদায় রাষ্ট্রকে পুঁজিবাদের সৃষ্টি বলিয়া মনে করিয়াছে। আর্থিক শ্রেণী বা অর্থনীতির এই অতিরিক্ত প্রভাব একটা সাময়িক বিকৃতি বই আর কিছু নয়। অর্থনীতির সহিত রাষ্ট্রনীতি ও অন্যান্য সামাজিক ব্যাপারের সম্পর্ক বিকৃত হইয়া এই আতিশয্য ঘটিয়াছে। সুস্থ স্বাভাবিক সমাজ-জীবনে এই বিকৃতি থাকিবে না। এ-সম্বন্ধে কোলও অর্থনীতির এই বিকৃত প্রাধান্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।*

¶ "In fact we are here faced by a theory which is the complete inversion of the theory of state sovereignty which we have already rejected. Having pulled down the state from its pedestal, we are asked to install the economic structure of society in its place." (Social Theory, p 145)

* "We have, however, always treated the influence of economic factors upon non-economic forms of asso-

আর্থিক ব্যাখ্যার আর এক ত্রুটি হইল এই যে, ইহা কেবল সংঘর্ষের উপরই সম্পূর্ণ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। লোরিয়া, ওপেনহাইমার, গুমপ্লাবিজ শ্রেণী-সংঘর্ষকে সামঞ্জস্য করিয়া সমাজকে রক্ষা করিবার জন্যই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু সংঘর্ষের মধ্য দিয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তির সাহায্য হইয়াছে একথা ঠিক হইলেও সত্যের একপিঠ মাত্র। সমাজতত্ত্বে ইহা প্রমাণ হইয়াছে যে সহযোগ এবং শান্তির মধ্য দিয়াও রাষ্ট্রগঠন সম্ভব হইয়াছে। নোভিকাউ (I. Novicow) দেখাইয়াছেন যে যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যদিয়া বিজয়ী জাতি যেমন রাষ্ট্রস্থাপন করিয়াছে, তেমনি শান্তিপূর্ণকালে ব্যবসা-বাণিজ্য ও আদান-প্রদানের জন্যও রাষ্ট্রস্থাপন চলিয়াছে।† ক্রোপট্‌কিন্‌ও (Kropotkin) সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিকাশে সহযোগিতার ক্রিয়াকারিত্ব ও গুরুত্ব প্রমাণ করিয়াছেন।¶ এ সম্বন্ধে ব্লুণ্ট্‌শ্‌লীও বলেন যে, পশুশক্তি রাষ্ট্রস্থাপনের মূলে থাকিলেও ইহাই একমাত্র কারণ নয়।‡

যারা পশুশক্তিকেই (Force) রাষ্ট্রোৎপত্তির মূল বলেন তারা একদেশদর্শী। এঙ্গেল্‌স্ এই পশুশক্তি-বাদ (Doctrine of force) অস্বীকার

---

ciation as a form of perversion, leading to a failure of the association so affected to fulfil its proper function in society." (Social Theory, p 145.)

† The Critique of Social Darwinism

¶ Mutual Aid, A factor in Evolution—Kropotkin.

‡ "Certainly, force shows itself more often in the foundation of states than contract, but only very seldom has brute force alone arbitrarily produced states and never great and lasting states." (Bluntschli,—"Theory of the State," p. 292).

করিয়া তাহার "ডুয়েরীং-বিরোধী" পুস্তকে অর্থনীতিকেই একমাত্র কারণ বলিয়াছেন। কিন্তু পশুশক্তিও যে রাষ্ট্রের উৎপত্তির একটা প্রধান কারণ ইতিহাসে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী স্পেন্সার, বেগ্‌হট্ (Bagehot), গুমপ্লাবিজ প্রমাণ করিয়াছেন যে দুর্বল উপজাতিকে আত্মসাৎ করিয়া বিজয়ী উপজাতিরাই চিরকাল রাষ্ট্রস্থাপন করিয়াছে। এই মত রাৎসেনহোফার (Ratzenhofer), ওপেনহাইমার প্রমুখ-রা গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই এঙ্গেল্‌স্ যে পশুশক্তি ও যুদ্ধ বিজয়কে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন ইহা তাহার গোঁড়ামী মাত্র। তবে এই ব্যাখ্যাও—যাহাকে রাষ্ট্রের শক্তিবাদী ব্যাখ্যা বলা হয়—একপেশে। পশুশক্তি একমাত্র কারণ নয়, অন্যান্য বহু কারণের মধ্যে অন্যতম।

আর্থিক ব্যাখ্যার অন্যান্য ত্রুটি পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। নির্দিষ্ট স্তরবিভাগ করিয়া অনিবার্য একটা ক্রম নির্ধারণ করায় এই ব্যাখ্যা বিজ্ঞানবিরোধী হইয়া পড়িয়াছে। অনিবার্য স্তরপর্যায় আজ প্রত্যাখ্যাত। এই প্রত্যাখ্যানের মূলে আছে আমেরিকার নববিজ্ঞানীদল। এই নব সমাজ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে আছেন ফ্র্যান্‌জ বোয়াস্, লাউয়ী, ভিস্‌লার, গোল্ডেনভাইজার, ক্রোয়েবার এবং বোয়াসের নেতৃত্বে ইহারা আজ **নূতন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের** ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন, বিস্তৃত গবেষণা ও তথ্যসংগ্রহের দ্বারা। সম্পত্তিকে কেন্দ্র করিয়া রাষ্ট্র বিবর্তিত হইয়াছে এবং সম্পত্তির নানা রূপান্তরের সহিত রাষ্ট্রও রূপান্তরিত হইয়াছে, এই কার্যকারণ-শৃংখলা মর্গান-মার্ক্সীয় রাষ্ট্রতত্ত্বের একটা প্রধান কথা। মার্ক্স-মর্গানের অন্যান্য ক্রম ও ছক যেমন ভুল প্রমাণ হইয়াছে রাষ্ট্রতত্ত্বের ছকও তেমনি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। এই ছক অনুসারে আদিম জীবনে সম্পত্তি ছিল না, অতএব রাষ্ট্রও ছিল না। গোষ্ঠীজীবনে (gentile) ছিল প্রাকৃতিক, সরল গণতন্ত্র এবং ব্যক্তি-সম্পত্তি সৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভব হইয়াছে রাজতন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারতন্ত্র।

লাউয়ী এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে সম্পত্তির সহিত রাষ্ট্রের এই কল্পিত সম্বন্ধ ভিত্তিহীন। আদি গোষ্ঠীসমাজে গণতান্ত্রিক সাম্য ছিল, একথা তথ্য দ্বারা সমর্থিত হয় না। বহু আদি জাতির মধ্যে রাজতন্ত্র এবং সম্ভ্রান্ততন্ত্র (aristocracy) প্রচলিত ছিল ও আছে। বহু উন্নত জাতিতেও গণতন্ত্র রহিয়াছে। মর্গানের এই মত সম্বন্ধে লাউয়ী তীব্র ব্যঙ্গোক্তি করিয়া বলিয়াছেন, "স্পষ্ট বলা চলে যে মর্গান অনেক অর্থহীন উক্তি করিয়াছেন, কিন্তু তাহার এই কথাটীর মত অকাট প্রলাপোক্তি মর্গান অন্য কোথাও করিতে পারেন নাই।"*

গোষ্ঠীসমাজ হইতে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন হইয়া ভৌমিক রাষ্ট্র (territorial state) আবির্ভূত হইল, ইহাই মর্গান-মার্ক্সীয় মত। গোষ্ঠীসমাজে রাষ্ট্র ছিল না, পুলিশ ছিল না, ছিল জ্ঞাতি ও গোষ্ঠীজনের রক্তের বন্ধন ও সামাজিক শাসন। যখন বহু গোত্র ও গোষ্ঠীর লোক বাণিজ্য করিতে একই স্থানে বসবাস শুরু করিল তখন গোষ্ঠীশাসন ভাঙিয়া গিয়া বিবিধ গোষ্ঠীর একটি স্থানীয় সমবায় এবং রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিল। এই ভাবেই আধুনিক কালের ভৌমিক বা স্থানিক রাষ্ট্রের সূচনা হইল। পরস্পরের আর্থিক স্বার্থকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্যই এই রাষ্ট্রের প্রয়োজন হইয়াছিল। রক্তসম্পর্ককে ছাড়াইয়া এইবার মানুষ অর্থ-সম্পর্ককে মর্যাদা দিল এবং স্থান বা ভূমিকে অবলম্বন করিয়া রাষ্ট্র গড়িল।

মার্ক্সবাদী এই মতবাদও আমেরিকার নব-সমাজবিজ্ঞান খণ্ডন করিয়াছে। রক্তসম্পর্কিত গোষ্ঠীশাসন হইতে আকস্মিক এই স্থানিক রাষ্ট্রগঠন একটা

---

* "It may be said categorically that even at his worst Morgan never perpetrated more palpable nonsense, and that is saying a good deal." (Lowie.)

বৈপ্লবিক পরিবর্তন, কিন্তু এই ভাবেই ইতিহাসে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে একথা ভিত্তিহীন। লাউয়ী দেখাইয়াছেন যে ইতিহাসে এই ধরণের আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে নাই। গোত্রবন্ধন এবং রক্তসম্বন্ধের সহিত স্থানিক রাষ্ট্রের এই রকম হঠাৎ ছেদ ঘটে নাই। সর্বসম্মতিতে বা আইন করিয়াও এই পরিবর্তন ঘটে নাই। স্থানিক রাষ্ট্রের উৎপত্তি দীর্ঘ দিন ধরিয়া ধীরে ধীরে ঘটিয়াছে এবং তাহার ভিত্তিও ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে। বহু শতাব্দী ধরিয়া বহুবিধ আদিম প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক রূপায়নের মিশ্রণ হইয়া এই ধরণের রাষ্ট্র গড়িয়াছে। ইহার মূলে বহুবিধ প্রয়োজন কাজ করিয়াছে। নানা প্রকারের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য, নানা অবস্থায়, নানা কারণে ও নানা পদ্ধতিতে স্থানিক রাষ্ট্র আবির্ভূত হইয়াছে। বাইরের শত্রুর সহিত যুদ্ধবিগ্রহের প্রয়োজন পড়িয়াছে। ভিতরেও দীর্ঘকাল একরাজ্যে বাস করিয়া সমবেত স্বার্থকে রক্ষা করিবার দরকার হইয়াছে। এই ভাবে একস্থানের অধিবাসীরা ক্রমে ক্রমে একটা রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছে। হঠাৎ একটা স্তরে কেবল **একটি মাত্র কারণে**—সম্পত্তিস্বার্থে এবং একই গোষ্ঠীর দরিদ্রকে শোষণ করিবার জন্য—মানুষ রাষ্ট্র সৃষ্টি করে নাই।*

কাজেই সম্পত্তিই মানুষকে রক্ত সম্পর্ককে ছাড়াইয়া স্থানিক রাষ্ট্র গড়িতে বাধ্য করিয়াছে, এ মত ভ্রান্ত। মাতৃক্রম বা পিতৃক্রম, ইহার কোন পদ্ধতির

* "Finally, Lowie shows..........that there was no sharp and complete break between kinship-society and the political or territorial state...........The origin of the territorial state was prepared for centuries before its formal and final appearance by many and diverse types of primitive associations and by special forms of group organisations which joined by the population of a territorial

উপরেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি নির্ভর করে নাই। মাতৃক্রম হইতে পিতৃক্রম আসিয়াছে এ মত আজ পরিত্যক্ত। কাজেই গোষ্ঠী সমাজ থাকুক কি না থাকুক, তাহার সহিত রাষ্ট্রের উৎপত্তির কোন সম্বন্ধই নাই। এমন সমাজ আদিমকালে ছিল, এবং এখনো আছে যাদের মধ্যে গোষ্ঠীপ্রথা (gens বা clan) উদ্ভবই হয় নাই। অথচ এসব সমাজেও কোন না কোন প্রকার রাষ্ট্র বিদ্যমান আছে। কাজেই এক স্থানে আবাস-ই মানুষ-জীবনের নানা স্বার্থ ও প্রয়োজনের তাগিদে রাষ্ট্রকে সৃষ্টি করিয়াছে, এই মতই অধুনা গ্রাহ্য। মার্ক্সবাদী আর্থিকব্যাখ্যা আজ তাই প্রত্যাখ্যাত।

উপরোক্ত রাষ্ট্রব্যাখ্যা ও রাষ্ট্রতত্ত্বের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি সবাই একদেশদর্শী। কী ভৌগোলিক ব্যাখ্যা, কী আর্থিক ব্যাখ্যা, কী মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, কী ধর্মীয় ব্যাখ্যা, কী দৈবিক ব্যাখ্যা, কী শক্তিবাদী ব্যাখ্যা, কী চুক্তিবাদী ব্যাখ্যা,—এই সব মতবাদই রাষ্ট্রতত্ত্বের ক্ষেত্রে একপেশে। কিন্তু একথা উল্লেখযোগ্য যে এই সব মতবাদেরই মধ্যে আংশিক সত্য কিছু আছে। সবগুলি ব্যাখ্যা বা মতবাদই কোন একটী মাত্র উপাদানকে লইয়া তাহাকেই রাষ্ট্র-বিবর্তনের মূল কারণ বলিয়া ধরিয়াছে। আধুনিক সমাজবিজ্ঞান বলে, রাষ্ট্রের ব্যাখ্যাতেও বহুবাদী ব্যাখ্যারীতিই বিজ্ঞান-সম্মত। অর্থাৎ, বহু কারণের সমবায়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিবর্তন হইয়াছে। ভৌগোলিক প্রয়োজন, মানুষের মনস্তাত্ত্বিক-সামাজিক প্রয়োজন, রক্তের প্রভাব, অর্থের প্রভাব, যুদ্ধবিগ্রহ, পশুশক্তি বা বলপ্রযোগ,—এই সব কারণই রাষ্ট্র-বিবর্তনের মূলে আছে।

সম্পত্তিহীন ও রাষ্ট্রহীন একটা অবস্থা মানুষের আদিম অবস্থা, এই মত মার্ক্সবাদের ভিত্তি। রাষ্ট্র যে একদা ছিল না তাহা প্রমাণ করিবার

aggregate into unity for certain forms of action, many of them of a political nature, irrespective of the diversity of kinship relations." (H. E. Barnes,—Recent Political Theories, p 368.)

জন্য এঙ্গেল্‌স যথারীতি চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে গ্রীসদেশেই প্রথম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এর আগে রাষ্ট্র ছিল না। রাষ্ট্র ছিল না এ মত আজ অগ্রাহ্য। এঙ্গেল্‌স 'রাষ্ট্র' বলিতে যদি আধুনিক পরিণত ও উন্নত রাষ্ট্রই ধরিয়া লন, তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে আদিমকালে আধুনিক রাষ্ট্র ছিল না। কিন্তু রাষ্ট্রেরও যে ক্রমবিবর্তন আছে একথা এঙ্গেল্‌স ও মার্ক্সবাদীরা ভুলিয়া যান। রাষ্ট্রেরও প্রাথমিক অবস্থা গিয়াছে, আদিম অবস্থা গিয়াছে। দীর্ঘকালের বিবর্তনেই আধুনিক রূপ গড়িয়া উঠিয়াছে। আদিম কালে যে রাষ্ট্র ছিল তাহার রূপও আদিম কালোপযোগী ছিল। সেই রাষ্ট্র হইল আধুনিক কালের রাষ্ট্রের ভ্রূণ এবং বীজ। রাষ্ট্রের যা সার্বকালিক লক্ষণ তাহা আদিম কালের রাষ্ট্রেও ছিল। আদিমকালের সমাজ-ব্যবস্থা যে শাসনশক্তি ও কেন্দ্র সমাজকে অব্যাহত রাখিত সেই শাসন-কেন্দ্রই সে যুগের রাষ্ট্র। সংঘজীবন যখন একটা কেন্দ্র হইতে পরিচালিত হয়, সেই কেন্দ্রই রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দেওয়া খুবই কঠিন। শুধু এভাবে বলা চলে যে একত্র বাসের ফলে মানুষের মতে যে বৃহত্তর ঐক্যবোধ জন্মায় তাহার সংঘরূপই রাষ্ট্র। সংঘরূপ বলিতেই শাসনশক্তি বোঝা যায়। নিয়ন্ত্রণ করিয়া শাসন করিবার অধিকার যখন একস্থানে সর্বস্বীকৃত তখন সেখানেই রাষ্ট্র আছে বলিতে হইবে। কোলের মতে মানুষ সমাজবদ্ধ অবস্থায় বাস করিলে কতকগুলি ব্যক্তিগত পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং যে সংঘের প্রধান উদ্দেশ্য এই সব পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়া কারবার করা সেই সংঘকেই রাষ্ট্রনৈতিক সংঘ বা রাষ্ট্র বলা চলে।* একটা জনসমবায়ের সমবেত সাধারণ হিতের জন্য যে সংঘ তাহাই

* "By a political association I mean an association of which the main purpose is to deal with those personal relationships which arise directly out of the fact that

রাষ্ট্র। সমবায়ের অন্তর্গত ব্যক্তির রক্ষাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। এমন কতকগুলি স্বার্থ আছে যা সকলেরই সমানভাবে রক্ষা করার প্রয়োজন আছে। এই সাধারণ স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ভিতরের ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বাইরের অন্যান্য সমবায় বা জনসংহতির সঙ্গে সম্পর্ক, এই দুইকেই নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। নিয়ন্ত্রণ যে করে তাকেই বলি রাষ্ট্র। † আদিম সমাজেও এই সাধারণ কল্যাণের জন্য সংঘজীবন ছিল, তার আইনকানুন ছিল, আইনভঙ্গের সাজা দিবার ব্যবস্থা ছিল। এই কারণে রাষ্ট্রব্যবস্থাও ছিল।

এঙ্গেল্‌স কিন্তু ইহা স্বীকার করেন না। তিনি রাষ্ট্রের অন্য সংজ্ঞা কল্পনা করিয়া তারপর বলিতেছেন যে রাষ্ট্র পূর্বে ছিল না। অতি আদিমকালে তো দূরের কথা, রাষ্ট্র এথেন্সে ও রোমানদের মধ্যেও প্রথম দিকে ছিল না। রাষ্ট্র বলিতে এঙ্গেল্‌স বোঝেন এমন একটা সংঘ, যাহাতে সাধারণ প্রজাগণ হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক একটা সাধারণ ও পাব্লিক শক্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। ‡

পাব্লিক শক্তি মানে কি, স্পষ্ট নয়। তবে মনে হয় এঙ্গেল্‌স পুলিশ ও সৈন্য সামন্ত বুঝাইতে চাহিয়াছেন। কাজেই মার্ক্সবাদী মতে যে

men live together in communities, and which require and are susceptible to, social organisation." (Cole, p. 66).

† "The state is the political organisation of the individuals of a community for the common good."

‡ "………essential characteristic of the state is the existence of a public force differentiated from the mass of the people." (Engels—Origin of Family p 146.)

সমাজে পৃথক সৈন্য-পুলিশ শক্তি সৃষ্ট হইয়াছে তাহাকেই রাষ্ট্র আছে বলা চলিবে। ইহাই এঙ্গেল্‌সের মতে রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই মত বৈজ্ঞানিক নয়। এঙ্গেল্‌স রাষ্ট্রহীন অবস্থা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যকে সামনে রাখিয়া রাষ্ট্রের এই সংজ্ঞা দিয়াছেন। রাষ্ট্রেরও ক্রমবিকাশ হইতেছে। ক্রমবিকাশের একটা লক্ষণ বিভক্তিকরণ বা বিভাগায়ন (differentiation)। বিবর্তন ও অগ্রগতির মুখে রাষ্ট্রের নানা প্রকার নূতন নূতন ক্রিয়া (Function) এবং বিকাশবৈচিত্র্য দেখা দেয়। নানা বৈচিত্র্য ও জটিলতা সৃষ্ট হয়। এই সব বিচিত্র ও বিবিধ ক্রিয়া বাহুল্যকে নানাবিভাগে ভাগ করিয়া তাহাদের সামঞ্জস্য বিধানই উন্নত রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। এই ক্রিয়াবৈচিত্র্য এবং ক্রিয়াবিভাগ আদিম ও সহজ রাষ্ট্রব্যবস্থায় কী করিয়া আশা করা যাইতে পারে? কাজেই বিশেষায়ণ (Specialisation) ও বিভাগায়ন (Differentiation) আদিম রাষ্ট্রে আরোপ করা অন্যায়। যৌথ সমবেত জীবনকে বিশৃঙ্খলা হইতে বাঁচাইয়া জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখিবার সরল ব্যবস্থাই আদিম রাষ্ট্রের মধ্যে রূপ পাইয়াছে। এঙ্গেল্‌সের সংজ্ঞাটি অবাস্তব। এই অবাস্তব সংজ্ঞার উপর দাঁড়াইয়া তিনি রাষ্ট্র খুঁজিয়াও আদিম ও প্রাচীন কালে কোথাও রাষ্ট্রের সন্ধান পান নাই। তাই গ্রীক-রোমেও ঐতিহাসিক যুগে যে সব রাজাদের কাহিনী সাহিত্যকে ভরিয়া রাখিয়াছে তাহাদের এঙ্গেল্‌স 'রাজা' বলিয়া স্বীকার করিতে চান না। গ্রীক সমরপতি বা 'Basileus'কে তিনি "রাজা" বলিবেন না, বলিবেন "রাজতন্ত্রের প্রথম সূচনা" ("First beginnings of a future for..........monarchy' (p 124.) রোমের রাজাদের (Rex) এঙ্গেল্‌স 'রাজা' বলিবেন না। বিখ্যাত ঐতিহাসিক মমসেন (Mommsen) হইতে আরম্ভ করিয়া সবাই জানে 'Rex' মানে রাজা। কিন্তু এঙ্গেল্‌স বলেন, এটা মোটেই মমসেন-কথিত স্বেচ্ছাচারী

রাজা নয়—"not at all the almost absolute king"। কুঠারকে কুঠার বলিতে এঙ্গেল্‌সের বাঁধে। রাজাকে রাজা বলিবেন না। কারণ তাহা হইলে থিওরী টিকেনা। এঙ্গেল্‌সের এই মনগড়া ব্যাখ্যা ও ভাষার মারপ্যাঁচে সত্যকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব স্বীকার করে নাই। তাই নৃতত্ত্ববিদ গোল্ডেনভাইজার আধুনিক সিদ্ধান্তকে এই বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—"রাষ্ট্রব্যবস্থাও সামাজিক জীবনের চাইতে কম প্রাচীন নয়; বুণ্ডট্, ওপেনহাইমার, টেগার্ট প্রভৃতি যত ইচ্ছা আধুনিক রাষ্ট্রের সেই সব বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দিন না কেন যেগুলির জন্য আধুনিক রাষ্ট্র আদিম রাষ্ট্রগুলি হইতে পৃথক ও বিভিন্ন।" *

যারাই অনড় ও অকাট্য স্তরপর্যায় কল্পনা করিয়া ইতিহাসের বিবর্তনকে ছকে বাঁধিতে চাহিয়াছেন তারাই পূর্বে রাষ্ট্রহীন স্তর একটা ধরিয়া লইয়াছেন, এই সব বিবর্তনবাদীদের কথা মনে করিয়া একদা ব্লুণ্ট্‌শ্‌লী বলিয়াছিলেন. "দার্শনিক জল্পনা চিরকালই একটা রাষ্ট্রহীন আদিম স্তর কল্পনা করিয়া সেই অবস্থা হইতে কী করিয়া মানুষ রাষ্ট্র সৃষ্টি করিল তাহা লইয়া প্রশ্ন তুলিতে ভালবাসে।" †

* "Political organisation must be regarded as no less ancient than social organisation, in the narrower sense. Writers such as Wundt, Oppenheimer, Teggart and others are, of course, at liberty to emphasise those aspects of the modern historic state which differentiate it from its primitive prototype." (Goldenweiser,—Recent Political Theories, p. 445.)

† "Philosophical speculation is fond of imagining a primitive condition in which men lived without government and then asking how from that condition mankind has arrived at the State." (p 283.)

বুণ্ডট্ প্রভৃতিরাও এই বিবর্তনী মোহে পড়িয়া আদিম ও আধুনিক রাষ্ট্রে পার্থক্য দেখিয়া ধরিয়া লইয়াছেন যে আদিম রাষ্ট্র 'রাষ্ট্রই' নয়। গোল্ডেনভাইজার বলেন, প্রত্যেকটি আদিম উপজাতিই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা-জনিত বৃহত্তর ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন। রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যই হইল এই ঐক্যবদ্ধ করিবার প্রবণতা—"integrating tendency of political organisation"। এক স্থানে বাস, একই সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, একই ভাষা এবং সর্বোপরি উপজাতীয় 'নাম' (Tribal name)—এই সব হইতে একটা ঐক্যবুদ্ধি বা অহংবোধ—যাকে গোল্ডেনভাইজার নাম দেন 'we-ness'—জাত হয়। এই 'আমরা'-'তাহারা'-চেতনা ; এই স্বাতন্ত্র্যবোধ, জাতিবোধ, শান্তিকালে চাপা থাকিলেও যুদ্ধ বা সংঘর্ষের সময়ে প্রখর হইয়া উঠে। এই বোধ হইতেই রাষ্ট্র-চেতনা—political sense—জমিয়া উঠে। এই চেতনা পাই অসভ্য জাতির মধ্যে এবং তাদের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার আভাস পাই তাদের উপজাতীয় নেতা বা chief-দের মধ্যে। হয় কর্তাপুরুষ (old man), নয় পুরোহিত বা যোদ্ধা, নয় যাদুকর—এরাই আদিম সমাজে নেতা এবং সার্বজনীন জীবনের হিতাহিতের নিয়ন্ত্রক। এই সব উপনেতাদের ক্ষমতা কোথাও বেশী কোথাও কম। কিন্তু সর্বত্রই তারা আদিম জীবনের কেন্দ্রশক্তি।

এস্কিমোদের, সালিশ (Salish) জাতির, হাইদা (Haida), ইরোকোয়া, এমন কি অষ্ট্রেলিয়ানী জাতিগুলির মধ্যেও উপনেতাদের প্রাধান্য রহিয়াছে। কোথাও কোথাও নেতৃত্ব বংশানুক্রমিক। ইরোকোয়াদের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা জটিল ও উন্নত। আফ্রিকার কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র বৃহৎরাজ্য ও বিপুল জনসংখ্যার উপরে কর্তৃত্ব করে। এখানে বংশানুক্রমিক ও স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র রহিয়াছে। এখানে, গোল্ডেনভাইজারের মতে যুদ্ধজয়, পররাজ্য আত্মসাৎকরণ, দাসপ্রথা ইত্যাদির মধ্য দিয়া শক্তিশালী সার্বভৌম রাষ্ট্র সৃষ্টি হইয়াছে। শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবও একটা কারণ।

রিভার্স ও উপজাতীয় সমাজে তিন রকম রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। রাজতন্ত্র, শাসন-পরিষদে ন্যস্ত ক্ষমতা (Vested in council), ও সম্ভ্রান্ত-শাসন। ‡ অনেক স্থানে—যথা সলোমন দ্বীপের এডিষ্টোন (Eddystone) দ্বীপে নেতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যুদ্ধে ও ধর্মে নেতৃত্ব। কিন্তু হাওয়াই দ্বীপ প্রভৃতি প্রশান্ত সাগর দ্বীপগুলিতে আবার আধুনিক রাষ্ট্রেরই মত রাজতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। ¶ আফ্রিকায়ও এই একই অবস্থা। জুলু ও পশ্চিম আফ্রিকার কতকগুলি জাতিতে নেতার ক্ষমতা সীমাহীন। * রিভার্স এবিষয়ে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অনেকস্থানেই নেতৃত্ব ধর্ম ইত্যাদি ব্যাপারেই প্রধান কিন্তু মেলানেশিয়া,

‡ 'In tribal societies we can discern, at first sight, three main varieties of government. One in which authority is vested in one or two persons, giving us the institution of chieftain-ship or kingship, single or dual ; ...a second, in which authority is vested in a council ; and a third, in which authority is in the hands of a few who may be either a body of hereditary nobility or may attain their position by age or wealth." (Social Organisation, p 160.)

¶ "....The institution of chieftainship having developed into a form of kingship not greatly different from that of our own society." (Rivers, p. 162.)

* as among the Tulus and in parts of W. Africa, the power of the chief is almost unlimited." (Rivers, p. 163)

পলিনেশিয়া এবং আফ্রিকা-আমেরিকার বহুস্থানে রাজতন্ত্রের দৈবী অধিকার ও ধর্মগত দিক, নেতাদের প্রাধান্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া ও মেলানেশিয়ায় বৃদ্ধদের বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়।† আদিমকালে রাজারা সব পুরোহিতও ছিলেন। এই সব পুরোহিত-রাজারা সমাজের কর্তা ছিলেন।‡ এ সম্বন্ধে বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ফ্রেজার (Frazer) বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনিও দেখাইয়াছেন যে আদিম কালে রাজতন্ত্র ছিল, তবে রাজতন্ত্রের সাথে সাথে পুরোহিততন্ত্রও জড়িত ও মিশ্রিত থাকিত। আধুনিক নৃতত্ত্ব সর্বত্র গবেষণা দ্বারা এঙ্গেল্‌সের পুরাণো থিওরিকে ভিত্তিহীন করিয়া তুলিয়াছে।

এই কারণে সব দিক বিবেচনা করিয়া গোল্ডেনভাইজার বলেন যে, সমাজ-জীবনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রিক জীবনও চিরকালই ছিল। রাষ্ট্র পরবর্তী কালের, একথা বলা চলে না। আদিম যুগ হইতেই রাষ্ট্র রহিয়াছে।§

---

† "The divine right of kings and the religious aspect of kingship .... form the essence of the chieftainship of such regions as Melanesia and Polynesia as well as of many parts of Africa and America." (Rivers, p. 165.)

‡ "The combination of priestly functions with royal authority is familiar to everyone." (Frazer—Golden Bough, p 9.)

§ "To Summarise :—political organisation and social organisation in the narrower sense, represent two polar aspects of social life. Both are omnipresent in human society." (Goldenweiser, p. 454.)

এই সব আলোচনা ও তথ্য দ্বারা ইহাই প্রমাণ হয় যে এঙ্গেল্‌সের মত ভুল। আদিম সমাজ রাষ্ট্র চেনে ও বোঝে। কোন-না-কোন রূপে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, রাষ্ট্র সকল জাতিতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। শুধু তাই নয়, আরো আদিকালে যদি যাই তবে একথা বলা চলে পরিবারেই প্রথম রাষ্ট্রের আভাস সৃষ্টি হইয়াছিল। পরিবারে কর্তার প্রাধান্য পরিবারের সামঞ্জস্য রক্ষা ও মঙ্গলবিধান করে। পরিবারই মানুষ জীবনের প্রথম সংঘরূপ। সংঘ-জীবনে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ সুরু হয় প্রথম এই পরিবার হইতেই। এই সংঘ-নিয়ন্ত্রণই এককালে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণে পরিণত হইয়াছে একথা অনেকেই মনে করেন। প্রফেসার ব্ল্যাকমার ও প্রফেসার গিলিনের মতে, এই সব কর্তাব্যক্তি (patriarch) হইতেই উপজাতীয় নেতার (chief) উদ্ভব হইয়াছে। এই সব নেতারাই সংঘ-জীবনকে পরিচালনা করেন।† নেতারাই ম্যাজিক, ধর্ম ইত্যাদি সহযোগে—কিংবা

† "In the establishment and maintenance of social order, the family frequently performed in a primitive way all the essential duties of the state. As the family multiplied in numbers through adoption and natural increase until it became a great tribe under the direction of the patriarch and chief, it became necessary to establish more elaborate methods of control ....In him (patriarch) we find one historical origin of political control." (Blackmar, and Gillin, p. 213.)

† "Direction of tribal affairs by a man of authority constitutes chieftainship." (Walis, Introduction to Anthropology p 354.)

সোজাসুজি—রাজা হইয়া দেখা দিয়াছেন। এঙ্গেল্স্ "উপনেতা" এবং "রাজা" এই দুটা শব্দে পার্থক্য করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কোন পার্থক্য নাই। এঙ্গেল্স্'র এই পার্থক্য-কল্পনা যে মনগড়া তাহা স্বীকার্য। প্রফেসর ওয়ালিসও বলেন, "উপনেতা" ও 'রাজার' মধ্যে কোন পার্থক্যই নাই, যারা পার্থক্য করেন তারা জবরদস্তি এই ভেদ কল্পনা করিয়া থাকেন।"‡ ফ্রেজার বলেন যে, যারা যাদুকর, প্রকৃতিকে মানুষের কাজে নিয়োজিত করিয়া যারা অসভ্যসমাজে শক্তিশালী ও সম্মানিত হইয়া ওঠেন তাহারাই প্রায়শঃ নেতা ও রাজা হইয়াছেন।‡

রাজতন্ত্রের উদ্ভবের মূলে কোথাও কোথাও ম্যাজিকের প্রভাব থাকিতে পারে। কিন্তু এই পদ্ধতিও সার্বজনীন স্তর বলিয়া স্বীকৃত হয় না। ফ্রেজারের মত সর্বগ্রাহ্য নয়। তাহা ছাড়া ফ্রেজার নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে একই পদ্ধতিতে রাজতন্ত্র সর্বত্র বিকশিত হইয়াছে ইহা বলা চলেনা।† আসলে রাজতন্ত্র বা রাষ্ট্র কিছুই কোন একই পদ্ধতিতে গড়িয়া ওঠে নাই। বহু কারণের সমাবেশের ফলেই রাষ্ট্র বিবর্তিত হইয়াছে।

‡ "There is no distinction, other than an arbitrary one, between a chief and a king." (Walis —Introduction to Anthropology, p 354.)

‡ "In point of fact magicians appear to have often developed into chiefs and kings." (Golden Bough, p. 83.)

† "I am far from affiirming that the course of development has everywhere rigidly followed these lines; it has doubtless varied greatly in different societies." (Frazer. p.106,)

গোল্ডেনভাইজারের ভাষায়, "রাষ্ট্র-বিকাশের প্রধান কারণগুলি এইরূপ; যুদ্ধ, বাসস্থানের প্রভাববৃদ্ধি, রাজ্যবিস্তার, সামাজিক শ্রেণীবৈচিত্র্যের বাহুল্য, সম্পত্তির উদ্ভব এবং আর্থিক বৈষম্য, মর্যাদা, পদবী ও অধিকারের বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার প্রথা, নেতার শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি এবং শাসন সম্প্রদায় বা আমলাতন্ত্রের উদ্ভব।"* কাজেই যুদ্ধ, ভূগোল, বংশ, অর্থনীতি, ব্যক্তিগত প্রতিভা প্রভৃতি বহু বিচিত্র শক্তির ক্রিয়াফলই রাষ্ট্রকে সৃষ্টি করিয়াছে। এই সব বহু কারণের সবগুলিই যে সর্বত্র একই ভাবে সক্রিয় হইয়াছে তাহা নয়। ইহাদের তারতম্য এবং ঘাতপ্রতিঘাত হইতেই বিভিন্ন প্রকার রাষ্ট্র বিভিন্ন দেশে উদ্ভূত হইয়াছে। আফ্রিকাতে যুদ্ধ, রাজ্যবিস্তার, শক্তিশালী নেতা ও বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার মিলিয়া কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের পত্তন করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ায় অন্যান্য কারণ না থাকায় কেবল ব্যক্তিগত নেতৃত্বই খুব শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। একই রীতিতে রাষ্ট্রবিকাশ সর্বত্র হয় নাই। এই প্রকার বিভিন্ন অবস্থা-সমাবেশহেতু, বিভিন্ন ধরণের রূপায়ন নানা স্থানে হইয়াছে। যারা বাঁধাধরা ভাবে গোষ্ঠী-সমাজ হইতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে বলেন, তাহাদের মত বিজ্ঞানসম্মত নয়। গোল্ডেনভাইজার এর প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, "আদিম সমাজে রাষ্ট্র-বিবর্তন ঘটিয়াছে গোষ্ঠীসমাজের ধ্বংসের ভিতর হইতে একথা কোন অর্থেই বলা চলে না।"*

* p. 454, ibid.

* "In no sense can it be said that political organisation in primitive society, emerges upon the ruins of kinship organisation. On the contrary, everywhere they coexist·······(p. 455.)

এঙ্গেল্‌স্‌ গ্রীসদেশ হইতেই পৃথিবীতে রাষ্ট্রের বা রাজতন্ত্রের প্রথম ৎপত্তি ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু গ্রীসদেশের পূর্বে মিশর দেশে এবং াহারও পূর্বে মহেঞ্জো-দারো বা ভারতে যে সুবিকশিত রাষ্ট্রতন্ত্র প্রচলিত ছল তাহার উপযুক্ত জ্ঞান এঙ্গেল্‌সের ছিল না। এঙ্গেল্‌সের মৃত্যুর পরে াষ্ট্রের ইতিহাস সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ব যে সব প্রাচীন রাষ্ট্রের সন্ধান খুঁজিয়া াইয়াছে তাহাতেও মার্ক্সীয় ছক ভাঙিয়া পড়ে।

মর্গানী-মার্ক্সবাদী ছক অচল হওয়ায় উক্ত ছকের রাষ্ট্রতত্ত্বও অচল হইয়াছে। াদিমকালে রাষ্ট্রহীন সমাজ ছিল এবং পশুপালন স্তরে ব্যক্তি-সম্পত্তি ইতেই রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিয়াছে, এই মার্ক্সীয় মতবাদ নবসমাজবিজ্ঞান ্রত্যাখ্যান করিয়াছে। লাউয়ী, গোল্ডেনভাইজার প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ এই র্গানী ও মার্ক্সবাদী রাষ্ট্রতত্ত্বের অযৌক্তিকতা দেখাইয়া বহু তথ্য সংগ্রহ ও বজ্ঞানিক বিচার সহকারে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাহাদের ালোচনায় প্রমাণ হইয়াছে যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি বহু কারণে ঘটিয়াছে। রাষ্ট্রের হুবাদী ব্যাখ্যাই (Pluralist Interpretation) বিজ্ঞানসম্মত। এই ্যাখ্যাকে অন্যভাষায় বলা চলে "চিদ্‌-ভৌতিক ব্যাখ্যা" বা Psycho-Materialist Interpretation. এই ব্যাখ্যায় রাষ্ট্র কেবল জড়শক্তি বা র্থশক্তিরই সৃষ্টি নয়; রাষ্ট্রোৎপত্তির মূলে আছে চিৎশক্তি এবং জড়শক্তি, ানসিক এবং ভৌতিক শক্তি উভয়েরই ক্রিয়া। এই ব্যাখ্যা অনুসারে রাষ্ট্র ানব-প্রকৃতির একটা নিশ্চিত প্রয়োজন হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। বাহ্য প্রকৃতির সহিত মানব-প্রকৃতির বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে রাষ্ট্র ইতিহাসে দেখা দিয়াছে। বর্বর যুগের কোন একখানে কেবল ব্যক্তিসম্পত্তিই রাষ্ট্রকে ৃষ্টি করে নাই। যতদিন মানুষ পৃথিবীতে আছে, ততদিনই কোন-না-কোন াকারে মানুষজীবনে রাষ্ট্র বিদ্যমান আছে। তবে এই রাষ্ট্রকে আধুনিক াষ্ট্র বলিয়া মনে করিলে যৌক্তিক ত্রুটি ঘটিবে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে

মার্ক্সীয় মতবাদ অবৈজ্ঞানিক, তাহা দেখান হইল। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধেও এই মতবাদ ভ্রান্ত তাহাও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। এখন সেই প্রসঙ্গ আলোচিত হইতেছে।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মার্ক্সীয় মতবাদ ভ্রান্ত হইলে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধেও এই মতবাদ ভ্রান্ত হইবে ইহা যুক্তিযুক্ত। মার্ক্সীয় মতে, রাষ্ট্র সৃষ্ট হইয়াছে নীচ উদ্দেশ্যে—ধনহীনদের শোষণ করিবার ও দাবাইয়া রাখিবার জন্য। রাষ্ট্র হইল একটা অত্যাচারের যন্ত্র, প্রবল ধনশালীদের স্বার্থসিদ্ধির একটা উপায় মাত্র।*

যুগে যুগে রাষ্ট্র বিত্তশালীদের ও প্রবল শ্রেণীর একটা "কার্যকরী সমিতি" রূপে সমাজে দেখা দিয়াছে। রাষ্ট্রের এই পরিচয়, মার্ক্সবাদী আর্থিক ব্যাখ্যার যৌক্তিক পরিণতি। রাষ্ট্র বিত্তবানদের বিত্তরক্ষার জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। কাজেই সম্পত্তিশালীদের হাতের যন্ত্র এবং আর্থিক শোষণের একটা উপায় রাষ্ট্র হইতে বাধ্য।

কিন্তু আর্থিক ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ। সম্পত্তির প্রভাব রাষ্ট্রের উপরে পড়িয়াছে চিরকাল। সম্পত্তিশালীদের সামাজিক প্রাধান্যের প্রভাবও রাষ্ট্রের উপরে পড়িয়াছে। একথা স্বীকার্য। কিন্তু নিছক সম্পত্তির থেকেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় নাই, ইহা পূর্বে দেখান হইয়াছে। রাষ্ট্র অর্থশক্তি ছাড়াও

---

* "Economically, ruling class, which by its means, becomes also the politically ruling class, and so acquires new means of holding down and exploiting the oppressed class." p. 218.

না কারণে উদ্ভূত হইয়াছে। কাজেই রাষ্ট্রের ক্রিয়া প্রভাব ও সার্থকতা বল আর্থিক শোষণের মধ্যেই প্রকট হইয়াছে, একথা বিজ্ঞানবিরোধী। পত্তির মূলে মনোজগতের, জৈবিক ক্ষেত্রের, ভৌগোলিক পরিস্থিতি প্রভৃতির না শক্তি রহিয়াছে। তেমনি বহুবাদী দৃষ্টিভংগীতে রাষ্ট্রের ক্রিয়া unction) ও সার্থকতাও বহুবিধ। মানুষজীবনের বহুবিধ প্রয়োজন ই সাধন করে। বহু শক্তির সৃষ্টি বলিয়াই রাষ্ট্রের ক্রিয়াকারিত্বও বিধ।

এরিষ্টটল্ বলিয়াছিলেন, 'মানুষ স্বভাবতঃই রাজনৈতিক জীব'।* ষ্ট্রের প্রয়োজন মানবজাতির স্বাভাবিক প্রয়োজন। মানুষের মধ্যেই আছে মানব একত্র বাস করিবার প্রবৃত্তি। সেই সঙ্গেই আছে পারস্পরিক পর্ক রক্ষা করিয়া সংঘজীবনে রাষ্ট্র স্থাপনের বৃত্তি।†

রাষ্ট্র মানুষেরই সৃষ্টি। মানুষজীবনের অন্যান্য দিকের সহিত রাষ্ট্রের সম্বন্ধ তাই বিড়। ধর্ম, পরিবার, সম্পত্তি, আত্মরক্ষা প্রভৃতি সকল বৃত্তি এবং প্রতিষ্ঠানের হত রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক রহিয়াছে। তাই ধর্ম কেবল সম্পত্তি রক্ষা করে, হা নয়। অন্যান্য সকল অধিকারকে যেমন রাষ্ট্র রক্ষা করিয়া থাকে ক্তি-সম্পত্তিকেও তেমনি রক্ষা করে রাষ্ট্র। কেবল তাই নয়। ধর্ম, রিবার, যৌনজীবন, ইত্যাদি সকল প্রকার সামাজিক অধিকারকেই রাষ্ট্র ক্ষা করে। রাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য সামাজিক দিকের এই পারস্পরিক সম্পর্ক (functional co-relation) সমাজ-জীবনের প্রধান সত্য। বল অর্থনীতির সহিত সম্পর্কটাকে বাড়াইয়া অতিরিক্ত গুরুত্বদান করিয়া র্ক্সবাদ আতিশয্য করিয়াছে। তবে এই পারস্পরিক সম্পর্কের কখনো

* "Man is by nature a political animal."

† "We find in human nature the tendency to and e need for, political existence." Blutschli, p. 23.

কখনো আতিশয্য ও বিকৃতি ঘটিতে পারে। পারস্পরিক সম্পর্কে সামঞ্জস্যটা নষ্ট হইয়া তাহাতে সমাজের ভারসাম্যও নষ্ট হইয়া যায়। আর্থিক ব্যবস্থা কখনো রাষ্ট্রকে গ্রাস করিতে পারে, তখন রাষ্ট্রের স্বাভাবিক ক্রিয়ার বিকৃতি ঘটে। কোন যুগধর্মও রাষ্ট্রকে অতিরিক্ত প্রভাব করিয়া ফেলিতে পারে, যেমন মধ্যযুগে হইয়াছিল। পুঁজিবাদীরা রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করিয়া যদি যন্ত্রের মত ব্যবহার করিতে পারে তবে তাহা একটা বিশেষ অবস্থার বিকৃতি। একটা বিশেষ আর্থিক ব্যবস্থার অতিরিক্ত প্রভাব রাষ্ট্রের উপরে পড়িয়া রাষ্ট্র যদি রাষ্ট্রধর্ম হইতে বিচ্যুত হয় তবে সেই বিকৃতিকে রাষ্ট্রের স্বরূপ বলা চলে না। মার্ক্সবাদ এই ত্রুটিই করিয়াছে। পুঁজিবাদের প্রভাব ও প্রাবল্য দেখিয়া এই মতবাদ পুঁজিবাদকেই রাষ্ট্রের জনয়িতা উৎপাদক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। প্রোফেসার কোল-ও (Cole) মার্ক্সবাদের এই ত্রুটি দেখাইয়াছেন। পুঁজিবাদীদের হুকুম রাষ্ট্রকে আজ তামিল করিতে হয়। তামিল করিতে রাষ্ট্রকে বাধ্য করা হয়। এখানে পুঁজিবাদী স্বার্থে রাষ্ট্রের প্রকৃতিকে বিকৃত করা হইয়াছে। ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদের সম্পর্কে একটা বিকৃতি ও আতিশয্য দেখা দিয়াছে। রাষ্ট্রের স্বাভাবিক বৃত্তি পুঁজিবাদী স্বার্থরক্ষা ও শোষণ নয়। মার্ক্সবাদের রাষ্ট্রতত্ত্বের সমালোচনায় কোল বলেন, 'পুঁজিবাদের আমলে যাহা ঘটে তাহা রাষ্ট্রের ক্রিয়া ও স্বধর্মের একটা বিকৃতি এবং এতে রাষ্ট্রকে সমগ্র জাতির রাষ্ট্রিক যন্ত্র হিসাবে না ব্যবহার করিয়া প্রবলতম আর্থিক শ্রেণীর এক আর্থিক-রাষ্ট্রিক যন্ত্র হিসাবে অপব্যবহার করা হয়।*

* "What occurs under Capitalism is a perversion of the free function of the state and its use, not a political instrument of the whole people but as secondary economicc-political instrument by the dominent economic class." (Cole, 148.)

এখানে মার্ক্সবাদী রাষ্ট্রতত্ত্বের সহিত বহুবাদী রাষ্ট্রতত্ত্বের পার্থক্য স্পষ্ট, মার্ক্সীয় ক্রুর অসঙ্গতিও স্পষ্ট। পুঁজিবাদ রাষ্ট্রকে দিয়া অনেক কিছু করাইয়া লইতে রে। তাহাতে রাষ্ট্রের কার্যকলাপ পুঁজিবাদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইল। কিন্তু রাষ্ট্রের পত্তি এবং রূপ ও প্রকৃতি পুঁজিবাদ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রমাণ ল না।

তাহা ছাড়া, আরো ত্রুটী আছে। রাষ্ট্র যদি বা প্রবলতর শ্রেণীর যন্ত্র নেকাংশে হইয়াও থাকে, তবু সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র পুঁজিবাদী যন্ত্র হইতে পারে ট। অন্যান্য কারণ ও অবস্থার প্রভাবে রাষ্ট্রের প্রকৃত স্বধর্মও কিছু সক্রিয় । পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্র কেবল অর্থনৈতিক শোষণ করে না। ন্যান্য কল্যাণকর সাধারণ বিষয়গুলিও রাষ্ট্র সমাধা করে। রাষ্ট্রের নিজস্ব ষ্ট্রিক সার্থকতাও অব্যাহত থাকে।* কোল মার্ক্সবাদের অনেকখানি স্বীকার য়াই একথা বলিতেছেন। আসল কথা হইল এই যে, রাষ্ট্রকে মার্ক্সবাদ কবারে ষোলো আনা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বানাইয়াছে, ইহার রাষ্ট্রিক স্বধর্ম চরিত্র মার্ক্সবাদ স্বীকারই করে না। এইখানে মার্ক্সবাদের আতিশয্য ং এই খান হইতেই মার্ক্সবাদী বিচার ও সিদ্ধান্তের ত্রুটি উৎপন্ন য়াছে।

মার্ক্সবাদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র নিছক শোষণযন্ত্র এবং সকল অকল্যাণের উৎস। র্ক্সবাদীর রাষ্ট্র সম্বন্ধে এই কল্পনাও ভ্রান্ত। রাষ্ট্র কখনো হয়তো

* "Secondly, although the state is in fact largely executive committee for administering the affairs of the pitalist class, it is not exclusively so. Perversion of nction is not curved so far as to obliterate all gns and traces of its real function." (Cole, 149.)

বা শোষণ বা অত্যাচারের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইতে রাষ্ট্রের চরিত্রই সমাজ শোষক ও ক্ষতিকর বলিয়া সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক রাষ্ট্রের একটা স্বধর্ম আছে। সামাজিক জীবনের জটিল সম্বন্ধ জালের মধ্যে রাষ্ট্রেরও একটা সার্থকতা ও স্থান রহিয়াছে। এই স্বধর্ম ও সার্থকতা ছাড়াইয়া যদি রাষ্ট্র অপরের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করে তবে সামাজিক সহসম্পর্কে ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং রাষ্ট্র ক্ষতির কারণ হয়। কিন্তু "রাষ্ট্র" প্রতিষ্ঠানটি অমঙ্গলজনক একথা বলা অসঙ্গত। সামাজিক জীবনের অন্য দশটা দিকের মধ্যে রাষ্ট্রও একটা। কাজেই রাষ্ট্রকে অতিরিক্ত ফাঁপাইয়া ও বাড়াইয়া ঈশ্বরের আসনে বসানো যেমন একটা বিকৃতি, তেমনি রাষ্ট্রকে খর্ব করিয়া বিনষ্টির পথে পাঠাইলে তাহাও ততোধিক বিকৃতি। মার্ক্সবাদ রাষ্ট্রকে অবিমিশ্র অমঙ্গল বলিয়া ইহার বিলুপ্তিই কল্যাণকর মনে করে। নৈরাজ্যবাদের (Anarchism) সহিত পরিণামে একই সিদ্ধান্তে মার্ক্সবাদ উপনীত হইয়াছে। তবে মার্ক্সবাদ রাষ্ট্রের ক্রমবিলুপ্তির কথা বলেন, সাম্প্রতিক অবস্থায় রাষ্ট্রের ধ্বংস চায় না। নৈরাজ্যবাদ অবিলম্বে রাষ্ট্রের ত্বরিত বিলোপ চায়। কিন্তু মূলতঃ এই দুই মতবাদই রাষ্ট্রকে অমঙ্গল (evil) বলিয়া মনে করে। রাষ্ট্র সকল স্তরের সকলের সাধারণ কল্যাণের জন্য ব্যবস্থা করে। সমষ্টির, তথা ব্যষ্টির রক্ষা ও পোষণই হইল রাষ্ট্রের লক্ষ্য। সমাজে বিভিন্ন রকমের শ্রেণী, বিভিন্ন রকমের বিভাগ ও স্বার্থ রহিয়াছে। আদিম কালে ছিল। আদিম কালে যে কেবল বুভুক্ষাই একমাত্র বৃত্তি ছিল তাহা নয়

---

* "The state is the political organisation of the individuals of a community for the common good ·········Its purpose is the protection & preservation of the group and incidentally, of the individuals" (Blackmar & Gillin, p, 210.)

বিচিত্র রুচি ও বিভিন্ন প্রয়োজন চিরকালই আছে। এই সঙ্গে বিভিন্ন স্বার্থের ও শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ ও স্বার্থবিরোধ আছে। কিন্তু এত বিভিন্নতা ও স্বার্থবিরোধ থাকিলেও সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি বিষয়ে স্বার্থসাম্য এবং সাদৃশ্যও ছিল। কতকগুলি সুখদুঃখ-স্বার্থ সকল শ্রেণীর সকল মানুষেরই মধ্যে সমানভাবে আছে। বহিঃশত্রুর আক্রমণে আত্মরক্ষার স্বার্থ এক দেশবাসী সকল শ্রেণীরই সমানভাবে রহিয়াছে। তেমনি জীবনযাপনের প্রাথমিক ব্যবস্থায় ঐক্য ও শৃংখলা স্থাপনও সকলেরই স্বার্থ। এই সব সমস্বার্থকে রক্ষা করাই রাষ্ট্রের কাজ।

এইখানে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। রাষ্ট্রের কাজ সাধারণের মঙ্গলের জন্যই বা কতদূর বিস্তৃত হইবে তাহা লইয়া মতভেদ। একপ্রান্তে আছে নৈরাজ্যবাদী রাষ্ট্রবিলুপ্তির দাবি, ক্রোপট্‌কিন প্রমুখদের রাষ্ট্রবিদ্বেষ। মার্ক্সবাদও এই পর্য্যায়ে। গান্ধীবাদও পূর্বে এই পর্য্যায়ে ছিল, কারণ গান্ধীজীও রাষ্ট্র-প্রাধান্য বিলুপ্ত করিতে চান। (সম্প্রতি গান্ধীবাদে কিছু-পরিবর্তন দেখা যাইতেছে।) অন্যপ্রান্তে রহিয়াছে সমষ্টিবাদীদের রাষ্ট্র-পূজা, রাষ্ট্রের বেদিতে ব্যক্তিকে বলি দিতে যারা দ্বিধা করেন না। মাঝামাঝি রহিয়াছে স্পেন্সার, নোভিকাউ, লা বো (Le Bon), সুমনার (Sumner) প্রভৃতির মত। এরা রাষ্ট্রের কাজ কেবল ধনপ্রাণরক্ষা এবং বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ, এই দুটীতেই সীমাবদ্ধ রাখিতে চান। এদের মতে রাষ্ট্র হইল সমাজের পুলিশম্যান। বর্তমান যুগেও হবহাউস্, ওয়ার্ড (Ward), গিডিংস্ (Giddings), ষ্টাইন্ (Luwding Stein), কোল, (Cole), লাস্কি (Lasky), ডুরখীম্ (Durkheim) প্রভৃতি পণ্ডিতেরা রাষ্ট্রকে অমঙ্গল মনে করেন না। তাহারা রাষ্ট্রকে জনমঙ্গলের বাহন ও যন্ত্র বলিয়া মনে করেন। প্রফেসর গিডিংস্ রাষ্ট্রকে বলেন, "মানবমনের

সব চাইতে শক্তিশালী সৃজন এবং মানবলক্ষ্যের মহত্তম প্রকাশ"।* ওয়ার্ড বলেন, "...রাষ্ট্রের একটিমাত্র উদ্দেশ্য এবং সার্থকতা, সেটি হইল গোটা সমাজের কল্যাণ, ব্যক্তিকে সমাজবিরোধী কাজ থেকে বিরত রাখা হইল ইহার কর্মপদ্ধতি। রাষ্ট্র স্বয়ং সমাজহানিকর যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ রাষ্ট্র মানুষের কর্মের স্বাধীনতাকে বৃদ্ধি করে।...রাষ্ট্রের জন্যই ইতিহাসে সকল অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে। এবং রাষ্ট্রের জন্যই সমস্ত সামাজিক, শিল্পিক, সাহিত্যিক, ও বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা সম্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা চলে এমন কোন প্রতিষ্ঠানই সমাজে নাই, এবং এই কারণে মানুষের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাষ্ট্রই সব চাইতে গুরুত্বশীল।"*

* "The mightiest creation of the human mind, the noblest expression of human progress." (The Responsible State, Giddings p 48.)

* "We thus see that the state········has but one purpose, function, or mission, that of securing the welfare of society; that its mode of operation is that of preventing the anti-social action of individuals; that in doing this it increases the freedom of human action so long as it is not anti-social;··········it has always been the condition to all achievement, making possible all the social, industrial, artistic, literary and scientific activities that go on within the state and under its protection. 'There is no other institution with which the state may be compared, and yet in view of all this, it is the most important of all human institutions." (Ward, Pure Sociology, p 555.)

হবহাউস্‌-ও রাষ্ট্রের সামাজিক সার্থকতা সম্বন্ধে ইহাদের সহিত একমত। লাস্কি এবং কোলও রাষ্ট্রের সার্থকতা স্বীকার করেন। ইহাদের মতে, রাষ্ট্র সমাজের একটী অন্যতম প্রতিষ্ঠান এবং সকল শ্রেণীর সাধারণ সমষ্টি জীবনের সাধারণ প্রয়োজনগুলি লইয়াই ইহার ক্ষেত্র ও রাজ্য। রাষ্ট্র স্বেচ্ছাচারী ও সর্বগ্রাসী হইয়া উঠিয়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উপরে জুলুম করিলে তাহার বিকৃতি হইয়াছে বলিতে হইবে। তাহা না হইলে রাষ্ট্র সমাজে একান্ত প্রয়োজনীয় সার্থক প্রতিষ্ঠান। ব্লুণ্টশ্‌লী-ও বলেন যে রাষ্ট্র মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তির পরিণতি। রাষ্ট্রকে **যাহারা অনিবার্য অমঙ্গল বলিয়া মনে করেন তাহাদের ভুল।***

রাষ্ট্রের প্রয়োজন ও সার্থকতা সম্বন্ধে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে মতভেদ নাই। রাষ্ট্রের ক্ষেত্র ও সীমা কোথায় তাহা লইয়া মতভেদ থাকিলেও অধিকাংশ বিজ্ঞানীই রাষ্ট্রকে সাধারণ কল্যাণের বাহক বলিয়া মনে করেন। প্রত্যেক মানবীয় প্রতিষ্ঠানেরই ভাল-মন্দ দুই দিক আছে। রাষ্ট্রের সহিত ধর্মের, রাষ্ট্রের সহিত অর্থনীতির, রাষ্ট্রের সহিত পরিবারের, সম্পর্ক সর্বদাই মাত্রা রাখিয়া চলে না। নানা কারণের বিচিত্র সমাবেশ হেতু এই মাত্রা ও সামঞ্জস্যের ব্যতিক্রম হয়। এই ব্যতিক্রম ও বিকৃতি থেকে সমাজের সমষ্টিজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ক্ষতির জন্য রাষ্ট্রকে দায়ী করা ঠিক নয়। রাষ্ট্রের অপব্যবহার ও বিকৃতি ঘটে বলিয়া রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানকেই ধ্বংস করা যুক্তিযুক্ত নয়।

এই কারণে মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যায়ও আংশিক সত্য আছে। রাষ্ট্র অত্যাচারের যন্ত্র হইয়াও দাঁড়াইয়াছে কখনো কখনো। প্রবলের হাতের যন্ত্র

---

* "The state is thus not an arrangement only for the purpose of taming evil passions. It is not a necessary evil, but a necessary good." (Bluntschli. 302)

হইয়া রাষ্ট্র সমাজে জনগণের লাঞ্ছনার কারণও হইয়াছে। একথা ঠিক। কিন্তু তাই বলিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের জন্মই অত্যাচারের জন্য এবং ইহার একমাত্র সার্থকতাই শোষণ করা, একথা একদেশদর্শিতার পরিচয়। রাষ্ট্রের এই একচোখো ব্যাখ্যা যে বিজ্ঞানীরা বর্জন করিয়াছেন তাহা এই আলোচনায় প্রমাণিত হইয়াছে। রাষ্ট্রের নানা বিকৃতি সত্ত্বেও সমাজের ইতিহাসে রাষ্ট্র বহু মঙ্গলকে সৃষ্টি করিয়াছে। রাষ্ট্র না সৃষ্ট হইলে মানবজীবনে কোনো সৃষ্টি, কোন বিকাশই সম্ভব হইত না। এই দিক থেকে মার্ক্সবাদী সংজ্ঞা এবং বর্ণনা ভ্রান্ত ও একপেশে।

রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ

এইবার রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। মার্ক্সবাদী মতে রাষ্ট্র সম্পত্তি-প্রথা থেকে উদ্ভূত হইয়াছে, কাজেই ব্যক্তিসম্পত্তি লুপ্ত হইলে সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রেরও বিলুপ্তি অনিবার্য।* রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যা হইতে যুক্তিসংগত ভাবেই রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ বিলুপ্তি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যাখ্যা স্বীকার না করিলে, রাষ্ট্রের বিলুপ্তিও স্বীকার করার কথা আসে না। সম্পত্তি-প্রথার সহিত রাষ্ট্রের এই কার্যকারণ সম্পর্ক, পূর্বেই দেখান হইয়াছে, আধুনিক সমাজবিজ্ঞান স্বীকার করে না। আর্থিক নিয়ন্ত্রণ-বাদ বা Economic determinism আজ প্রত্যাখ্যাত এবং মানবজীবনের ক্ষেত্রে ও সমাজ-ব্যবস্থায় জড়জগতের যান্ত্রিক কার্যকারণের অমোঘ ও অনড় বন্ধন আজ অস্বীকৃত। কাজেই সম্পত্তি-প্রথার সহিত রাষ্ট্রের এই বন্ধন বিজ্ঞান বর্জন করিয়াছে। অর্থনীতি সমাজ-জীবনের বহু

* "The state inevitably falls with them (classes)." Engels, 221.)

নীতির অন্যতম মাত্র। রাষ্ট্রের উপর ইহার প্রভাব স্বীকার করিয়াও বলিতে হয় যে অর্থনীতির প্রভাব ব্যতীত অন্যান্য আরও বহু প্রভাব রাষ্ট্রকে রূপ দান করিতেছে। এক্ষেত্রে কেবল অর্থনীতির একমাত্র নিয়ন্ত্রক করিয়া দাঁড় করানো যুক্তিবিরুদ্ধ একেদেশদর্শিতা। তাই রাষ্ট্রকে পশুপালকপর, কৃষিতন্ত্রী (agricultural), সামন্তিক (Feudal), শিল্পিক বা পুঁজিবাদী, ইত্যাদি সংজ্ঞা দান করিলেই সম্পূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া হইল না। রাষ্ট্রের একদিক মাত্র এই সব বিশেষণে সূচিত হয়। অর্থনীতি কখনো খুব বেশী প্রবল হইয়া উঠিতে পারে। এই আতিশয্য ক্ষতিকর।* মার্ক্সবাদ এই আতিশয্যকে সম্মুখে রাখিয়া তাহাকে স্বাভাবিক মনে করিয়া সমাজ-বিবর্তন কল্পনা করিয়াছে। তাই নবসমাজ-বিজ্ঞানে মার্ক্সবাদী রাষ্ট্রতত্ত্বের আর্থিক ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য হইয়াছে। আর্থিক ব্যাখ্যা, যদি অগ্রাহ্য হয়, ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়, তবে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি সম্বন্ধে মার্ক্সবাদী মতও অগ্রাহ্য ও ভ্রান্ত প্রমাণ হয়। অর্থাৎ সম্পত্তি হইতে রাষ্ট্রের জন্ম। এই মতবাদ ভ্রান্ত বলিয়া সম্পত্তি লুপ্ত হইলে রাষ্ট্রও লুপ্ত হইবে এই সিদ্ধান্তও ভ্রান্ত। মার্ক্সবাদী মতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে, রাষ্ট্র লুপ্ত হইবে। রাষ্ট্র শ্রেণী-সংঘর্ষ হইতে উদ্ভূত, প্রবল ধনী শ্রেণীর স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সৃষ্ট; এই জন্য শ্রেণীহীন সমাজে রাষ্ট্র থাকা অসম্ভব। এখানে রাষ্ট্র থাকা না থাকা, উচিত বা অনুচিত প্রশ্ন নয়। রাষ্ট্র থাকিতেই পারে না।

মার্ক্সবাদের এই রাষ্ট্রতত্ত্বে দুইটি মতবাদ জড়িত আছে। প্রথমতঃ আর্থিক নিয়ন্ত্রণবাদ; দ্বিতীয়তঃ যান্ত্রিক কার্য্যকারণবাদ। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ও তথ্যসংগ্রহে দেখা গিয়াছে যে রাষ্ট্রের সহিত অর্থনীতির এই

* "An exclusive or undue devotion to them leads to the neglect of the other functions of the state and damages all other interests." (Blunstschli, p. 323.)

দ্বিমুখী বন্ধন প্রমাণ হয় না। গিন্সবার্গ, হুইলর (Wheeler) ও হবহাউস যে গবেষণা করিয়াছেন, তাহাতে ("নিম্নতর জাতি" বা "Simpler Peoples" পুস্তকে) এই বন্ধন খণ্ডিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া সোরোকিন (Sorokin), গোল্ডেনভাইজার, লাউয়ী প্রমুখ বিজ্ঞানীরাও এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। সম্পত্তিপ্রথা লুপ্ত হইলেও রাষ্ট্র লুপ্ত হওয়ার কারণ নাই। কারণ সম্পত্তি হইতেই রাষ্ট্রের জন্ম হয় নাই। বাস্তব ইতিহাসের সাক্ষ্যেও আমাদের এই মতকে প্রমাণ করে। বাস্তব তথ্য মার্ক্সবাদকে খণ্ডন করিয়াছে। পৃথিবীতে একমাত্র রুশ দেশে ব্যক্তি-সম্পত্তি উচ্ছেদ হইয়াছে। কার্যতঃ সেখানে ব্যক্তি-সম্পত্তি নাই, শ্রেণী নাই, শ্রেণীশোষণ নাই। মার্ক্সবাদ অনুসারে এখানে রাষ্ট্র ক্রমে ক্রমে বিলুপ্তির দিকে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রাশ্যায় আজ রাষ্ট্রের ক্রমবিলুপ্তির কোন সম্ভাবনাই নাই। সুদূর ভবিষ্যতেও নাই। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে রাষ্ট্র ব্যক্তিসম্পত্তি হইতেই উদ্ভব হয় নাই। তাই সম্পত্তি লোপ হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্র-বিলুপ্তি ঘটে নাই। রাশ্যায়ই প্রমাণিত হইয়াছে যে মার্ক্সবাদী রাষ্ট্রতত্ত্ব ভুল। রাষ্ট্র যে অর্থনীতির সৃষ্টি নয়, তাহা হাতে-কলমে প্রমাণ হইয়াছে। এঙ্গেলসও ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন, শ্রেণীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের পতনও অবশ্যম্ভাবী। শ্রেণীলোপও অনিবার্য, তাই রাষ্ট্র-লুপ্তিও অনিবার্য। *

এঙ্গেলসের এই ভবিষ্যদ্বাণী রাশ্যায়ই ভাঙিয়া পড়িয়াছে। মার্ক্সবাদী হয়ত বলিবেন যে, এখনো অন্তর্বর্তী (Transition) অবস্থা চলিয়াছে; একদা ভবিষ্যতে রাষ্ট্র লুপ্ত হইবে এবং উৎপাদন সংঘ ('Association of

* "They (classes) will fall as inevitably as they once arose. The state inevitably falls with them." (Engels, 221.)

producers') রাষ্ট্রের স্থান দখল করিয়া সমাজ-ব্যবস্থাকে চালাইবে। অজ্ঞাত ভবিষ্যতের কথা উঠাইয়া লাভ নাই। বাস্তব বিচারে সুদূর ভবিষ্যতে এই কাল্পনিক অবস্থার উদ্ভবের কোনই লক্ষণ দেখা যায় না। জল্পনার আশ্রয় লইয়া বিজ্ঞান ও বাস্তবকে এড়ান সম্ভব নয়।

বহুবাদী রাষ্ট্রব্যাখ্যাই বিজ্ঞানসম্মত। রাষ্ট্রের উৎপত্তির কোন একটি মাত্র কারণে হয় নাই। রাষ্ট্রের সামাজিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রও শুধু একটি মাত্র নয়। রাষ্ট্রের দুইমুখী ক্রিয়াকারিত্ব। প্রথম, সমাজের সকল শক্তির পোষণ ও রক্ষা। দ্বিতীয়, সামাজিক শক্তিগুলির বিকাশসাধন। †

এই দ্বিবিধ ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করিলেই পাইব বহুমুখী ক্রিয়া। জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের সম্ভাবনাকে মুক্তি দেয় রাষ্ট্র। বিকাশের পথকে সহজ করে বিকাশকে সম্ভব করে। রাষ্ট্র সহায়ক এবং নিমিত্ত। কাজেই কোন একদিকের ক্রিয়া খর্ব কিংবা লুপ্ত হইলেও রাষ্ট্রের লুপ্ত হইবার কারণ ঘটে না। বহু সম্বন্ধের মধ্যে একটি সম্বন্ধ ব্যাহত হইলে সর্বাঙ্গীন জীবনের সামঞ্জস্যে ব্যাঘাত বা চাঞ্চল্য ঘটে। কিন্তু সর্বাঙ্গীন জীবন লুপ্ত হয় না। সম্পত্তি-প্রথাও জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। সম্পত্তি লুপ্ত হইলে নিশ্চয় তাহার প্রভাব গোটা সমাজ-জীবনে পড়িবে। কিন্তু সে প্রভাবের অর্থ গোটা সমাজ-জীবনের বিলুপ্তি বা রাষ্ট্র বা পরিবারের বিনষ্টি নহে। পূর্বোল্লিখিত ওয়ার্ড, হবহাউস, কোল, সোরোকিন, লাউয়ী, গোল্ডেনভাইজার, ম্যালিনাভস্কী, ওয়েষ্টারমার্ক, গিন্সবার্গ, টয়েনবী প্রমুখ আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ববিদগণ কেহই রাষ্ট্রের

---

† "Thus the state has a double function. Firstly, the maintenance of the national powers; and secondly, their development." (Bluntschli, p. 321.)

বিলুপ্তিবাদ স্বীকার করেন না। কারণ তাঁহারা রাষ্ট্রের বহুমুখী সার্থকতা স্বীকার করেন এবং তাই বহুবাদী ব্যাখ্যাও স্বীকার করেন।

তারপরে মার্ক্সবাদ ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্বন্ধকেও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছে। এই মতে রাষ্ট্রের প্রয়োজন কেবল ব্যক্তিকে ও শ্রেণীকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য। পুলিস, সৈন্য, বিচারালয় এই সব রাষ্ট্রের প্রতীক। এগুলি সবই ব্যক্তিসম্পত্তি ও শ্রেণীকে রক্ষা করার জন্য আছে। কাজেই ভবিষ্যৎ সমাজে পুলিস ইত্যাদি সহ রাষ্ট্র লুপ্ত হইবে। মানুষ এই মতে পারিপার্শ্বিকের সৃষ্টি। কাজেই ব্যক্তিসম্পত্তি উচ্ছেদ হইলে আর্থিক পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলাইয়া যাইবে। তাহার ফলে মানুষও বদলাইবে। অর্থাৎ মানুষের মনে লোভ, ঈর্ষা, স্বার্থপরতা থাকিবে না। মানুষ সামাজিক ধর্ম সততার সহিত পালন করিবে। প্রত্যেক মানুষের ন্যায্য শ্রমফল ও দরকারী জীবিকাদ্রব্য সুলভ হইবে। ফলে নূতন মানুষ চুরি করিবে না, ফাঁকি দিবে না। সমাজধর্মের তাকিদেই সামাজিক কর্তব্য করিবে। এক কথায় মানুষের মনোধর্ম ও মনোবৃত্তিই রূপান্তরিত হইবে।

এই মার্ক্সবাদী সমাজতত্ত্বের মূল রহিয়াছে পরিবেশ-বাদ ও নিয়ন্ত্রণ-বাদ। পরিবেশবাদীর মতে, মানুষ পরিবেশের পুতুল। পরিবেশ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এখানে বক্তব্য এই যে এই পরিবেশবাদ (ও নিয়ন্ত্রণবাদ) সমাজবিজ্ঞান প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। মনোধর্ম কেবলি পরিবেশের সৃষ্টি নয়। বিজ্ঞানের বহুবাদী দৃষ্টিভংগী মানুষের মনোবিবর্তনের বহুবাদী ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। বহু শক্তির ও কারণের সমবেত ঘাতপ্রতিঘাতে মনোবৃত্তিগুলি বা মানুষের অধিমানস গড়িয়া ওঠে। জৈবিক ও মানসিক কারণও রহিয়াছে। কেবল বহির্জগতের বাহ্য পরিবেশই (external environment) সবটুকু নয়। আধুনিক আচরণবাদ (behaviourism) মানুষের সকল আবরণকেই বাহ্য পরিবেশের সৃষ্টি বলে। মার্ক্সবাদ যদিও

আচরণবাদ (ওয়াটসন-প্রবর্তিত) সম্পূর্ণ গ্রহণ করেনা বলিয়া বলে তবুও মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্বের আর্থিক নিয়ন্ত্রণবাদ (economic determinism) আচরণবাদেরই রকমফের হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষের মন নূতন সমাজতন্ত্রী সমাজে একমাত্র সম্পত্তিবর্জিত বলিয়াই কি সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইবে ? মার্ক্সবাদ তাই বলে।

কিন্তু এই পরিবেশবাদ অন্যকার সমাজবিজ্ঞান গ্রহণ করে নাই। পরিবেশ যতই কেন সুন্দর হোক, ন্যায়-সঙ্গত হোক, মানুষের মনস্তত্ত্বে সমাজ-বিরোধী (anti-social) উপাদান থাকিয়াই যাইবে এবং সমাজেও অসামাজিক, বেয়াড়া ধরণের ব্যক্তি থাকিবে। মানুষ যতই সুন্দর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবেশের প্রভাবে থাকুক না কেন, পরিবেশ-বিরোধী বৃত্তিও মানুষের মধ্যে থাকিবে। এই সব সমাজ-বিরুদ্ধ ব্যক্তিদের উপর বল প্রয়োগের প্রয়োজনও থাকিয়া যাইবে। কেবল অর্থনীতিক কারণে ও সম্পত্তিবোধ হইতেই অপরাধপ্রবণতা সৃষ্টি হয় ও সামাজিক অপরাধ ঘটে, অপরাধ-বিজ্ঞানও আজিকাল একথা স্বীকার করে না। আধুনিক প্রজননবিদ্যাও (genetics) মানবচরিত্রের ষোলআনা নিয়ন্ত্রণের কথা স্বীকার করে না। সমাজ-পরিবেশের পরিবর্তন দ্বারা নিশ্চয়ই ব্যক্তি-মন ও ব্যক্তিকার্যকে খানিকটা প্রভাবিত করা চলে। কিন্তু ষোলআনা প্রভাবিত করা চলে না। একথা বিজ্ঞানই বলে। কাজেই একদা বল-প্রয়োগের প্রয়োজন ফুরাইবে, শ্রেণীহীন সমাজে দাবাইয়া রাখিবার প্রয়োজন (coercion) থাকিবে না, এই মার্ক্সবাদী মতবাদ কাল্পনিক ও মনস্তত্ত্বের ও সমাজতত্ত্বের বিরোধী। সমাজের একটা অংশ, কিছু ব্যক্তি থাকিবে যাদের শাসনের প্রয়োজন থাকিবে—এই কারণেও রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকিবে এবং রাষ্ট্রও বিদ্যমান থাকিবে। এদিক হইতেও মার্ক্সবাদ ভ্রান্ত।

তারপরে রাষ্ট্রের মূলে কেবল বলপ্রয়োগ (force) বা শাসনই এক মাত্র শক্তি নয়। সমাজে বহু শ্রেণীভাগ থাকিবেই—সম্পত্তিকে কেন্দ্র করিয়া না হইলেও অন্যান্য বৃত্তিকে কেন্দ্র করিয়া থাকিবে। স্বার্থবোধ নানা বৃত্তির মারফৎ কার্যকরী হইবে। বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষাও রাষ্ট্রের একটি কাজ। তাছাড়া সমাজমঙ্গলের নানা ব্যবস্থারও রাষ্ট্র দায়িত্ব নিতে পারিবে। বহুবিধ ক্রিয়ার মধ্য দিয়া রাষ্ট্রের সার্থকতা সমাজতন্ত্রী সমাজেও বজায় থাকিবে বহুবাদী ব্যাখ্যা তাই বলে।

কিন্তু তাই বলিয়া রাষ্ট্রের রূপ বদল হইবে না তাহা নয়। বিভিন্ন দিকের পরিবর্তনের—তথা সম্পত্তিপ্রথার উচ্ছেদের—প্রভাবে রাষ্ট্রেরও রূপান্তর হইবে নূতন সমাজে—কিন্তু ধ্বংস বা বিলুপ্তি নয়। সমাজতন্ত্রের অর্থ গণতন্ত্র, আর্থিক গণতন্ত্র। সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রও অন্যকার ভুয়া গণতন্ত্রকে অতিক্রম করিয়া সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবে, বহুবাদী চিদ্-ভৌতিক ব্যাখ্যার বৈজ্ঞানিক নির্দেশই এই। রাষ্ট্রের বিলুপ্তি নয়, রূপান্তর —এই হইল নব-সমাজবিজ্ঞানের কথা। রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও মার্ক্সবাদী সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত ও একপেশে।

সপ্তম অধ্যায়

মার্ক্সবাদী ধর্মতত্ত্বের সমালোচনা

ধর্মের উৎপত্তি

(ক) মার্ক্সবাদের ভিত্তি জড়বাদ, জড়াতীত কোন সত্তা স্বীকার ইহা করে না। কাজেই 'ধর্ম' বলিতে যাহা বুঝি তাহার স্থান মার্ক্সবাদী ভবিষ্যৎ সমাজে নাই, কারণ ধর্ম এই মতে, মিথ্যা কল্পনা এবং ভ্রান্ত বুদ্ধির সৃষ্টি। ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা অনুসারে ধর্ম জড় পরিবেশেরই সৃষ্টি। জড়পরিবেশ বলিতে প্রথম আদিযুগে প্রাকৃতিক পরিবেশই প্রধানতঃ ইহারা বুঝাইতে চান। সঙ্গে আর্থিক পরিবেশও আছে। ক্রমে আর্থিক পরিবেশই প্রবল হইয়া ধর্মের রূপ কেবল আর্থিক ব্যবস্থার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতে আরম্ভ করিল। কোনো চৈতন্য শক্তিই বিশ্বজগতের পিছনে নাই, কাজেই চিৎশক্তির সহিত মানুষের সম্বন্ধ স্থাপন বা ধর্মের কোন বাস্তব ভিত্তিই নাই। এঙ্গেল্‌স্ বলেন, "যে সব বাহ্যশক্তি মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহারই আজগুবি প্রতিচ্ছায়া মানুষের মনের উপরে পতিত হয়; এই ছায়াই ধর্ম এবং এর মধ্যে পার্থিব পরিবেশ বা শক্তিগুলি দৈবিক শক্তির রূপ লইয়া দেখা দেয়।"*

---

* "All religion, however, is nothing but the fantastic reflection in men's minds of those external forces which control their daily life, reflection in which the terrestial forces assume the form of supernatural forces." (Anti-Duehring p. 300.)

আদিকালে গোষ্ঠীসমাজ (Gentile) ছিল সমাজের রূপ। ‹ সমাজে অর্থব্যবস্থা অতি নিম্নস্তরের ছিল। তাই প্রকৃতির বিরাট দুর্বোধ্যতা সম্মুখে এই কালের মানুষ আত্মবিহ্বল দাসত্বের মনোভাব লইয় দাঁড়াইত। এবং এই প্রকৃতির দাসত্বের প্রতিফলন পাই তাহার ধর্মসম্বন্ধে শিশুসুলভ ধারণাগুলির মধ্যে * একদিকে প্রকৃতি, অন্যদিকে গোষ্ঠি উপজাতি ও তাহার অর্থব্যবস্থা, এই সবের দুর্বোধ্যতা থেকে আত্মবিহ্বল এবং তার থেকে ধর্মভাব উৎপন্ন হইয়াছে। "আধুনিক বুর্জোয়া সমাজে মানুষ এমন ভাবে তার নিজের সৃষ্ট আর্থিক পরিবেশের দ্বারা উৎপাদান-যন্ত্র দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়, যেন আর্থিক পরিবেশ একটা বাহিরে শক্তি।"† অর্থনৈতিক পরিবেশ বা উৎপাদন-ব্যবস্থা একটা বহিঃশক্তির ম মানুষকে প্রভাব করে। এই বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণে মানুষ আত্মবিস্মৃত অভিভূত হইয়া পড়ে এবং এই ভয়মিশ্রিত আত্মবিস্মৃতি ও আত্মসমর্পণ হইতে ধর্মভাব সৃষ্টি হইয়াছে। আর্থিক ব্যবস্থাকে সমাজতন্ত্রী মানুষ যখন আয়ে

* "The gentile constitution..........presupposed a extremely undeveloped state of production,......... man's attitude to nature was therefore one of almos complete subjection to a strange incomprehensib power, as is reflected in his childish religious concep tions." (Origin of Family p. 119.)

† "in existing bourgeois society, men are dom nated by the economic conditions created by them selves, by the means of production which they them selves have produced, as if by an extraneou force."

আনিয়া সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় চালাইবে তখনই ভয়মুক্ত মানুষ ধর্মভাব হইতেও মুক্ত হইবে। ইহাই ধর্মের জড়বাদী ও আর্থিক ব্যাখ্যা।

এ-সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য এই যে আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান ইতিহাসের জড়বাদী বা আর্থিক ব্যাখ্যাকে বর্জন করিয়াছে।

সুতরাং ধর্মতত্ত্বেরও এই জড়বাদী ব্যাখ্যা বর্জিত। জড়বাদ আজ বিজ্ঞান কর্তৃক পরিত্যক্ত। তাই জড়বাদ যাহার ভিত্তি সেই মতবাদ সমাজ-ব্যাখ্যায় বা জীবন-ব্যাখ্যায় গ্রহীতব্য হইতে পারে না। বহুবাদী ব্যাখ্যার দৃষ্টিভংগী হইতে পণ্ডিতেরা বলেন, ধর্মেরও মূলে বহুবিধ শক্তি কাজ করিয়াছে। কোন একটী মাত্র শক্তির দ্বারা ধর্মকে ব্যাখ্যা করা চলে না, করিলে তাহা একদেশদর্শী হইতে বাধ্য। ধর্ম কোন-না-কোন আকারে মানব-সমাজে চিরকাল বিদ্যমান আছে। পৃথিবীর সবচাইতে পুরাতন এবং ব্যাপক প্রথা ও সমাজ প্রতিষ্ঠান হইল ধর্ম। ইহার প্রভাব কেবল ঐতিহাসিক জাতিগুলি নয়, অসভ্য আদিম জাতিগুলির জীবনেও অতি শক্তিশালী এবং গভীর। এই রকম সার্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান কেবল একটা মিথ্যা এবং নিছক ভ্রান্তির উপর বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া বৈজ্ঞানিক রীতি নয়। এই প্রথাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচার ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সেই বিচারেই আজ সাব্যস্ত হইয়াছে যে ধর্ম সমাজের অতি-প্রয়োজনীয় একটা শাশ্বত প্রতিষ্ঠান। মানব-প্রকৃতির গভীর মূলদেশে ইহার শিকড় রহিয়াছে এবং বহুল সার্থকতা ও প্রয়োজনের তাকিদেই মানব-জাতির সঙ্গে সঙ্গে ইহা চিরকাল আছে। তাই সমাজবিজ্ঞান বলে যে, এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান মিথ্যার উপরে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না।‡

‡ "In reality, it is inadmissible that systems of ideas like religions which have held so considerable place in history and to which, in all times, men have

বিখ্যাত সমাজবিৎ ডুরখীম্ (Durkheim) ধর্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আধুনিক নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব এ-সম্বন্ধে বহু তথ্যসংগ্রহ ও বিচার করিয়া এই একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছে।

ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে মার্ক্সবাদী মতবাদ পরিবেশকে দায়ী করিয়াছে। কিন্তু মানুষী দিকটাকে নজরে আনে নাই। অর্থাৎ মানুষের জীবনেরও যে বহু দিকের বহু মৌলিক প্রয়োজন এবং বৃত্তি ধর্মসৃষ্টির মূলে রহিয়াছে তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছে। কেবল মাত্র এক আর্থিক দিক ও প্রয়োজন-কেই একছত্র প্রভুত্ব দান করিয়া ধর্মকেও আর্থিক ব্যাখ্যার মধ্যদিয়াই দেখিয়াছে। মানুষের মনেরও একটী বৃত্তিকেই ধর্মের উৎপত্তি ব্যাপারে দায়ী করিয়া মার্ক্সবাদ চূড়ান্ত একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়াছে। এই বৃত্তি হইল, ভয়। লেনিনের ভাষায়, "ভয়ই দেবদেবীদের সৃষ্টি করিয়াছে।—ক্যাপিটাল বা মূলধনের অন্ধ শক্তিগুলির ভয়। অন্ধ শক্তি বলিতেছি, কারণ পুঁজিবাদীর এই মূলধনের ক্রিয়া জনসাধারণের বুদ্ধিতে আসে না। এই পুঁজির শক্তি প্রতি পদে পদে মজুরের আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ধ্বংস সূচিত করে।··· এই হইল এযুগের ধর্মের উৎস বা শিকড়।"‡ মানুষী বৃত্তির মধ্যে কেবল

come to receive the energy which they must have to live, should be made up of a tissue of illusions." (Durkheim. p 70.)

‡ "Fear created the gods. Fear of the blind forces of capital, blind because its action cannot be foreseen by the masses, a force which at any step threatens the worker,··········with sudden, unexpected 'accidental' destruction··········this is the tap-root of modern religion." (Lenin on Religion.)

ভয় এবং পরিবেশের মধ্যেও কেবলমাত্র আর্থিক শক্তিকেই মার্ক্সবাদ ধর্মোৎপত্তির উৎস বা কারণ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন।

(খ) আধুনিক বিচারে এই মত একপেশে। সমাজতত্ত্ব ধর্মকে বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করিয়াছে। এই বিচারের ফলে ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মতবাদ সৃষ্টি হইয়াছে। এই সব মতবাদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাক্। প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে এই সব মতবাদকে ভাগ করা চলে। একদল ধর্মকে প্রকৃতি-পূজা (nature worship) হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে করেন এবং অন্যদল কূটাত্মা পূজা বা প্রেতপূজা (animism) হইতে ধর্মের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। ধর্মের এই দুই ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথমটী অর্থাৎ প্রকৃতিবাদ (Naturism) প্রতিষ্ঠা করেন ম্যাক্সমুলার। বেদ আবিষ্কার করার পরেই এই মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮৫৬ সালে ম্যাক্সমুলার তাঁর বই 'অক্সফোর্ড রচনাবলি' লেখেন। ম্যাক্সমুলারের মতে বিরাট গম্ভীর প্রকৃতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া মানুষের মনে আসিয়াছিল বিস্ময়, ভয় এবং অনন্তের আভাস। সেই মনোভাব থেকেই একটা গম্ভীর অনুভূতি তাহাকে 'ধর্মে'র অনুভূতি আনিয়া দেয়। ম্যাক্সমুলার প্রকৃতির সহিত মানব-মনের সংস্পর্শ হইতে এবং সংস্পর্শজনিত অধ্যাত্মানুভূতি হইতেই ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ম্যাক্সমুলার প্রকৃতিবাদী এবং সঙ্গে সঙ্গে মনস্তত্ত্ববাদী (Psychological) ব্যাখ্যাই দিয়াছেন।

দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের নেতা ও স্থাপয়িতা টাইলর (Tylor) এবং স্পেন্সার (Spencer)। টাইলর তাঁহার 'আদিম সংস্কৃতি' (Primitive Culture), নামক বই ১৮৭১ সনে লেখেন। এই বইয়ে তাঁর বিখ্যাত মতবাদ 'কূটাত্মবাদ' (Animism) তিনি প্রথম প্রচার করেন। এই মতের মূল কথা এই যে, আদিম মানুষ প্রকৃতির প্রত্যেকটি বস্তুতে মানুষেরই

মত চেতনা এবং একটী করিয়া কূটস্থ 'আত্মা' আরোপ করিয়া সব প্রাকৃতিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করিয়াছে। নির্ব্যক্তিক কোন কারণের বা শক্তির ধারণা তাহার ছিল না। নিজের দৃষ্টান্তে মানুষেরই মত সব কিছুকেই সচেতন মনে করিয়া প্রত্যেক বস্তুরই আত্মা (Spirit) আছে কল্পনা করিয়াছিল। এই সব অগণিত আত্মা এবং প্রেতাত্মা চারিদিক পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। ইহারা মানুষেরই মত সুখদুঃখ ক্রোধ হিংসা পূর্ণ, তাই তুষ্ট রাখা প্রয়োজন। ইহা হইতেই পূজাপার্বন, তুকতাক্, ইত্যাদি ধর্মানুষ্ঠান আসিল। টাইলরের মতে এই প্রেতাত্মা বা কূটাত্মার পূজা (Animism) হইতেই প্রকৃতি-পূজা (Nature worship) আসিয়াছে।

স্পেন্সার ১৮৭৬ সনে তাঁহার "সমাজতত্ত্বের মূলনীতি" * প্রকাশ করেন। স্পেন্সার যদিও টাইলরের কূটাত্মাবাদকে অস্বীকার করেন নাই, তবুও তিনি নিজে একটা পৃথক মতবাদ যোগ করিয়াছেন। তাঁহার মতবাদকে 'প্রেতাত্মা-পূজা' (ghost worship) বা 'পিতৃপূজা' (ancestor-worship)ও বলা চলে। তাঁর মতে, ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে মৃত পিতৃপুরুষের প্রেতাত্মার ভয় (fear) থেকে। অসভ্য মানুষ স্বপ্ন, নিদ্রা, ছায়া, মূর্চ্ছা, মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনা থেকে আত্মার ধারণা করিয়াছে। (টাইলর প্রেতপূজার কথা বলিলেও এতটা প্রাধান্য দেন নাই।) মৃত্যুর পরে আত্মা জীবিত থাকে এবং মৃত পিতৃপুরুষের ভয় তখনো বজায় থাকে। জীবিত পিতৃপুরুষকে যেমন তেমনি, মৃত পুরুষকেও তুষ্ট করা চাই। এইভাবে আসিল মৃতের উদ্দেশ্যে তুকতাক ও নানা অনুষ্ঠান। টাইলরের সাথে স্পেন্সারের মত পার্থক্য আছে। স্পেন্সারের মতে, নদ-নদী, গাছপালা, পর্বত সব কিছুরই অধিষ্ঠাত্রী প্রেতাত্মা কোন পূর্বপিতৃপুরুষের

* Principles of Sociology I

প্রেতাত্মা। সুতরাং পিতৃপুরুষের (Ancestor-Ghost worship) প্রেতপূজা থেকেই প্রকৃতি পূজা আসিয়াছে।

টাইলর এবং স্পেন্সার দুইয়েরই মতবাদ একদেশদর্শী এবং অবাস্তব বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। আদিম জাতি সকলেই টাইলর-কথিত কূটাত্মাবাদী নয়। অনেক জাতি পাওয়া যাইতেছে যাহাদের ধর্মে প্রত্যেক প্রাকৃতিক বস্তুকেই অধিষ্ঠাতা একটা আত্মার আবাস বলিয়া মনে করা হয় না। তাছাড়া কূটাত্মাবাদ আদিমতম ধর্মমত বলিয়াও আজ স্বীকৃতি পায় না। যথা ম্যারেট (Marett) নামক বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক প্রমাণ করিয়াছেন যে টাইলরের মত ভ্রান্ত। কূটাত্মাবাদের থেকে বিভিন্ন এক ধরণের ধর্মবিশ্বাস আদিম জাতিতে প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ধর্মবিশ্বাসকে ম্যারেট নাম দিয়াছেন 'সর্বপ্রাণবাদ' ('Animatism')। সর্বপ্রাণবাদ মানে এই যে প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে অপ্রাকৃত শক্তি বা গূঢ় অনুস্যূত একটা প্রাণময়তা রহিয়াছে। কিন্তু এই শক্তি কোন spirit বা ব্যক্তিত্বশীল আত্মা নয়। একটা একাকার প্রাণময় শক্তি প্রত্যেক বস্তুকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এই ব্যাপক শক্তিকে অসভ্যরা পূজা করে। ম্যারেটের মতের দ্বারা টাইলরের মতবাদ ধর্মের একমাত্র ব্যাখ্যা হিসাবে অগ্রহণীয় হইয়া পড়িয়াছে। ডুরখীম (Durkheim) এই কূটাত্মাবাদ এবং প্রেতবাদ (Ghost Theory) বিস্তৃত আলোচনা দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। ডুরখীম যুক্তি বিচারের বিরোধী বলিয়া এই টাইলর-স্পেন্সার মতবাদকে প্রমাণ করিয়াছেন : তা ছাড়া, পিতৃপূজা অনেক জাতিতেই নাই, অথচ সেখানে ধর্ম আছে।

ডুরখাইম ধর্মোৎপত্তির অন্য ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁর মতে সমাজ-পরিবেশের সার্বিক প্রভাব মানুষকে অভিভূত করে। আদিম

মানুষও তার চতুঃপার্শ্ববর্তী বিরাট সমাজ-দেহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রভাবিত হইত। এই প্রভাবই রূপ নিয়াছে আদিম মানুষের টোটেম পূজায় (Totemism)। কোন প্রাণী বা বস্তুকে পূজা করাকেই টোটেমবাদ বলে। বুণ্ডট্ (Wundt)ও টোটেম হইতে ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। টোটেমের সহিত গোষ্ঠী-প্রথার নিকট ও অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে এবং গোষ্ঠীকে (clan-gens) যেমন ইতিহাসের একটা অনিবার্য স্তর মনে করা হইত তেমনি কিছুদিন আগে পর্যন্তও টোটেমবাদকে একটা সার্বজনীন ঐতিহাসিক স্তর বলিয়া অনেকে মনে করিতেন। বুণ্ডট্, দুরখীম প্রভৃতিদের এই সার্বিক টোটেম-বাদ আজ নূতন গবেষণায় প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। লাউয়া, গোল্ডেন-ভাইজার প্রমুখ নবসমাজ-বিজ্ঞানীরা গোষ্ঠী-প্রথাকে পরবর্তী কালের একটা স্তর বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। টোটেমবাদ আজ আদিমতম ধর্মবিশ্বাস বলিয়া গৃহীত হয় না। অনেক জাতিতে গোষ্ঠীপ্রথার উদ্ভবই হয় নাই। তাই গোল্ডেনভাইজার বলেন, গোষ্ঠীযুগ বাতিল হইয়া যাওয়ায় সার্বজনীন টোটেম যুগও বাতিল হইয়া গিয়াছে। † কাজেই ধর্মের টোটেম-বাদী ব্যাখ্যা অচল।

ধর্মকে ফ্রেজার (Frazer) ম্যাজিক বা যাদুবিদ্যা থেকে উদ্ভূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আদিম যুগে ধর্ম ছিল না, যাদুবিদ্যা ছিল। প্রাকৃতিক বস্তুগুলিকে নিজের বিপদ-আপদে আত্মরক্ষায় ব্যবহার করিবার প্রথাকেই যাদুবিদ্যা বলা চলে। ক্রমে যাদুবিদ্যার ব্যর্থতা দেখিয়া মানুষ নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে নিরাশ হইল এবং প্রকৃতির মধ্যে উচ্চতর

† "The rejection of the clan-gens era necessarily led to the abandonment of the theory of an universal totemic age." (Political Thesis, p. 443.)

শক্তি কল্পনা করিয়া আত্মসমর্পণ করিল। অর্থাৎ ম্যাজিক হইতে ধর্ম আসিয়াছে। ‡

ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন মার্ক বলডুইন (Mark Baldwin)।* ইহার মতে শিশু তাহার আত্মীয়জনের প্রতি যে প্রীতি, বিশ্বাস, আনুগত্য, নির্ভর ও সম্ভ্রম বোধ করে, তার থেকেই ধর্মভাবের উদয় হয়। এই সব পার্শ্ববর্তী আত্মীয়জনের মধ্যে বহু আদর্শ গুণ আরোপ করিয়া শিশু মনে মনে একটা আদর্শ ব্যক্তিত্ব গড়িয়া তোলে। এর পরে প্রকৃতির ঐশ্বর্য ও গাম্ভীর্য তার মনে এক দিকে আনে নির্ভরতা, অন্যদিকে জাগায় একটা গভীর রহস্য-বোধ (Sense of mystery).।

ফ্রয়েড দিয়াছেন ধর্মের যৌনবাদী (sexual) ব্যাখ্যা। শিশুর মনে প্রথম হইতেই পিতা সম্বন্ধে একদিকে ভয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে অনুরক্তি এই দ্বৈতবৃত্তি উৎপন্ন হয়। পিতার প্রতি তার মনোভাবকে রূপান্তরিত করিয়া সে পিতারই মহত্তর প্রতিচ্ছায়ারূপে ঈশ্বরের কল্পনা করে এবং ঈশ্বরের প্রতিও তার দ্বৈতবৃত্তি এবং ভয়মিশ্র অনুরক্তি জন্মায়। এই অনুরক্তি আর কিছুই না, ইহা যৌনবৃত্তিরই একটা বিকৃত রূপান্তর মাত্র।

ফ্রয়েডের এই ব্যাখ্যাও একদেশদর্শী। ফ্রয়েড কেবল যৌনবৃত্তি দ্বারাই ধর্মকে ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়া যে ত্রুটি করিয়াছেন তাহারই সহকর্মী অ্যাড্‌লার (Adler) এবং য়ুঙ্ (Jung) তাহার সংশোধন করিয়াছেন। মানুষের মানসে কেবল যৌনবৃত্তিই নয়, শ্রেষ্ঠত্ব কামনা, শক্তি কামনাও কাজ

‡ Ancient magic was the very foundation of religion (Frazer, p. 53)

* "Social and Ethical Interpretations." 913.)

করিতেছে ; সমষ্টি-চেতনার অজ্ঞাত সমুদ্র হইতেও প্রভাব আসিয়া নির্দিষ্ট খাতে মনোলোককে রূপায়িত করিতেছে। ফ্রয়েড় কেবল ভাবাবেগকেই নিয়ন্ত্রক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বুদ্ধিবৃত্তিরও জীবনে প্রভাব রহিয়াছে তাহাকে ফ্রয়েড স্বীকার করেন নাই। তাহা ছাড়া ফ্রয়েডের সম্পূর্ণ মতবাদটাই ম্যাকডুগাল ও ওয়েষ্টারমার্ক প্রভৃতি মনস্তাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকেরা নানা যৌক্তিক ত্রুটি দেখাইয়া একপেশে বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

মার্ক্সের আর্থিক ব্যাখ্যাও এইসব বিবিধ ব্যাখ্যার মধ্যে অন্যতম। ধর্মের সহিত অর্থনীতির কারণিক (causal) বন্ধন এবং অনড় নিয়ন্ত্রণবাদ আজকাল বিজ্ঞান স্বীকার করে না। ইহা পূর্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে। বাস্তব জগতেও ক্ষেত্র-গবেষণায় এই অকাট্য কারণিক সম্বন্ধ প্রমাণ হয় নাই। হব-হাউস-হুইলার-গিন্সবার্গ কর্তৃক লিখিত বিখ্যাত গবেষণা পুস্তকে দেখা গিয়াছে, ধর্মের সহিত অর্থনীতির যান্ত্রিক বন্ধন অসভ্য সমাজে দেখা যায় না। অর্থনীতির প্রভাব ধর্মের উপর আছে ইহা সত্য। কিন্তু ধর্মের উপরও অর্থনীতির প্রভাব রহিয়াছে। সম্পর্কটা পারস্পরিক। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সর্বদাই বিদ্যমান। ধর্মও যে অর্থনীতিকে কতখানি প্রভাব করিয়াছে, রূপায়িত করিয়াছে, তাহা ম্যাক্সাওয়েবার, বেঞ্জামিন কিড, ডুরখীম প্রমুখ অসংখ্য সমাজতত্ত্ববিদ প্রমাণ করিয়াছেন। আদিম কালে ধর্মের প্রভাব আরো বেশী ছিল। প্রাচীন ও মধ্যকালেও ধর্ম জীবনের সব দিকেই রূপ দিয়াছে। আধুনিক কালেই বরং ধর্মের প্রভাব কম। কিন্তু এখনো পৃথিবীতে বহু রাষ্ট্রের অর্থনীতি সমাজনীতি জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে ধর্মশাস্ত্রদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম হইতেই রাষ্ট্র-অর্থনীতি উৎপন্ন হইয়াছে, ধর্মবাদীদের এ দাবিও ভিত্তিহীন। আসলে ধর্মের রূপায়নেও অন্যান্য সমাজ শক্তিগুলির (অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনকানুন, যৌনবৃত্তি শক্তিকাম প্রভৃতি

মনোবৃত্তি, ভূগোল, বংশপ্রভাব ইত্যাদি) দান রহিয়াছে। ধর্মের উৎপত্তিরও বহুবাদী ব্যাখ্যাই সঙ্গত।

অথচ মার্ক্সবাদীরা কেবল অর্থনীতি বা সম্পত্তির সহিতই ধর্মের কারণিক সম্পর্ক টানিয়াছেন। ইহাদের কারণিকতাবাদ বা causality সম্বন্ধে ধারণাও যান্ত্রিক। এঙ্গেল্‌স্ এবং মার্ক্স যান্ত্রিক জড়বাদকে নিন্দা করিয়াও শেষে নিজেদের মতবাদকেও যান্ত্রিকতায় পরিণত করিয়াছেন। সমাজক্ষেত্রেও ইহারা প্রাকৃতিক জগতের নিয়মাবলীর মতনই অব্যর্থ ও অমোঘ কার্য-কারণ-নিয়মাবলী রহিয়াছে বলিয়া বলিয়াছেন।* প্রকৃতি ও সমাজ, এই দুই ক্ষেত্রে একই ধরণের কারণিকতা ক্রিয়াশীল বলিয়া যাহারা বলেন, তাহারা যান্ত্রিকতাবাদী বই আর কী? সমাজবিজ্ঞান এই যান্ত্রিক দৃষ্টিভংগীকে বর্জন করিয়াছে। তাই ধর্মব্যাখ্যায়ও অর্থনীতির (বা সম্পত্তি-প্রথার) অমোঘ কর্তৃত্বকে সমাজতত্ত্ব স্বীকার করে না। এদিক দিয়া মার্ক্সবাদী ধর্মব্যাখ্যাও ভ্রান্তিপূর্ণ।

মার্ক্সবাদ অর্থনীতির সহিত ধর্মের সম্পর্ক টানিয়া বলে, যে উৎপাদন-শক্তি গোষ্ঠীসমাজে নিম্নস্তরের ছিল, কারণ প্রকৃতিকে তারা জানিত না, ও প্রকৃতিকে মানুষের কাজে লাগাইতে-ও তারা পারে নাই। এই অজ্ঞাত প্রকৃতির প্রতি ভয় হইতেই প্রকৃতি-পূজা ও ধর্মের উদ্ভব হইল। প্রকৃতি ও উৎপাদন-শক্তিকে একবার বুঝিয়া ফেলিতে পারিলে প্রকৃতি ও উৎপাদন শক্তিগুলি তখন মানুষের দাস হইয়া দেখা দিবে।‡ তখন আর মানুষের

* "The forces operating in society work exactly like the forces operating in Nature."..........Anti-Duehrring, 265.)

‡ "Once their nature is grasped.........they can be transformed from demoniac masters into willing servants.")

প্রকৃতি সম্বন্ধে কিংবা উৎপাদন-শক্তি সম্বন্ধে কোন ভয় বিস্ময় থাকিবে না। তাই তখন ধর্মও থাকিবে না। দেখা যাইতেছে যে, উৎপাদন-ব্যবস্থা শ্রমিকের হাতে না আসা পর্যন্ত বিপুল উৎপাদন-ব্যবস্থার কর্তৃত্বে ও অধীনে বাস করিয়া শ্রমিকের মনে ভয়জনিত ঈশ্বরভক্তি ও ধর্মবৃত্তি অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে। উৎপাদন-ব্যবস্থাও বাহিরের একটা দুজ্ঞের্য় প্রবল শক্তিরূপে শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের কাছে একটা ভয়ের বস্তু। এই যুক্তিতে পুঁজিবাদীদের তো ধর্মবৃত্তি থাকাই চলে না। পুঁজিবাদীরাই প্রকৃতিকে বিজ্ঞানের শক্তি দ্বারা দাসে পরিণত করিয়াছে, আয়ত্তে আনিয়াছে। কাজেই পুঁজিবাদী সমাজে ধর্ম লুপ্ত হওয়াই উচিত। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজই, মার্ক্সবাদী মতে, ধর্মের পীঠভূমি। ধর্মের উৎপত্তির এই মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা ভাঙিয়া পড়ে একথাও বলা চলে যে প্রকৃতিকে মানুষ কোনোদিনই সম্পূর্ণ জানিবে না। (একথা এঙ্গেল্স্ স্বীকার করেন) যতই বিজ্ঞান অগ্রসর হোক্ একদিন প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান শেষ হইয়া যাইবে, একথা অস্বীকার্য। কাজেই এই যুক্তিতে, তাহা হইলে, চিরদিনই মানুষের মনে অজ্ঞাত প্রকৃতির প্রতি ভয় থাকিবে এবং ধর্মও থাকিবে।

মার্ক্সবাদী হয়ত বলিবেন যে, তা নয়, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ধর্মের পিছনে থাকে বলিয়াই ধর্ম অর্থের সৃষ্টি। এখানে মার্ক্সবাদ স্পষ্ট নয়। উদ্দেশ্য দ্বারাই যদি প্রতিষ্ঠানকে বিচার করিতে হয় তবে আদিমকালের মানুষ প্রকৃতির ভয় থেকে ধর্মবোধ লাভ করিল কী করিয়া? আদিম মানুষ যে স্বার্থসিদ্ধির ও আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মকে সৃষ্টি করে নাই, তাহা তো এঙ্গেল্সের ও লেনিনের উক্তি হইতেই দেখা যাইতেছে আর যদি বলা হয় যে, ধর্মকে আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়া থাকে, তবে আদিম ধর্ম সম্বন্ধে সে কথা প্রযোজ্য নয়। পরবর্তি-কালে, ধর্মের অপব্যবহার হইয়াছে, যেমন প্রত্যেক প্রথারই হইয়া থাকে

ার্থিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে অপব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া ধর্মের উৎপত্তিও ার্থিক কারণে ঘটিয়াছে বলা অযৌক্তিক। এই কারণে মার্ক্সবাদী আর্থিক াখ্যা ধর্মের বেলায় মোটেও খাটে না; বাস্তব তথ্যেও আর্থিক ব্যাখ্যা ণ্ডিত হয়। আদিম ধর্ম ম্যাজিক প্রভৃতি নানা মনোভাবের সহিত জড়িত ন্তু তার সহিত অর্থনীতির কোনো বিশিষ্ট কার্যকারণ সম্পর্ক ছিল না। ন্তু বহুবাদী ব্যাখ্যার মতে আদিম কালেও ধর্মের মধ্যে অর্থনীতিরও স্পর্শ ল। কারণ ধর্ম প্রধানতঃ মনোলোকের ব্যাপার হইলেও বহু জীবনের ভাবও তাহার মধ্যে মিশ্রিত থাকে। বহু বৃত্তি ও শক্তির সমবেত ফলই র্ম।

এঙ্গেল্‌স্-লেনিন কার্যতঃ 'ভয়' হইতেই ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া র্ধারণ করিয়াছেন, প্রকৃতির ভয় এবং বিপুল সমাজশক্তির ভয়। স্পেন্সারও প্রেত-আত্মার ভয় ও পূর্বপুরুষের ভয় হইতে ধর্মকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। াইলরও সেই ধর্মপদ্ধতিতেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহার মতে প্রেতভয় থকে ধর্ম উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু ভয়ই মানুষের একমাত্র মনোবৃত্তি নয়। র্মের মূলে কেবল ভয়ই আছে, এমতও সম্পূর্ণ একদেশদর্শী। ডুরখীম এই য়-বাদ (Theory of fear)কে তীব্র আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁর তে ধর্ম কেবল ভয় হইতেই উৎপন্ন হয় নাই।*

* "The first religious conceptions have often been ttributed to feelings of weakness and dependence, of ear and anguish which seized men when they came nto contact with the world..........We have now hown that the first religions were of a wholly lifferent origin.........The primitive does not regard is gods as foreigners, enemies, or thoroughly and

ধর্মের মূলে আছে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা। দৈবীশক্তির প্রতি আদি মানুষের মনোভাব বন্ধুত্বের। দৈবীশক্তিকে তারা বন্ধু বলিয়া, স্বজন রক্ষক বলিয়া মনে করে। শত্রু বা অজানা পরদেশী বা দুষ্টবুদ্ধি বিদ্বেষ প্রবণ জীব বলিয়া কখনো ভাবে না। যারা ধর্মকে ভয়প্রসূত মনে করেন তারা একপেশে মতাবলম্বী বার্গশঁ-ও (Bergson) বলেন "ধর্মবিশ্বাস বলিতে বুঝিতে হইবে মূলতঃ বিশ্বাস, আস্থা; ধর্মের মূল উৎস কখনো ভয় নয়, বরং ভয়ের বিরুদ্ধে আশ্বাস-বোধ। ম্যাক্সমুলারের মতে ধর্মের মূলে আছে 'অনন্তের অনুভূতি' ("The perception of the Infinite.")। বল্‌ডুইনের মতে, ধর্মের মূলে আছে বিস্ময়জনিত শ্রদ্ধাসম্ভ্রম। কিং'র (King) মতে, প্রমূল্য বোধ (Sense of value) থেকে ধর্মের উৎপত্তি। সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ ধর্মের উৎপত্তি নানা মনোবৃত্তি হইতে হইয়াছে বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। কোন একটি বৃত্তিই ধর্মকে ব্যাখ্যা করিতে যথেষ্ট নয়। মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যাও ভয়বাদকে ভিত্তি করিয়াছে। এদিক হইতে মার্ক্সবাদ অসম্পূর্ণ।

(গ) ধর্মের উপরি-উক্ত সব ব্যাখ্যাই একটী মাত্র শক্তি বা বৃত্তিকে ভিত্তি করিয়া। তাই এইসব ব্যাখ্যাই অসম্পূর্ণ ও একদেশদর্শী। প্রকৃত ব্যাখ্যা হইল বহুবাদী বা চিদ্ভৌতিক (Psycho-Materialist theory) ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা অনুসারে আদিম মানুষ প্রকৃতি, বিশ্বভুবন, মানব-সমাজ

---

necessarily malevolent beings whose favours he must acquire. Quite on the contrary, they are rather friends, kindreds or natural protectors for him..... In fine, the sentiments at the root of Totemism are those of happy confidence rather than of terror and compassion." (Durkheim, p. 223.)

এইসব কিছুর সম্মুখীন হইয়া নানা বিমিশ্র ভাব ও অনুভূতির বশে ধর্মকে সৃষ্টি করিয়াছে। যান্ত্রিকভাবে, পরিবেশের নিয়ন্ত্রণে নয়। মানুষ সৃজনশীল। তাই পরিবেশ-সৃষ্ট সমস্যা ও তাহার জীবন-জনিত সমস্যার সমাধান মানুষ সৃজনপর প্রতিভা ও পরিকল্পনার সাহায্যে করিয়াছে। এই সমাধানের মধ্যে 'ধর্ম' অন্যতম। এই সমাধানে ভৌগোলিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ ও মানসিক জগৎ, এই তিন জগতেরই প্রভাব ও ছাপ পড়িয়াছে। তাই ধর্মের মধ্যে প্রকৃতি, মনোবৃত্তি ও সমাজ এই তিনেরই দান রহিয়াছে।

(ঘ) ধর্ম সহজ অবিমিশ্র পদার্থ নয়। ইহা জটিল, মিশ্র পদার্থ। গোল্ডেন ভাইজার, ডুরখীম, ম্যালিনাউস্কী (Malinowski), প্রমুখ সকলেই এ-সম্বন্ধে একমত। কোন একটী মাত্র ক্রিয়া করিয়াই ধর্মের সার্থকতাও শেষ হয় না। সার্থকতাও বহুমুখী। জীবনে ধর্মের দান নানা দিকে।

ধর্মের প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ

ধর্মের দানও যদি বহুমুখী হয় এবং ধর্মের উৎপত্তিও যদি বহুমুখী ও বিবিধ হয়, তবে সিদ্ধান্ত স্বভাবতই এই হয় যে ধর্মের প্রকৃতি সমাজ কল্যাণমূলক এবং ধর্মের ভবিষ্যৎও নিশ্চিত। এইখানে মার্ক্সীয় আর্থিক ব্যাখ্যার কথা আসে। মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যায় ধর্ম একটা ভ্রান্তি ও ভয় থেকে উৎপন্ন। অতএব এই কুসংস্কার ও ভিত্তিহীন মিথ্যা সমাজের হানিকর এবং অমঙ্গলজনক। মার্ক্স ইহাকে "আফিম" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। লেনিনও ঘোষণা করিয়াছেন, যে ধর্মকে ধ্বংস করিতেই হইবে। ধর্মের বিরুদ্ধে তাই প্রচার চালাইতে হইবে। "মার্ক্সবাদ হইল জড়বাদ। অতএব মার্ক্সবাদ ধর্মের নির্মম শত্রু, যেমন শত্রু ছিল ১৮শ শতকের 'আভিধানিক দল' (Eneyclopaedist)·········আমাদের ধর্মকে

বিরোধিতা করিতে হইবে। এটাই হইল সব জড়বাদ—অতএব মার্ক্সবাদের কথগ। (লেনিন) * "স্বভাবতঃই নাস্তিক্যবাদ প্রচার আমাদের প্রোগ্রামের অঙ্গ।" (লেনিন) † মার্ক্সবাদীকে জড়বাদী অর্থাৎ ধর্মের শত্রু হইতেই হইবে।' (লেনিন) ‡ লেনিন প্রমুখ মার্ক্সবাদীরা ধর্মের বিরুদ্ধে তাই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

কিন্তু আধুনিক সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব কি বলে? নবসমাজবিজ্ঞান বলে, ধর্ম সমাজের ও মানুষের অপরিহার্য অঙ্গ। যতদিন মানুষ আছে ধর্মও আছে; কারণ ধর্ম সমাজের সহিত জড়িত, সমাজের কল্যাণপ্রসূ। ম্যালিনাউস্কীর (Malinowski) মতে, "ধর্ম এবং তত্ত্ববিদ্যা যতদিন মানুষের জ্ঞান ও ভাষা আছে ততদিন পৃথিবীতে আছে। আদিতে ধর্ম ছিল স্থূল—কুটাত্মাবাদ, ম্যাজিক শক্তিতে বিশ্বাস, তুকতাক, প্রেত, টোটেম ইত্যাদি—অর্থাৎ প্রকৃতি ও মানুষের আধ্যাত্মিক সাধর্ম্য—এসব হইল জীবনের মৌলিক সমস্যার সমাধানে মানুষের জবাব।" ¶ ম্যালিনাউস্কী বহু গবেষণা করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন। প্রত্যেক কৃষ্টিতে ধর্ম অত্যাবশ্যক অঙ্গ।

* "Marxism is Materialism. As such it is as relentlessly opposed to religion as was the materialism of the Encyclopaedists. ·······We must combat Religion—this is the A B C of all Materialism and so of Marxism." (Lenin.)

† "Our programme thus necessarily includes propaganda of atheism." (Lenin.)

‡ "The Marxist must be a materialist i. e. an enemy of religion." (Lenin.)

¶ "Metaphysics and religions. Speculations are as old as knowledge and as old as langauge itself. At the

মানুষের বাঁচিবার উপায় ধর্ম, জীবনে নৈতিক শক্তি হইল ধর্ম। সে ধর্মকে বাদ দিয়া কোন কৃষ্টি সম্ভব নয়। সংস্কৃতির ভিত্তিই হইল ধর্ম।* ডুরখীম সমাজ সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহার মতেও, সমাজ ও ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজে ধর্ম উদ্ভূত হইয়াছে, সমাজকে রক্ষা ও পোষণ করাই ধর্মের প্রধান সার্থকতা। ধর্ম সমষ্টি-জীবনকে গঠন করিয়াছে। নীতি-নিষেধ, সংযম, ত্যাগ, নিষ্ঠা প্রভৃতি উদ্রেক করিয়া সমাজপ্রগতিকে সম্ভব করিয়াছে। †

বার্গশেঁা জীবতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বে খ্যাতনামা পণ্ডিত। তাঁরও মতে, "সত্য কথা এই যে ধর্ম মানবজাতির সর্বত্রই বিদ্যমান এবং নিশ্চয়ই মানুষের গঠনেরই মধ্যে ধর্ম রহিয়াছে।"‡ বার্গশেঁাও বলেন যে ধর্মের সমাজ-রক্ষায় বহুমুখী

beginning they are extremely simple and crude. Animism, beliefs in magical force, fantasies about sorceries, ghosts, totemism—i. e. the belief in the spiritual affinity between man and nature, are the answers of primitive man to the fundamental riddles of life." (Malinowski, Article in 'Human affairs'.)

* "Religion and to a lesser degree magic, thus becomes the very foundation of culture." (Malinowski, Article in 'Human Affairs.')

† "If religion has given birth to all that is essential in society, it is because the idea of society is the soul of religion." (Durkheim, p.418, Elementary forms of Religion.)

‡ "The truth is that religion being co-extensive with our species, must be an effect of our structure." ('Two Sources', Bergson, p 150.)

দান রহিয়াছে। স্থানকাল অনুসারে ইহার পার্থক্য হইতে পারে, কিন্তু ধ
সর্বত্রই সমাজকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।*

কিন্তু সমাজে ধর্মের দান মার্ক্সবাদী স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে ধর্ম ভবিষ্যৎ সমাজে বিলুপ্ত হইবে, সমাজগতির অব্যর্থ নিয়মে। ধর্ম অর্থ নীতির সৃষ্টি, পুঁজিবাদের সৃষ্টি। কাজেই সমাজতন্ত্রী সমাজে শ্রমিকে হাতে উৎপাদন-ব্যবস্থা আসিলে এই দুর্বোধ্য ভয়াল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রহস লোপ পাইবে। সঙ্গে সঙ্গে ভয় এবং ধর্ম মানুষের মন হইতে লুপ্ত হইবে।† এঙ্গেল্‌স্ একথা স্পষ্টই বলিয়াছেন; লেনিনও বলিয়াছেন, "অর্থনৈতিক প্রগতির ফলে ধর্ম ক্রমেই আবর্জনাস্তূপে নিক্ষিপ্ত হইবে।"‡ এক কথায় ধর্ম লুপ্ত হইবে ইহাই হইল ধর্মের নিশ্চিত ভবিষ্যৎ। মার্ক্সবাদ অর্থনীতি হইতেই ধর্মের উৎপত্তি স্থির করিয়া স্বভাবতঃই আর্থিক কারণেই ইহার বিলুপ্তি ঘটিবে বলিয়া নির্দেশ করিবে। পুঁজিবাদ মানুষের ভয়ের কারণ। পুঁজিবা লুপ্ত হইলে ভয় ও ধর্ম দুইই লুপ্ত হইবে। কারণ ভয় হইতেই ধর্ম।

বস্তুবাদী ব্যাখ্যার দৃষ্টিভঙ্গিতে এই আর্থিক নিয়ন্ত্রণ যে ভুল তাহা পূ আলোচিত হইয়াছে। economic determinism বা আর্থিক নিয়ন্ত্রণের বদলে আজি সমাজতত্ত্ব বহু শক্তির পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতকেই (functiona

* "One thing is certain, that religion has alway played a social role. This part indeed is a comple one."..........ibid, Bergson, 4.)

† "Only then will the last extraneous force which i still reflected in religion, vanish, and with it will als vanish the religious reflection itself.".........(Anti-Dueh rring, p 301.)

‡ "being steadily relegated to the rubbish-heap b the normal course of economic development." (Lenin.)

interaction) সমাজ-বিবর্তনের কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে। এই দৃষ্টিতে অর্থনীতির প্রভাব স্বীকৃত। কিন্তু তাহা পারস্পরিক প্রভাব। অর্থাৎ ব্যক্তিসম্পত্তি লুপ্ত হইলে, পুঁজিবাদের উচ্ছেদ ঘটিলে সমাজের জীবনে অন্যান্য দিকেও তার প্রভাব পড়িবে, কারণ ব্যক্তিসম্পত্তির উচ্ছেদ সমাজে একটা প্রধান ও বৈপ্লবিক ঘটনা। এতবড় ঘটনার প্রভাব সমাজের জীবনে পড়িবেই সন্দেহ নাই। রাষ্ট্রে পড়িবে, বিবাহে পড়িবে, আইন-কানুনে পড়িবে—ধর্মের উপরও পড়িবে। কিন্তু এই প্রভাবের রূপ কি? মার্ক্সবাদী বলেন, ধর্মের বিলুপ্তি; বহুবাদী নবসমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, অর্থনীতি জীবনের মাত্র একটী দিক। সে দিকের পরিবর্তনে বা বিপ্লবে, ধর্মের আর্থিক দিকে পরিবর্তন ঘটিবে। কিন্তু ধর্ম লুপ্ত হইতে পারে না। কারণ ধর্ম মানুষের বহুবিধ বৃত্তি, প্রয়োজন ও সার্থকতা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। মানুষের জীবনে গভীরতম প্রদেশে ধর্মের মূল রহিয়াছে। মানুষ যতদিন মানুষ থাকিবে ততদিন এই মূলের উচ্ছেদ নাই। তাই বার্গশোঁ বলিয়াছেন, আমাদের সংগঠনের মধ্যে, আমাদের সত্তারই মধ্যে ধর্মের অস্তিত্ব। বিখ্যাত সমাজবিদ্ গিডিংসের মতে, যারা কোন একটিকে অবলম্বন করিয়া ধর্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাদের মতবাদ একদিন সমাজে প্রত্যাখ্যাত ও খণ্ডিত হইবেই। আদিম ধর্মও বহু উপাদানের সমষ্টি। বর্তমান কালের পদার্থ-বিজ্ঞানও ধর্মকে স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান আজ ধর্মকে সমাজকল্যাণের ধারক বলিয়া প্রচার করিতেছে। বেঞ্জামিন কিড্ (Benjamin Kid) বলেন, "সমাজবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অহরহ যে সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে তাহার মূল প্রেরণা দান করিয়াছে ধর্ম বিশ্বাস।"*

* "The motive power in this struggle has undoubtedly been supplied by his religious beliefs." (Social Evolution, p 100.)

বেঞ্জামিন কিডের মতবাদের আতিশয্য ছাড়িয়া দিলে একথা বলা চলে যে সামাজিক ক্রমবিকাশের মূলে ধর্ম একটা প্রধান শক্তিরূপে কাজ করিয়াছে। ব্যক্তি-সম্পত্তির লোপ হইলেও যে ধর্মবিশ্বাস লোপ পায় না, তাহার প্রমাণ সোভিয়েট রাশ্যা। রাশ্যায় আজ ধর্ম লুপ্ত হয় নাই। রাষ্ট্রের শক্তিপ্রাবল্য ও প্রচার এবং কম্যুনিষ্ট দলের সর্বব্যাপী প্রচার ও প্রচেষ্টাও মানুষের মনকে ধর্ম হইতে বিমুক্ত করিতে পারে নাই। আসলে মার্ক্সবাদী সমাজতত্ত্ব একদেশ-দর্শী এবং তাই সামাজিক জীবনের বাস্তব বিবর্তনও এই মতবাদকে খণ্ডন করিতেছে। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানও মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

মার্ক্স-মর্গানী বিবাহ ও পরিবার-তত্ত্বের সমালোচনা

পরিবার ও বিবাহের উৎপত্তি

বিবাহ ও পরিবারের উৎপত্তি সম্বন্ধে মর্গানী মতবাদের ভিত্তি হইল আর্থিক ব্যাখ্যা। এই আর্থিক ব্যাখ্যার দুইটী অংশ। প্রথমতঃ অর্থনৈতিক কারণে আর্থিক ব্যবস্থা হইতেই পরিবারের উদ্ভব হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বিবাহ ও পরিবার একটা নির্দিষ্ট স্তরপর্যায়কে অনুসরণ করিয়া, একটা বিশিষ্ট ছকের মধ্যদিয়া ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছে। বিবাহ ও পরিবারের এই ছকটী পূর্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশের এই আর্থিক ব্যাখ্যা আজ বিজ্ঞান কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত। বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয় বলিয়া সংক্ষেপে মূল কথা কয়টী এখানে আলোচিত হইতেছে। এই আর্থিক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তিই এই যে, বিবাহ ও পরিবারের মূলে কেবল অর্থশক্তি বা economicsই ক্রিয়াশীল নয়, অন্যান্য বহুবিধ শক্তিও কাজ করিতেছে। বিবাহের ও পরিবারের একবাদী ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ বলিয়া বিজ্ঞানীরা স্বীকার করিয়াছেন। বহু প্রকারের একবাদী ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে।

বিবাহ ও পরিবারের **যৌনবাদী ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা** ফ্রয়েড প্রচলন করিয়াছেন। যৌনবৃত্তির উদ্দামতাকে আদিম মানুষ দমন করিয়াছে, শক্তিশালী ব্যক্তির ভয়ে। এই অবদমন হইতেই নরনারীর যৌনবৃত্তি একটা খাতে বহিয়াছে। তাই আদিম কাল হইতেই একবিবাহ ও পিতৃক্রম প্রচলিত রহিয়াছে।

ভৌগোলিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন বিখ্যাত সমাজবিদ লা প্লে (La-Play) এবং তাঁহার সম্প্রদায়। পরিবার পিতৃতন্ত্রী হইবে, একবৈবাহিক হইবে, না যৌথপরিবার হইবে তাহা ভৌগোলিক পরিস্থিতির উপরেই নির্ভর করে বলিয়া ইহারা দেখাইয়াছেন। জীবন সংগ্রামের রূপ নির্ভর করে ভৌগোলিক স্থিতির উপরে। তাহারই উপর নির্ভর করে নরনারীর সংখ্যানুপাত এবং কন্যাহত্যা প্রভৃতি সামাজিক প্রথা। ইহার উপরেই নির্ভর করে বহুপতিক (polyandrous) বা বহুপত্নীক বিবাহ ও পরিবার।

সামাজিক ও ধার্মিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন দুরখীম। দুরখীম (Durkheim) টোটেম প্রথা ও সামাজিক প্রথার প্রভাবকেই বিবাহ ও পরিবারের ভিত্তি বলিয়াছেন! প্রকারান্তরে ধর্মকেই বিবাহের মূল বলিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আদিম কালে টোটেম প্রথা ধর্মের কেন্দ্র ছিল। এই ধর্মবিশ্বাসই শ্রেণীভেদ ও তথা বিবাহকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে।* বেঞ্জামিন কিড্ ও (Kid) ধর্মকে সমাজপ্রগতির মূল বলিয়াছেন। বিবাহ ও পরিবারের মূলে যে আত্মোৎসর্গবৃত্তি রহিয়াছে তাহা ধর্মবুদ্ধিই মানুষকে দান করিয়াছে, কিড্-কে অনুসরণ করিয়া ইহা বলা চলে। এদেশে দায়ভাগপ্রবর্তক জীমূতবাহন পরিবারকে ধর্ম দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিবাহ ও পরিবারের মূল উৎস আত্মিক কল্যাণের কামনা, ১১শতকে জীমূতবাহন এই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

বিবাহ ও পরিবারের জৈবিক এবং বংশবাদী (Racial) ব্যাখ্যাও আছে। বিবাহ যে জৈবিক বৃত্তির স্বাভাবিক প্রকাশ এবং এই বৃত্তিরই যে পরিণতি পরিবার-প্রথা, তাহা অনস্বীকার্য। রক্তের প্রভাব বিবাহকে আদি

* "Also, the primitive family organisation cannot be understood before the primitive religious beliefs are known ; for the latter serve as the basis of the former." (Durkheim, 106 p.p).

কালেও বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। বংশের গণ্ডী অসভ্যও নানাভাবে মানিয়া তাহার যৌন জীবনকে পরিচালিত করে। আধুনিক কালে সুপ্রজননবাদীরা (eugenist) বিবাহকে বংশ ও রক্তের দ্বারাই ষোলআনা নিয়ন্ত্রিত করিতে চায়। বিবাহে মনস্তত্ত্ব, ভাববৃত্তি ও নৈতিকতার স্থান ও গুরুত্ব তাহারা স্বীকার করেন না।

বিবাহের আর্থিক ব্যাখ্যাও এই ধরণের নানা ব্যাখ্যার মধ্যে অন্যতম। পশুপালন হেতু ধনবৃদ্ধি এবং ধনবৃদ্ধি হেতু স্বার্থবুদ্ধি ও সন্তানপ্রীতি উদ্ভূত হইয়াছে, এই যুক্তি ও কল্পনা অবাস্তব। মর্গান-মার্ক্সীয় মতে অর্থশক্তির প্রভাবই বিবাহ ও পরিবার সৃষ্টি করিয়াছে। গোধন বৃদ্ধি হওয়াতেই গোষ্ঠীপতিদের মনে লোভ হইল এবং সামাজিক সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রবর্তন তাহারা করিলেন, এতত্ত্ব আজ স্বীকার করা চলেনা। ব্যক্তি-সম্পত্তি হইতে এক-বিবাহ উৎপন্ন হইয়াছে এবং ব্যক্তি-সম্পত্তির উদ্ভবের পূর্বে যৌথ সম্পত্তি প্রচলিত ছিল। যৌথসম্পত্তির যুগে বিবাহও যৌথবিবাহ (group marriage) ছিল। সম্পত্তি-প্রথার সহিত বিবাহ প্রথার এই অচ্ছেদ্য যোগ মর্গানী ব্যাখ্যার প্রধান কথা।

কিন্তু মানুষের জীবনকে ব্যাখ্যা করিতে কেবল আর্থিক ব্যাখ্যাই যথেষ্ট নয়। অর্থশক্তি, জৈবিক বৃত্তি, বংশ-প্রভাব, ভূগোল, সমাজপ্রথা, যৌনবৃত্তি, এই সব বৃত্তির প্রভাব ও পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাতের ফলেই বিবাহ ও পরিবার রূপ গ্রহণ করিয়াছে। মানুষের মনে ও দেহে বিবিধ বৃত্তি ক্রিয়াশীল। আদিম কালেও মৌলিক বৃত্তিগুলি তেমনি ছিল। আজিও বহু বৃত্তি ও শক্তির কাজ অব্যাহত রহিয়াছে। আর্থিক পরিবেশের মত ভৌগোলিক, ধার্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের প্রভাবও গভীর।

এই কারণে একবাদী ব্যাখ্যাগুলি একপেশে। বিবাহ ও পরিবারের ব্যাখ্যায়ও বহুবাদী ব্যাখ্যাই বিজ্ঞান-সম্মত। বিবাহের মধ্যে স্নেহ-

বাৎসল্য-মমতা-প্রেম প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি যেমন রহিয়াছে, বংশরক্ষার জৈবিক তাগিদ ও যৌনবৃত্তির প্রবল দাবিও তেমনি ভাবে ইহার পিছনে রহিয়াছে। শুধু তাই নয়। সমাজ রক্ষার স্বার্থ ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনও বিবাহের একটা উপাদান, পরিবার প্রথার একটা অঙ্গ। মানুষ কেবল অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি বা সম্পত্তি রক্ষার জন্যই বিবাহ করিয়া পরিবার বাধে না। তাহার মনোলোকের প্রয়োজন, অধ্যাত্ম জীবনের তৃষ্ণাও বিবাহ ও পরিবারের মধ্যেই ব্যঞ্জনা প্রাপ্ত হয়। বাৎসল্য ও প্রেম, এই দুই বৃত্তির মধ্যে তাহার আত্মার সম্প্রসারণ ঘটে, তাই পরিবার ও বিবাহের আধ্যাত্মিক সার্থকতাও এই দুই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম ভিত্তি। কথা উঠিতে পারে, আধুনিক পরিবারের ও বিবাহের মধ্যে এই সব উন্নত বৃত্তির প্রভাব থাকিলেও আদিম মানুষের জীবনে এসব বৃত্তির চিহ্নও ছিল না। এ সম্বন্ধে একথা বলা চলে যে আদিম মানুষ ও আধুনিক মানবের মধ্যে কৃষ্টির পার্থক্য থাকিলেও মৌলিক বৃত্তিগুলি সর্বকালের মানুষেই আছে। আদিম মানুষের সহিত সভ্য মানুষের দুস্তর ব্যবধান কল্পনা করার কোন বৈজ্ঞানিক কারণ নাই। বিজ্ঞান এই ব্যবধান স্বীকার করে না। এ সম্বন্ধে ম্যালিনাউস্কী, ওয়েস্টারমার্ক, গিন্‌স্‌বার্গ, ফ্রেজার, লাউয়ী প্রমুখ সকল নৃতাত্ত্বিকই একমত। বহুবাদী ব্যাখ্যাই বিজ্ঞানীরা যুক্তিসম্মত মনে করেন। এসম্বন্ধে বিখ্যাত পণ্ডিত গিন্সবার্গের একটা কথা তুলিয়া দিতেছি। গিন্সবার্গ বহুবাদী ব্যাখ্যাই যে বিজ্ঞান-সম্মত তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন। তাঁহার ভাষায়, "বিশেষজ্ঞগণ স্বভাবতই িনি সমাজজীবনের যে দিক ও অঙ্গকে লইয়া গবেষণা করিয়াছেন তিনি সেই দিক ও অঙ্গকেই বেশী গুরুত্ব দান করিয়া থাকেন। রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ রাষ্ট্রকেই গোটা সমাজ বলিয়া মনে করেন, আর্থিক ইতিহাসজ্ঞ সর্বত্রই অর্থনীতিকে দর্শন করেন। জীবতত্ত্বজ্ঞ বংশতত্ত্ব এবং জনন-

তত্ত্বের ব্যাপারগুলিকেই গুরুত্ব দেন। মনোবিকলনবাদী মানবজীবনের সর্ব সমস্যার সমাধান খোঁজেন অবচেতনের দুর্বোধ্য ক্রিয়াকলাপের মধ্যে। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীকে আজ বুদ্ধি ও বিজ্ঞানরাজ্যের প্রচলিত ফ্যাশানগুলির জবরদস্তিকে প্রতিরোধ করিতে হইবে এবং **সমাজ-জীবনের মৌলিক ঐক্যের মূলে যে বহুবিধ শক্তির ক্রিয়া রহিয়াছে** তাহাদের প্রত্যেকটি শক্তির যথাযথ মর্যাদা দিতে হইবে।" *

অগণিত শক্তির প্রভাব রহিয়াছে। তাহার প্রত্যেকটিরই ক্রিয়াকে স্বীকার করিতে হইবে। কেবল অর্থশক্তিই নয়, কেবল যৌনশক্তিই নয়, বহু শক্তির সমবেত ক্রিয়াফল বিবাহ ও পরিবারের মূলে রহিয়াছে। তাই বিবাহ ও পরিবারের আর্থিক ব্যাখ্যাও একদেশদর্শী।

তারপরে মর্গানী ছক বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশকে যে স্তর-পর্যায়ে বাঁধিয়া দিয়াছে তাহা সমাজবিজ্ঞান আজ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

* "The specialist very naturally tends to give prominence to the factors of social life of which he has made close study. The student of politics tends to identify the state with the whole of society, the economic historian to see the economic factor everywhere, the Psycho-Analyst to seek the solution of all human problems in the mysterious working of the unconscious, the biologist to stress the genetic and racial factors. It is the duty of the sociologist to resist the tyraneous intellectual fashions of the day and to give due weight to each of the numerous factors which enter into the unity of social life." (Ginsberg II.)

পাঁচটি ধাপের মধ্য দিয়া প্রত্যেক সমাজকে যাইতে হইয়াছে ও হইবে, এই মতবাদ আধুনিক গবেষণা খণ্ডন করিয়াছে। নির্দিষ্ট ও অনড় কয়েকটি স্তরের মধ্য দিয়া বিবর্তন ঘটিবে, এই মতবাদকেই একরৈখিক (unilinear) বিবর্তনবাদ, বলা হইয়া থাকে। এই বিবর্তনবাদ কোনও সমাজবিদ-ই স্বীকার করেন না। লেনিন মার্ক্স-মর্গানী বিবর্তনকে ঘূর্ণিক বা spiral বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মার্ক্সীয় বিবর্তন রৈখিক। প্রত্যেক সমাজ যদি একই স্তরের মধ্যদিয়া বিবর্তিত হয় তবে তাহাকেই রৈখিক বিবর্তন বলা চলে। মার্ক্স মর্গানী বিবর্তনও তাই একরৈখিক। কিন্তু একরৈখিক ক্রমবিকাশ আজ বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরিত্যজ্য হইয়াছে।

সমাজবিকাশ কোন নির্দিষ্ট বাঁধা পথে কখনো অগ্রগতির দিকে যায়না। বিবিধ শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে বিচিত্র পথে ক্রমবিকাশ বহিয়া চলে। ১৯শত'কে মর্গান বিবর্তনের একটা ফর্মূলা বাঁধিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তি তথ্যসংগ্রহ ও গবেষণায় এই ফর্মূলা কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে। রৈখিক বিবর্তন আজিকার যুগে অচল। বোয়াস্ (Boas), রিভার্স (Rivers), গোল্ডেনবাইজার, বিসলার (Wissler), লাউয়ী (Lowie), ক্রোয়েবার (Kroeber), সোয়ানটন (Swanton), স্টার্ক (Starcke), গ্রসে (Grosse), ওয়েস্টারমার্ক (Westermarck), প্রভৃতি নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতত্ত্ববিদ্গণ রৈখিক বিবর্তনকে খণ্ডন করিয়াছেন।

সাধারণভাবে মার্ক্স-মর্গানী বিবর্তনবাদ যে বিজ্ঞানগ্রাহ্য নয় তাহা দেখান হইল। একদিকে আর্থিক ব্যাখ্যা একপেশে, অন্যদিকে রৈখিক বিবর্তন এবং নির্দিষ্ট ধাপ বা স্তরপর্যায়-ও বিজ্ঞান-বিরোধী ইহা আলোচিত হইল। এখানে মর্গানী ধাপগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

পাঁচটী মর্গানী ধাপের প্রথম ধাপ বা স্তর অবাধ-সংসর্গ যুগ (promiscuity)। আদিম যুগের প্রথম মানুষ যৌন নিষেধ বা সংযমের ধার ধারিত

না, অবাধ যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা সে যুগের সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য, পিতামাতা ভাইবোন, কোন সম্বন্ধই যৌন সংসর্গের বাধা হইত না। মর্গানী ছকের ভিত্তিই হইল এই অবাধ সংসর্গ স্তর। এই স্তরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে তবেই অন্যান্য স্তর স্বীকার করিবার অর্থ হয়। এই স্তর স্বীকার না করিলে মর্গানী ছক ভাঙ্গিয়া পড়ে। কার্যতঃও তাহাই হইয়াছে। আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান এই স্তর মোটেও স্বীকার করে নাই। মর্গানের কল্পনাপ্রবণতাই এই স্তরকে কল্পনা করিয়া লইয়াছে। পৃথিবীর কোথাও কোন অসভ্য সমাজে এই স্তরের কোন চিহ্নমাত্রও পাওয়া যায় না। মর্গান ও এঙ্গেল্‌স্ তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এঙ্গেল্‌স্ বলেন, "এই স্তরের সামাজিক ধ্বংসচিহ্ন খুঁজিয়া বাহির করিয়া আজ ইহার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করার আশাই করা যায় না"।*

ইহার কোন চিহ্নই কোথাও নহে। তবে মর্গান ইহার অস্তিত্ব কোথায় পাইলেন? মর্গান নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে ইহা 'অনুমান' করিয়া লইতে হইয়াছে।*

যে সব কারণের উপর নির্ভর করিয়া মর্গান এই অনুমান করিয়াছেন তাহা বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ওয়েস্টারমার্ক সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার 'মানববিবাহের ইতিহাস' এই সম্বন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থ। তাহা ছাড়া অগণিত সমাজবিদ এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই অবাধ-সংসর্গ-স্তরকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। যে কয়টি যুক্তি মর্গান দিয়াছেন তাহা সবই বাতিল হইয়া গিয়াছে।

---

* "We can hardly expect to prove its existence directly by discovering its social fossils among backward savages" (p 31 Engels I).

* "Promiscuity may be deduced theoretically as a necessary condition." (Morgan, P 509).

প্রথমতঃ মর্গান প্রচলিত আত্মীয়তা-সম্বন্ধসূচক সম্বোধন-শব্দগুলির একপ্রকারের ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন যে পূর্বে একদা এই সব সম্বোধনের বাস্তব ভিত্তি ছিল। হাওয়াই দ্বীপের অধিবাসীরা এক পুরুষের নরনারী সকলেই ভাইবোন এবং তাহাদের পিতামাতার সমবয়সীদের সকলকেই 'মা-বাবা' বলিয়া সম্বোধন করে। ইহা হইতেই মর্গান অনুমান করিয়াছেন যে একদা এইসব ভাইবোনেরা সত্যিকার ভাইবোনই ছিল এবং ইহাদের পিতামাতারাও একদা সকলেই সকলের যৌথ স্বামিস্ত্রী ছিল। অর্থাৎ একদা সম্পূর্ণ বাধানিষেধহীনভাবে যৌন উচ্ছৃংখলা বিদ্যমান ছিল। হাওয়াই সম্বোধনপদ্ধতিকে প্রাচীনতম পদ্ধতি ধরিয়া লইয়া এই ধরণের ব্যাখ্যাপ্রণালীর সাহায্যে মর্গান তাঁহার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা-প্রণালীকে বলা হয় "সম্বোধনশব্দের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা" (sociological interpretation of kinship terms). এই ব্যাখ্যারীতিকে কিছু বদলাইয়া আধুনিক কালে রিভার্স (Rivers) নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যারীতি যে অযৌক্তিক তাহা ওয়েস্টারমার্ক, ক্রোয়েবার এবং লাউয়ী অকাট্যভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। এমন কি রিভার্স-ও একথা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার কথা, "মর্গানের অবাধসংসর্গ মতবাদ যে সত্য তাহা বিশ্বাস করিবার কোনই কারণ নাই। হাওয়াই-রাই মানব সমাজের আদিম অবস্থা ও স্তরের প্রতিনিধি, মর্গানের এই প্রথম অনুকল্প বা অনুমানই বরং সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।"*

---

* "There is no reason to believe that Morgan's theory of an original promiscuity is correct. On the contrary. as has already been seen, his initial assumption that the Hawaian represent a primitive stage of human society is entirely unfounded." ('Social Organisation', Rivers 18 pp.)

দ্বিতীয়তঃ মর্গান অপর একটি ব্যাখ্যারীতিও অবলম্বন করিয়াছেন। সেটিও নিছক কাল্পনিক। এই রীতিকে বলা হয় উদ্বর্তন-নীতি বা doctrine of survival. কতকগুলি যৌনপ্রথা বর্তমান কালের অসভ্যদের মধ্যে দেখা যায় যাহার মধ্যে যৌন উচ্ছৃংখলার আভাস পাওয়া যায়, যথা পত্নী ধার দেওয়া প্রথা। এই ধরণের প্রথাগুলি হইতে মর্গান অনুমান করিাছেন যে ইহারা আদিম অবাধসংসর্গস্তরের ধ্বংসাবশেষ বা Survival। আদিম উচ্ছৃংখলতা কমিতে কমিতে এই সব প্রথা বর্তমানেও রহিয়া গিয়াছে।

এই ব্যাখ্যারীতি বা উদ্বর্তন-ন্যায়ও যে একপেশে এবং ভুল তাহাও আধুনিক সমাজতত্ত্ব প্রমাণ করিয়াছে। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, এই সব প্রথা বিবাহপ্রথারই বিকৃতি। আদিকালেও এক-বিবাহ প্রথাই প্রচলিত ছিল। সেই প্রথারই স্থানকালজনিত বিকৃতি ঘটিয়া এই সব অস্বাভাবিক যৌন রীতি পৃথিবীর বহুস্থানে দেখা দিয়াছে। এই প্রথাগুলি সম্বন্ধেও সমাজ-বিজ্ঞানীরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহার ফলে এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ, মর্গান দুইটি টাবু বা যৌননিষেধের প্রচলনকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার ছকটী গড়িয়াছেন। প্রথম নিষেধ হইল "পিতামাতা-সন্তান টাবু" (parent-children tabu) এবং দ্বিতীয় নিষেধ হইল "ভাইবোন টাবু" (brother-sister tabu). অবাধ সংসর্গস্তরে প্রথম আবির্ভূত হইল প্রথম টাবুটী। ফলে উদ্ভব হইল সমশোণিত (consanguine) বিবাহের। কিছুকাল পরে আবির্ভাব ঘটিল দ্বিতীয় টাবুটীর ; ফলে উদ্ভূত হইল পুনালুয়া বিবাহ। যুগযুগান্ত-ব্যাপী যৌন উচ্ছৃংখলতার মধ্যে অকস্মাৎ কেন এই দুইটী নিষেধের বা টাবুর উদ্ভব হইল ত'হার যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা মর্গান দিতে পারেন নাই। যে ক্রম এবং স্তরপর্যায় তিনি কল্পনা করিয়াছেন তাহা বাস্তব

তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত হয় না। প্রাণীজগতের যৌনজীবন সংক্রান্ত তথ্যও মর্গানী ছককে খণ্ডন করে। ওয়েস্টারমার্ক এসম্বন্ধে বিস্তৃত ও অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। রবার্ট ব্রিফল্ট (Robert Briffault) নামক নৃতত্ত্ববিদ একালে মর্গানী মতকে কিছু সংশোধন করিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন। ওয়েস্টারমার্ক এই চেষ্টার যৌক্তিক জবাব দিয়া ব্রিফল্টের মতকে খণ্ডন করিয়াছেন। লাউয়ী প্রমুখ আধুনিক নব সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতারা এসম্বন্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ উপস্থিত করিয়া মর্গানকে খণ্ডন করিয়াছেন।

তারপর মর্গানী ছকের দ্বিতীয় স্তর হইল "যৌথ বিবাহ" (group marriage). প্রথম ধরণের যৌথবিবাহের—বা সমশোণিত বিবাহ—ইহাও একটা স্তর হিসাবে স্বীকৃত হয় নাই। এই স্তরেরও কোন বাস্তব চিহ্ন বা প্রমাণ পৃথিবীতে নাই। মর্গান পূর্বোল্লিখিত ব্যাখ্যারীতিকে—উদ্বর্তননীতি ও সম্বোধন শব্দের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা—অবলম্বন করিয়া এই ধরণের সার্বজনীন স্তর কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। দ্বিতীয় ধরণের মর্গানী যৌথবিবাহ 'পুনালুয়া বিবাহ' ও আধুনিক সমাজতত্ত্বে স্তর বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। তবে একথা ঠিক যে পৃথিবীতে কয়েকটী জাতির মধ্যে কোন প্রকারের যৌথ যৌন সংসর্গ দেখা যায়। মধ্য অস্ট্রেলিয়া ও উত্তরপূর্ব সাইবেরিয়ায় দেখা যায়, বিবাহিত স্বামী স্ত্রী পরপুরুষ ও পরনারীর সহিত বিশেষ বিশেষ অবস্থায় যৌনসংসর্গের অধিকারী। কিন্তু গোল্ডেনবাইজার ও লাউয়ী এসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে এইসব প্রথা আদিম নহে। একবিবাহেরই সীমার মধ্যে এই সব উচ্ছৃংখলতা বা যৌন অধিকারের সম্প্রসারণ সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। ইহা বিবাহের সম্প্রসারণ বা স্থানীয় বিকৃতি মাত্র। গোল্ডেনবাইজার বলেন, "এই প্রথা সর্বদাই খুব সীমাবদ্ধ। প্রকৃত স্বামী-স্ত্রী অন্যান্য যৌনসঙ্গীদের থেকে সর্বদাই স্পষ্টভাবে পৃথক ও স্বতন্ত্র থাকে। স্বামীস্ত্রীর অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা এবং তাহাদেরকে সম্বোধন

করিবার পৃথক পরিভাষা সর্বদাই প্রখরভাবে স্পষ্ট।*" ইহা ছাড়াও যৌন জীবন যদি কোথাও যৌথ আকার ধারণ করিয়াও থাকে, তবে তাহা ব্যক্তিগত বিবাহ ও পরিবারেরই বিকৃতি ঘটিয়া হইয়াছে। রিভার্স পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন যৌথবিবাহের প্রমাণ নাই।†

তারপরে মর্গানী ছকের অপর ভিত্তি ও যুক্তি হইল মাতৃক্রম ও পিতৃ-ক্রমের স্তরপর্যায়। এই মতে মাতৃক্রমই (matriliny) আদিমতম এবং পরবর্তিকালে পিতৃক্রমের (patriliny) উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু মর্গানী ছকের ভিত্তি অবাধসংসর্গ ভাঙ্গিয়া পড়ায়, তাহা হইতে উদ্ভূত এই বংশ-নির্ণয় পদ্ধতির ক্রমও ভিত্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। স্টার্ক, গ্রস, এবং ওয়েস্টারমার্ক প্রমাণ করিয়াছেন যে ব্যক্তিগত পরিবারপ্রথাই আদিমতম এবং অধিকতর সার্বজনীন। পূর্বে পরিবারপ্রথাই ছিল। পরবর্তিকালে এইসব গোষ্ঠীপ্রথা—পিতৃক্রমী গোষ্ঠী (gens) ও মাতৃক্রমী গোষ্ঠী (clan)—উদ্ভূত হইয়াছে। পরিবার হইতেই গোষ্ঠীর জন্ম হইয়াছে। মর্গানের মতে গোষ্ঠীই পূর্বতর এবং গোষ্ঠী হইতেই পরিবারের উৎপত্তি হইয়াছে। মর্গানের গোষ্ঠী-পরিবার ক্রম উপরোক্ত পণ্ডিতেরা খণ্ডন করিয়াছেন। পরবর্তিকালে আমেরিকার নবসমাজবিজ্ঞানী সম্প্রদায় বিস্তৃত তথ্যসংগ্রহের দ্বারা মর্গানের মতকে ভ্রান্ত প্রমাণ করিয়াছেন। তাহারা দেখাইয়াছেন যে পরিবার পৃথিবীর সর্বত্র অসভ্যদের মধ্যে প্রচলিত আছে। পরিবার নাই, এমন

* "The custom is always strictly circumscribed ; the true husbands and wives are, moreover, invariably distinguished, both in status and terminologically, from the other mates." (Goldenweiser).

† "But we have no conclusive evidence that such a form of marriage exists or has ever existed." ('Social Organisation', Rivers. p 45).

জাতি নাই, সমাজ নাই। কিন্তু গোষ্ঠী-প্রথা নাই, তেমন সমাজ ও জাতি বিদ্যমান রহিয়াছে। সোয়ানটন (Swanton) দেখাইয়াছেন যে এস্কিমো আথাবাস্কান (Athabascan), সলিশ (Salish) প্রভৃতি জাতির মধ্যে মাতৃক্রমী বা পিতৃক্রমী গোষ্ঠীর কোন চিহ্নও নাই। এ-ছাড়া উত্তর আমেরিকার শুধু ইরোকোয়', হোপী (Hopi), জুনী (Zuni), প্রভৃতি উন্নততর জাতির মধ্যেই কেবল মাতৃক্রমী গোষ্ঠী এবং মাতৃকেন্দ্রিক বংশক্রম-প্রথা প্রচলিত আছে। কাজেই মাতৃক্রমই প্রাচীনতর প্রথা এ মর্গানী মত গ্রহণযোগ্য নয়।

রিভার্স'ও স্বীকার করিয়াছেন যে মাতৃসত্ত্ব বা মাতৃক্রমই আদিম তাহা বলা যায় না। তাঁহার মতে পিতৃক্রম বা মাতৃক্রম কোন্‌টী আদিমতর তাহা নির্ণয় করা শক্ত। কিন্তু পরিবার প্রথা যে সার্বজনীন তাহা রিভার্স ও স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার ভাষায়, "পরিবার প্রথা হইল একটা মৌলিক প্রতিষ্ঠান। এই আদিম মৌলিক প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর সকল রকম সমাজেই ক্রিয়াশীল রহিয়াছে।"†

লাউয়ী প্রমুখ পণ্ডিতদের মতই আজ সর্বজন-গ্রাহ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে মাতৃক্রম হইতে পিতৃক্রম উদ্ভূত হইয়াছে তাহা সম্ভব; কিন্তু সর্বত্র সর্বকালে এই ক্রমকে অনুসরণ করিয়া বিবাহেরও পরিবর্তন কেন হইবে তাহার কোন যুক্তিই মর্গানীরা দেন নাই। সকল দিক হইতে বিবেচনা করিয়া লাউয়ীপ্রমুখ নৃতত্ত্ববিদগণ বহুবাদী ব্যাখ্যাকেই গ্রহণ করিয়াছেন। কোন একটিমাত্র শক্তির প্রভাবে কোন একটী মাত্র ক্রমকে অনুসরণ করিয়া লৌহকঠিন বাঁধা সড়কে সমাজবিবর্তন অগ্রসর হইয়াছে, এই ভ্রান্ত মত ও

† "The fundamental institution of the family thus plays its part in all forms of society." ('Social Organisation', Rivers pp 40).

গোঁড়ামি আজিকার সমাজতত্ত্ব মানে না। বহু শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে নানা বিচিত্র কুটিল পথে বিবর্তন অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, ইহাই বিজ্ঞান-সম্মত মত। এই কারণে মার্ক্স-মর্গানী বিবাহ ও পরিবারের ছক গ্রহণযোগ্য নয়।

পরিবার ও বিবাহের ভবিষ্যৎ

পরিবার ও বিবাহের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে মর্গানী ছক ভ্রান্ত। কাজেই স্বভাবতই পরিবারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মার্ক্সীয় মতামতও ভ্রান্ত প্রমাণ হয়। এখানে মর্গানের সঙ্গে মার্ক্সবাদের কিছু পার্থক্য আছে। মর্গান এক-বিবাহী পরিবারই ভবিষ্যতের সার্বজনীন প্রথা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু মার্ক্সবাদীরা বলেন, পরিবার ও একবিবাহ ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হইবে। সম্পত্তিপ্রথার সঙ্গে অচ্ছেদ্য যোগ কল্পনা করার জন্যই এই সিদ্ধান্ত মার্ক্সবাদকে নিতে হইয়াছে। সম্পত্তিপ্রথা বিলুপ্ত হইলে বিবাহপ্রথা ও পরিবার বিলুপ্ত হইবে।

মার্ক্সবাদী এই মতও ভ্রান্ত প্রমাণ হইয়াছে। কারণ আর্থিক ব্যাখ্যা বিজ্ঞান কর্তৃক অগ্রাহ্য হওয়ায় অর্থনৈতিক কারণে বিবাহ-বিলুপ্তিও অযৌক্তিক প্রমাণ হয়। পরিবার ও বিবাহ বহু কারণের সমবেত ফল। কাজেই কেবল আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্তনে ও সম্পত্তিপ্রথার বিলুপ্তি দ্বারা বিবাহ ও পরিবার বিলুপ্ত হইতে পারে না। বর্তমান রাশিয়ায় সম্পত্তি বিলুপ্ত হইলেও বিবাহ ও পরিবার লুপ্ত হয় নাই। ইহাও বহুবাদী ব্যাখ্যার সমর্থন করে। পরিবার রূপান্তর প্রাপ্ত হইবে কিন্তু বিলুপ্ত হইবে না। **এই মতই বিজ্ঞান-সম্মত। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মার্ক্সবাদী মতামতও কাল্পনিক।** *

---

* বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থকারের "বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ" নামক অধুনা প্রকাশ্য পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

সাহিত্যে শ্রেণীবাদ

সাহিত্য নিয়েও আজ তর্ক উঠেছে। যেমন তর্ক উঠেছে জীবনের অন্যান্য সব কিছু নিয়ে। এ তর্কটা হলো আরো একটা বড়ো তর্কের অংশ মাত্র। সেই আসল তর্কটা হলো মানুষের জীবন সম্বন্ধে, মানুষের সংস্কৃতি সম্বন্ধে। তর্কটা প্রবল হয়ে উঠেছে, কারণ সংশয় ও প্রশ্নও প্রখর হয়ে উঠেছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আজ প্রশ্নের দ্বারা আকীর্ণ; সর্বত্রই আঁকা রয়েছে বড় বড় অগণিত প্রশ্নবোধক চিহ্ন যাকে ওয়েল্‌স্ সাহেব বলেছেন এ যুগের মশার ঝাঁক, 'mosquitoes of modern world'. এরা ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের আক্রমণ করেছে এবং প্রশ্নের মশকদংশনে আমরা আজ সংশয়বিষে জর্জরিত হয়ে উঠেছি,—'now they swarm on every path and infect us with a fever of doubt.' (Wells)। এই তাড়নায় আমরা আরম্ভ করেছি বিচার, বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান। এরই ফলে ঘটছে আমাদের আদর্শের দ্রুত রূপান্তর। আমরা সমাজ ও রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে গড়তে চাই। কিন্তু ভাঙ্গাগড়ার পরিকল্পনা নিয়ে মতভেদ আছে। এবং মতভেদ থেকেই দলভেদের উৎপত্তি হয়েছে। সমাজনীতি ও রাজনীতিতে বিভিন্ন দলের সংঘর্ষ আজ সাহিত্যেও এসে পড়েছে, কারণ সাহিত্য সমাজনীতির এলাকার অন্তর্ভুক্ত। সাহিত্যিককেও তাই পলিটিশিয়ান ও সমাজতাত্ত্বিক হয়ে বিতর্কের আসরে নামতে হয়েছে।

কথা উঠেছে সাহিত্যের মূল্যবিচার নিয়ে, সাহিত্যের স্বরূপ নিয়ে। একদল বলছেন সাহিত্যের কারবার হলো ব্যক্তি নয়, সমষ্টির জীবন এবং সাহিত্য হলো সমাজ-বিপ্লবের যন্ত্র মাত্র। কথাগুলো পুরাণো নয়, এবং অনেকেই ইতিপূর্বে একথা বলেছেন। কিন্তু একটা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে

একদল আজ কথাগুলো বলছেন। এরা হলেন মার্ক্সবাদী এবং একটা স্পষ্ট সমাজনৈতিক মতবাদের ভিত্তিতে এরা সর্বত্র দল গঠন করেছেন। এই দল একটা বিশিষ্ট মানদণ্ডে সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবনকে বিচার করে কতকগুলো সিদ্ধান্তকে উপস্থিত করেছেন। সাহিত্য সম্বন্ধেও এদের একটা সিদ্ধান্ত গড়ে উঠেছে এবং এ সিদ্ধান্ত তাদের সমাজতাত্ত্বিক মতবাদেরই একটা প্রয়োগ বই আর কিছু নয়। মার্ক্সীয় সাহিত্য মানেই হলো মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্ব. এবং সে সাহিত্যের বিচারে মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্বকেই বিচার করতে হবে। এ বিচারে মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্ব যেমন সঙ্কীর্ণদৃষ্টি বলে প্রতিপন্ন হয়, তেমনি মার্ক্সীয় সাহিত্যও প্রতিপন্ন হয় একদেশদর্শী বলে।

মার্ক্সীয়দের প্রথম সিদ্ধান্ত হলো সাহিত্যের বিষয়বস্তু নিয়ে। ব্যক্তির সুখদুঃখ, ব্যক্তির জীবন নিয়ে যে সাহিত্য তা এই মতে অপাংক্তেয়। ওরা বলছেন, এ যুগের সাহিত্য হবে সমষ্টির ব্যাপক ও বহুজনীন সুখদুঃখ নিয়ে। আর এ সমষ্টি বলতে মার্ক্স-বাদী বোঝেন একটি বিশেষ ধরণের সমষ্টিকে —; মানে, শুধু কিষাণমজুরের গোষ্ঠীকে। এই হলো মার্ক্সীয় শ্রেণীবাদ ; সমাজ দুটো অর্থনৈতিক শ্রেণীতে বিভক্ত, একদিকে ধনিক এবং অন্যদিকে কিষাণ-মজুর। সভ্যতার ইতিহাসই হলো এই দুপক্ষের লড়াইর ইতিহাস ; যে যুগে যে পক্ষ প্রবল হয়ে রাষ্ট্রশক্তিকে দখল করে সেই বিজয়ী প্রবল পক্ষই সেই যুগের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। কোন্ পক্ষ বিজয়ী হবে তাও কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তদানীন্তন অর্থনৈতিক শক্তিসংঘাতের দ্বারা। কাজেই (১) অর্থনীতিই মানুষের ও সমাজের প্রেরক ও নিয়ন্ত্রক (economic determinism), (২) অর্থনীতি সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে শ্রেণীবৈরাজ্যের মধ্য দিয়ে (class dichotomy), (৩) বর্তমান যুগ হলো ধনিকপ্রতিপত্তির যুগ ; বুর্জোয়া শাসন, সভ্যতা ও সাহিত্যের যুগ, এ যুগে কিষাণ-মজুরের জিহাদ শেষ হবে ধনিকের মহতী বিনষ্টিতে এবং কিষাণ-মজুরের অনিবার্য বিজয়ে (inevitability of classless society),

(৪) অনিবার্যতার প্রমাণ ও গ্যারান্টি হলো হেগেলীয় ডায়ালেকটিক নীতি (৫) এই নীতির ফল হবে বর্ত্তমান কালের বিলীয়মান বুর্জ্জোয়া বা ধনিক সাহিত্যের (ও সভ্যতার) পরিবর্তে উদীয়মান শ্রেণীর (কিষাণমজুরের) শ্রেণী-সাহিত্য বা প্রলেটারীয় গণ-সাহিত্যের অসপত্ন প্রতিষ্ঠা (decadence of bourgeois & the rise of proletarian literature)। এই পাঁচটি সিদ্ধান্তকে ছেঁকে চুম্বক আকারে মার্ক্সবাদীদের বক্তব্য দাঁড়াল এই যে, কেবলমাত্র কৃষাণ-মজুরের শ্রেণী-জীবনকে নিয়েই চলবে নবযুগের সাহিত্যসৃষ্টি। কিংবা কিষাণমজুরের স্বার্থের দিক থেকে যে সাহিত্য রচনা হবে তাই হবে সত্যিকার যুগসাহিত্য।

এই মতের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান বক্তব্য হল এই যে, ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যের বিরোধটি নিতান্ত কাল্পনিক বই কিছু নয়; এদের পরস্পরের যোগাযোগটি অতি নিবিড়, এবং একে অন্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এরা চিরকাল জড়াজড়ি করে আছে। তাছাড়া এদের পরস্পরের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব তো নেই-ই, বরং এককে বাদ দিয়ে অপর ক্ষণকালও বাঁচতে পারে না। ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে একটা চিরকম্প্র ভারসাম্য রক্ষিত হয়ে আসছে সমাজ-জীবনের প্রত্যেক স্তরে। সেই ভারসাম্যটার বিচ্যুতি ঘটলেই সমাজ-জীবনে ঘটে বিপ্লব। সামাজিক ক্রমবিকাশের একটা গতি আছে, সেই গতিমুখে কথনো কোনো দিকে আতিশয্য হলেই ভারচ্যুতি ঘটে থাকে। তাই কোন যুগে ব্যষ্টির ওপরে পড়ে জোর, ব্যক্তিবাদ হয় প্রবল; কোনো কালে সমষ্টির ঘটে প্রাবল্য, গোষ্ঠী হয়ে দাঁড়ায় প্রধান। ১৯ শতকে ব্যক্তিতন্ত্রবাদ চরমে উঠেছে, যার ফলে ধনতন্ত্র ও স্বার্থপূজার জয়জয়কার আরম্ভ হয়েছে। আজ তার প্রতিক্রিয়ার মুখে সমাজতন্ত্র এসেছে, এসেছে সমষ্টির ডাক; অবাধ ব্যক্তিপ্রাধান্যকে খর্ব করবার রব উঠেছে চারদিকে। ব্যক্তিকে টিপে মারতে হবে, কারণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আজ আসামী, সভ্যতা ও সাহিত্য উভয়েরই আদালতে। তাই আজ কম্যুনিস্ট চান এমন সাহিত্য

যথানে ব্যক্তির স্থান নেই, যেখানে শ্রেণীরূপী সমষ্টির হবে ষোড়শোপচার জা। কিন্তু চাইতে গিয়ে মার্ক্সবাদী হয়ে পড়েন ভাবপ্রবণ এবং আতিশয্য দোষে তার সিদ্ধান্ত হয়ে পড়ে একদেশদর্শী। তবে মার্ক্সীয় মতবাদের কোন স্থায়ী, প্রামাণ্য ব্যাখ্যান নাই; মার্ক্সবাদের ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে মার্ক্সবাদীদে, ধ্যেও নানা মুনি আছেন। তবে যারা গোড়া সম্প্রদায় তাদের কথাই এখানে হচ্ছে। (১) মিঃ আপওয়াড (Upward), (২) মিঃ রাল্‌ফ্ ফক্স Ralph Fox), (৩) মাইকেল গাল্ড (Michael Gold), মিরস্কী Mirskv) (৪) ক্রিস্টফার কড্‌ওয়েল (Christopher Caudwell) ৫) গ্রেন্‌ভিল হিক্স প্রমুখ লেখক এই গোড়া শ্রেণীবাদের সমর্থক। এঁদের মতে ব্যক্তি হিসাবে মানুষের কোনো মূল্য নাই, শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবেই তার অস্তিত্ব ও ব্যবহারের অর্থ আছে। এঁদের এই গোড়ামী ও আতিশয্য হলো ১৯ শতকীয় ব্যক্তিপ্রাধান্যের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক প্রতিক্রিয়ার ফল। এরা বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিক প্রগতির দিকে চোখ বন্ধ করে আছেন। মানুষের মন যে একটী জটিল মিশ্র সত্বা, তার মানসিকতা যে নানা বর্ণের আলোকসম্পাতে বিচিত্র ও বহুরঙীন একথা এঁরা ভুলে যায়। মানুষের ওপরে তার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাব পড়ে, একথা ঠিক। জীবিকা অর্জনের সূত্রে মানুষ যে পারিপার্শ্বিক নিজের চারদিকে সৃষ্টি করে তার প্রয়োজন ও তাগিদ তার মনকে ও ব্যবহারকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু শ্রেণী-প্রভাব ছাড়াও বহু বিচিত্র অবস্থার প্রভাব তার ওপরে অহরহ কাজ করছে; যেমন তার বংশ, রক্ত ও দৈহিক উত্তরাধিকার (race), যেমন তার দেশ ও কাল,

(১) "The mind in chains" by Upward. (২) "The Novel and the People" by Ralph Fox. (৪) "Illusion and Reality"—by Christopher Caudwell. (৫) "The great tradition"—by Grenville Hicks.

তার পুরুষ-ও-স্ত্রীত্ব বা লিঙ্গভেদ (sex), তার পরিবার-গত স্থান ও পদ-মর্যাদা (status), তার ধর্ম ও জাতি (caste)। সে কেবল ব্যবসায়ীই নয়, ধনিক ও শ্রমিকই নয় ; মঙ্গোলীয় বা নিগ্রো রক্ত তার মধ্যে আছে, তার প্রভাব আজ জনন-শাস্ত্র (genetics) স্বীকার করবে ; সে পুরুষ কি নারী তারও প্রভাব তার মানসিক গড়নকে অনুরঞ্জিত করবে, একথা যৌনশাস্ত্র আজ বলবে ; সে পিতা কি ভ্রাতা কি স্বামী, মাতা কি জায়া কি কন্যা এই পারিবারিক সম্পর্ক-জালের চাপও তার চেতনাকে কিছু আভিভূত করবে, একথা মনস্তত্ত্ব অস্বীকার করে না ; সে নাস্তিক কি আস্তিক কি ফেটীশ-পূজক, তান্ত্রিক কি ইহুদী কি বৈষ্ণব, এসব ব্যাপারের প্রভাবও কম নয়, সমাজতত্ত্ব একথা স্বীকার করবে। মানুষের ব্যক্তিত্ব মিশ্র পদার্থ, তাকে কেবল একটা দিক থেকে, একটা cross section হিসাবে দেখলে, সে দেখা আংশিক ভাবে সত্য হবে। কেবল ব্যবসায়গত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি হিসেবে তাকে দেখলে তার ব্যক্তিত্বের সবটুকু ধরা পড়ে না। ব্যক্তি হিসেবে, মানুষ হিসেবে তার ব্যক্তিত্বের একটা দিক আছে। রাসেল বলেছেন, যার দাঁত ব্যথা হয় সেই জানে ব্যথার অনুভূতিকে ; এ তার একান্ত নিজস্ব ; এখানে প্রত্যক্ষ ভাগ দেবার উপায় যেমন নেই, এখানে অন্য কারুর ভাগ নেবারও পথ নেই। গোলাপ দেখে বা সূর্যাস্ত দেখে যে আনন্দের উপলব্ধি কারুর হয়, তা তারই বিশিষ্ট উপলব্ধি। বাইরের সমাজের সঙ্গে, অপরাপর মানুষের সঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তিরই এক না এক সূত্রে যোগ আছে। কিন্তু সমস্ত মানুষের সঙ্গে সকল যোগসূত্রের বাইরে একটী নিরালা অন্তর্লোক আছে যেখানে অপরের প্রবেশপথ নেই। সেখানে মানুষ একক। বাহির ও ভিতর, এই দুইয়ের সমবায়েই মানুষের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ। এদের একে অন্যের উপরে সততই প্রভাব-পাত করছে, এই অন্যোন্যতাকে স্বীকার করেও ভিতর ও বাহির দুইয়েরই সত্বার স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার না করে উপায় নেই। সমুদ্রবেষ্টিত

দ্বীপ অপর দ্বীপ বা দেশ থেকে পৃথক্, সমুদ্র তাদের মধ্যে অন্তরাল রচনা করে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু সমুদ্র আবার, অন্য দৃষ্টিভঙ্গীতে, দুইয়ের মধ্যে যোগসেতু হিসেবেও রয়েছে। সমুদ্র ব্যবধানও বটে, সংযোগও বটে। তেমনি ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যও যেমন সত্য, তেমনি সত্য তার সমষ্টির অন্তর্ভুক্তি ও সংযোগ। মানুষ যেমন একক ও পৃথক তেমনি মানুষ বহুর সহযোগী এবং সমাজেরও অংশীদার। ব্যক্তির সুখদুঃখও যেমন সত্য, তেমনি সমষ্টিজীবনের সাধারণ সুখদুঃখও সত্য; ব্যক্তি নানা ক্ষেত্রে নানা লোকের সঙ্গে সমান সুখদুঃখের ভাগী; সেই কারণে বহুতর লোকের সঙ্গে ব্যক্তির গোষ্ঠীবন্ধন ঘটে, এবং ব্যষ্টি তাই বিবিধ গোষ্ঠী-জীবনের (group life) অন্তর্ভুক্ত, ফলভাগী এবং প্রভাব-পালিত। তার বিবিধ সম্পর্ক-বন্ধনের মধ্যে কেবল জীবিকাসম্পর্কিত সম্বন্ধ ও সংযোগই তাকে মাটীর ঢেলার মত ষোল আনা গড়ে তুলবে, একথা কোন বিজ্ঞানই সমর্থন করে না। কারণ এ হলো নিছক একদেশদর্শন মাত্র এবং যাকে বলে 'over-simplification' সেই আতিশয্য দোষেরই নামান্তর।

সাহিত্য কেবল মানুষের অর্থনৈতিক শ্রেণী-চরিত্রেরই প্রকাশ মাত্র, একথা এই একদেশদর্শী গোঁড়ামী বই আর কিছু নয়। মানুষের মনোভাব তার শ্রেণী-স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়, সত্য। কিন্তু সে কতটুকু? তাছাড়া সেই প্রভাবকে অপরাপর স্বার্থ, তাগিদ ও প্রভাব খর্ব এবং এমন কি, বিলুপ্তও করতে পারে। কেন পারে তার জবাব দিয়েছে সমাজতত্ত্ব। সমাজে ও জীবনে বিবিধ শক্তি ও স্বার্থ কাজ করছে, ক্রমবিকাশের মূলে রয়েছে এই বিচিত্র ও অসংখ্য শক্তিসমূহের সমবেত ও পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাত। এই পারস্পরিকতা (reciprocity) হলো অধুনাকার সমাজতত্ত্বের সর্বস্বীকৃত তথ্য। মার্ক্সীয়দের অর্থনৈতিক শ্রেণীবাদ দাঁড়িয়ে আছে তাঁদের সামাজিক ক্রমবিকাশবাদের ওপরে।

এই বিবর্তনবাদের ভিত্তি হলো একরৈখিক (unilinear), অপরিবর্তনীয় (irreversible) কার্যকারণক্রমের থিওরী যা' আজকার দর্শনে ও বিজ্ঞানে অচল। অর্থনীতি যেমন জীবনের অপরাংশকে প্রভাবিত করছে, অপরাংশগুলোও তেমনি অর্থনীতিকে প্রভাবিত করছে। শ্রেণীস্বার্থের প্রকাশ সাহিত্যে থাকবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু সকল রকমের গোষ্ঠীজীবনের স্বার্থই সাহিত্যের মধ্যদিয়ে প্রতিফলিত হবে, একথাও অনস্বীকার্য। অধিকন্তু কেবল গোষ্ঠীজীবনই নয়, ব্যষ্টি-জীবনেরও আশানিরাশার কাহিনী সাহিত্যে ভাষা পাবে। সমষ্টিজীবন দানা বেঁধে উঠেছে ছোটবড় নানাবিধ গোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে। ছোট বড় নানা আকারের সমকেন্দ্রিক বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত হয়েও ব্যক্তির একটী স্বতন্ত্র সত্তা আছে। তাই আজ মার্ক্সীয়দের মধ্যে যারা যুক্তিশীল তারা ব্যক্তিকে নিয়েও সাহিত্য হতে পারে একথা স্বীকার করেছেন। বিখ্যাত মার্কস্‌বাদী জন্ স্ট্রাচীও (Strachey) বলছেন, "Literature for the most part, attempts to illuminate some particular predicament of a particular man or a particular woman at a given time and place." এই স্বীকৃতির জন্য গোঁড়া মার্ক্সীয়রা খুশী হননি। এমন কি গ্রেন্‌ভিল্ হিক্‌স্ এর জন্য স্ট্রাচীকেও এক হাত নিতে ছাড়েননি। কিন্তু আমেরিকার আর একজন মার্ক্সীয় সাহিত্যিকও ব্যক্তির মূল্যকে স্বীকার করে স্ট্রাচীকে সমর্থন করেছেন। তার নাম ফ্যারেল (J. T. Farrell)। তিনি বলছেন, সামাজিক শক্তিগুলো এমন ভাবে দানা বেঁধে উঠে কাজ করে না যাতে এক একটা বিপুল আকারের পিণ্ড বিরুদ্ধ দিক থেকে এসে পরস্পরকে ধাক্কা দিচ্ছে। মানুষকে কেবল পিণ্ডের অংশ হিসেবে দেখলে আবার পুরোণো যান্ত্রিকতারই সমর্থন করা হয়—"the treatment of them as such is a fall back to the materialism that preceded Marx........We cannot

treat social forces as mechanical and the basis of this is the common intellectual conception of cause and effect as rigidly opposite poles.', (৬) ফ্যারেলের মতে সাহিত্য শ্রেণীকে নিয়েও হতে পারে, ব্যক্তিকে নিয়েও হতে পারে। আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাহিত্যের মূল্য যে কম একথাও স্বীকার্য নয়। উপন্যাসের শ্রেণীভাগ করে হিক্স্ যে "সমষ্টি-কেন্দ্রিক" উপন্যাসের নামকরণ করেছেন তাও ফ্যারেলের মতে অবৈজ্ঞানিক। (৭)

জীববিদ্যা ও সমাজবিদ্যা দুইই স্বীকার করে থাকে যে মানুষের সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য যেমন আছে তেমনি প্রভেদ-ও আছে। কোনো কোনো বিষয়ে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকে আবার অন্যদিক থেকে থাকে অসাদৃশ্য। জীবিকা-স্বার্থের সাদৃশ্য যাদের মধ্যে রয়েছে তারা হলো মার্ক্সীয় "শ্রেণী"। তেমনি অন্যবিধ সাদৃশ্যের ভিত্তিতে অন্যরকমের গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। মানুষের সঙ্গে মানুষের কেবল এক ধরণের সাদৃশ্যটিকেই চোখের ওপরে

(৬) "A note on Literary criticism" by James T. Farrell.

(৭) "Therefore, because a novel happens to deal with the particular predicament of a particular man or woman···it does not necessarily follow that it is tainted with individualism, nor, because it is tainted with individualism, does it necessarily follow that it belongs in a lower category than the collective novel ;······ Actually there is nothing astounding in the fact that novelists are likely to go on writing about the individuals, because, after all, the world is made up of individual human beings."—(ibid, pp. 111-112).

রেখেই সাহিত্য সৃষ্ট হবে, কেবল অর্থনৈতিক শ্রেণীর স্বার্থ নিয়েই সাহিত্য গড়ে উঠবে, এ দাবি ও কল্পনা ভিত্তিহীন। আরেকটা কথা আছে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির একটা প্রভেদও আছে; সকল সাদৃশ্যের পিছনেই জেগে রয়েছে এই প্রভেদ বা অসাদৃশ্য। এইদিক থেকে দেখলে প্রত্যেকটী ব্যক্তিরই আছে একটী বিশিষ্টতা বা uniqueness. এইখানে প্রত্যেকটী ব্যক্তি স্বতন্ত্র মহিমায় ভাস্বর। দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতি ও রীতিতে, উভয়ত্রই, এই ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। আকৃতিতে যেমন প্রতিটী ব্যক্তি প্রতি ব্যক্তি থেকে বিভিন্ন, প্রকৃতিতেও তাই প্রতি মানুষের একটী পৃথক স্বকীয়তা আছে। (৮) এই কারণে মোটামুটি ভাবে শ্রেণী হিসেবে কোন মানুষ-সংহতির ব্যবহার সদৃশ ও সমপ্রকৃতিক হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও কোন ব্যষ্টির ব্যবহার সম্বন্ধে সঠিক ভবিষ্যৎ-বাচন চলে না। ব্যক্তির প্রায়শই বিশিষ্টপ্রকৃতি ও স্বতন্ত্রধর্মী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এখানে (statistical average'এর) পদ্ধতি খানিক দূর কার্যকরী হলেও, বেশী দূর নয়। যেখানে মানুষ স্বতন্ত্রধর্মী সেখানে তার ব্যবহার শ্রেণী-ব্যবহার না হয়ে হবে সম্পূর্ণ ব্যক্তিক ব্যবহার যা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে স্বয়ংসিদ্ধ। এই ব্যক্তিধর্মকে নিয়ে যে সাহিত্য-রচনা হয়, তার শ্রেণীস্বার্থ-সম্পর্কিত মূল্য কম হলেও সাহিত্যিক মূল্য কম নয়। তেমনি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেও ব্যক্তি হিসেবে বা মানুষ হিসেবে সাদৃশ্য আছে; শ্রেণী-স্বার্থের পার্থক্যকে বাদ দিয়ে যদি

---

(৮) "Besides being members of classes and groups, they are intractable individual entities, each uniquely different and in some respects, from every other human being on this planet.······In other words, in every individual there is an aspect of uniqueness and intractability and this makes him not completely predictable in every potential situation." (ibid, pp 117).

মানবীয় সাদৃশ্যকে মাত্র ভিত্তি করে সাহিত্য তাকেই রূপ দেয়, তবে সে সাহিত্যকে কুসাহিত্য বলবার কোনই যুক্তি নেই। কিষাণ আর জমিদারের, মজুর আর ধনিকের মধ্যে মানুষ হিসেবে কতকগুলি সমধর্ম আছে। বৃহত্তর গণের (genus) মধ্যে ক্ষুদ্র জাতি (species) অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে; জাতি হিসেবে পরস্পরের বিরোধ বা প্রভেদ থাকলেও সবগুলি ব্যক্তিই গণ হিসেবে বৃহত্তর মানবসমাজের অংশ। দাম্পত্য-প্রীতি, বাৎসল্যপ্রেম, আত্ম-রক্ষাপ্রবৃত্তি ইত্যাদি বহু বিষয়ে মানুষ বিরোধী শ্রেণীভুক্ত হয়েও সমস্বভাব হতে পারে। এই বিশ্বমানবিক মানবধর্মও সাহিত্যের অনবদ্য বিষয়বস্তু হতে পারে। শ্রেণী-সংগ্রাম এই মানবধর্মকে সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারে না। (৯)

যারা শ্রেণী-সাহিত্য নিয়ে মেতে উঠেছেন তারাও এক ধরণের রোমাণ্টিক ভাবপ্রবণতার মোহে আটকা পড়েছেন। তবে তাদের এই মত্ততা আজ কিষাণমজুরকে কেন্দ্র করে উচ্ছ্বসিত হচ্চে, এই যা তফাৎ। কোনো সাহিত্যে রাজরাজড়াদের নিয়ে উচ্ছ্বাস দেখা যায়; কিংবা ধনীদের বিলাস-ঐশ্বর্যের সসম্ভ্রম বর্ণনায় সাহিত্য প্রায়শঃই মুখরিত হয় এ-ও দেখা যায়। কিন্তু মার্ক্সীয় সাহিত্যিকদের আধুনিক রচনায় দরিদ্রের, এমন কি দারিদ্র্যের সপ্রশংস স্তুতিবাচনে আজ রোমাণ্টিক ভাবালুতারই অন্য রূপ দেখা দিয়েছে। এ সেই সংকীর্ণ বাতিক যা সব জটিলতাকে সরল ফর্মুলায় বেঁধে সহজ সাহিত্য সৃজন করতে চাইছে; সাহিত্য হলো মানব-মননার দিগন্তপ্রসারী অরণ্য; এখানে আলোতে-ছায়াতে, লতাপাতা-পল্লবে, কীটপতঙ্গজন্তুজানোয়ারে কণ্টকে-ফুলে-ফলে, মেঘবর্ষণে আর তুফানে-বিদ্যুতে অজস্র জটিলতা। একে

---

(৯) "The class struggle however does not in any sense produce so complete a differentiation of human beings that there are no similarities between men who objectively belong to different social classes." (ibid 125 pp,)

সংক্ষিপ্ত নির্যাসে পরিণত করতে চান এরা, দারিদ্র্যের ঘর্মজলে আর বঞ্চিতের দীর্ঘশ্বাসে। কিন্তু এ যুগ-সাহিত্য হবে না, এ হবে সহজিয়া ভাব-সাহিত্য ('literature of simplicity'), এই নব রোমান্স রচনা করবে কেবল, "songs of stench and sweat' "it tends to idealise the worker and the worker-writer." শ্রেণী-সাহিত্যের তিন রূপ হতে পারে, (১) কিষাণমজুর লেখকের রচনা, (২) কিষাণমজুর সম্পর্কে রচনা (৩) কিষাণমজুরের স্বার্থের দৃষ্টিভূমি থেকে রচনা, অর্থাৎ কিষাণমজুরের স্বার্থকে সমর্থন করে রচনা। লেখক কিষাণমজুর হলেও তার রচিত সাহিত্য কিষাণ মজুরের স্বার্থকে সমর্থন না-ও করতে পারে। কেবল কিষাণমজুর সম্পর্কে রচনা হলেই নয়, তাদের শ্রেণী-স্বার্থকে সমর্থন করে রচনা হওয়া চাই। তাই তৃতীয় পর্যায়ের সাহিত্যই সত্যিকার শ্রেণী-সাহিত্য। এই শ্রেণী-সাহিত্য এক শ্রেণীর সাহিত্য হতে পারে, কিন্তু একমাত্র সাহিত্য নয়। কারণ 'শ্রেণী' নামক সংজ্ঞা বা categoryটা সাহিত্যবিচারে একমাত্র মাপদণ্ড নয়, একথা পূর্ব্বেই বিবৃত হয়েছে। গোঁড়া শ্রেণীবাদীরা অপর সাহিত্যকে স্বীকার করেন না। বুর্জোয়া শ্রেণীর সাহিত্যিকরা যা' লিখে থাকেন তা যতই বাস্তব ও সত্য হোকনা কেন, তার মূলপ্রেরণা, এদের মতে, স্বার্থসিদ্ধি বই কিছু নয়। জয়েসের লেখায় যে বাস্তব ও অবিকল বর্ণনা আছে তার কারণ হ'লো, মিরস্কির (Mirsky) মতে, জয়েসের অতিরিক্ত ও অন্যায় বস্তুপ্রীতি বা সম্পত্তি-প্রীতি। জয়েসের বাস্তবতার কারণ নাকি জয়েসের লুব্ধ ক্যাপিটালিস্ট মনোবৃত্তি। এরই নাম মার্ক্সীয় সাহিত্যসমালোচনা! আঁদ্রে জিদ্ (Andre Gide) একজন নামকরা মার্ক্সিষ্ট্। ১৯৩৫ সালে তিনিও লিখেছিলেন, সকল শ্রেণীকে অতিক্রম করে সকল শ্রেণী-স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান আছে সত্যিকারের সাহিত্যের। (১০) হেন্‌রী হ্যাজ্‌লিট্

(১০) "In every enduring work of art ·····one that is capable of appealing to the appetite of successive generations, there is to be found a good deal more than mere response to the momentary needs of a class or a period."—Andre Gide.

(Henry Hazlitt) আমেরিকার নামজাদা সমালোচক। তিনিও সাহিত্যে এই শ্রেণীমত্ততার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। এমন কি ট্রট্স্কী পর্যন্ত বলেছেন, "Personal lyrics of the smallest scope have an absolute right to exist within the new art." ব্যক্তির অনুভূতি নিয়ে অনুপম সাহিত্য হয়েছে, এবং চিরদিনই হবে। শ্রেণী সত্য, শ্রেণীপ্রভাবও সত্য, কিন্তু শ্রেণীকে অতিক্রম করে মানুষ ঊর্ধ্বলোকে উঠিতে পারে, যে লোকে মানুষ কেবল শ্রেণী নয়, দেশ, কাল, জাতি, লিঙ্গ ও বংশ ইত্যাদি সকল গণ্ডীর বন্ধন ও সংস্কারের অতীতে স্থিতিলাভ করতে পারে। একথা হ্যাজলিট্ও স্পষ্টভাষায় বলেছেন। (১১) মার্সেল প্রুস্তের লেখা ফরাসী পরিবেশের দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়েছে এবং ইংলণ্ডে বাস করলে তার লেখার মধ্যে কিছু ইতরবিশেষ হতোই। কিন্তু তাই বলে প্রুস্ত-'এর ফরাসীত্বের দরুণ কি আমেরিকার পাঠকদের কাছে প্রুস্ত'এর সাহিত্যিক মূল্য কমেছে কিছু? ড্রেজার (Dreiser) পুরুষ বলে মহিলাদের কাছে তার লেখা কিছু কম প্রিয় নয়। তেমনি জর্জ ইলিয়াট বা দেলেদ্দার লেখা পুরুষেরা পড়বে না এমন হতে পারে না। অর্থাৎ শ্রেণী, লিঙ্গ, দেশকালের ঊর্ধ্বে একটা ক্ষেত্র আছে যেখানে সাহিত্যিক রসের অব্যাহত থাকবার কোনই বাধা হয় না।

---

(১১) "The great writer with great imaginative gifts may universalise himself. If not in a literal sense, then certainly In a functional sense, he can transcend the barriers of nationality, age and sex. But certainly he can, in the same functional sense and to the same degree, transcend the barrier of classes." (H. Hazlitt in an article in 1932).

শ্রেণীর প্রভাব বা পারিপার্শ্বিকের প্রভাবকে কোন যুক্তিশীল সমালোচকই বাদ দিতে পারেন না। কিন্তু তাই বলে শ্রেণীকেই সাহিত্যবিচারের একমেবাদ্বিতীয়ম্ মানদণ্ড করে দাঁড় করানোর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই নেই। ইতিপূর্বে অর্থাৎ মার্ক্সীয় সাহিত্য সৃষ্ট হবার আগেও সমালোচকেরা পারিপার্শ্বিকের ও এমন কি, শ্রেণীব প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কুর্থোপ্ (Courthope) তার বিখ্যাত এক প্রবন্ধে ("Poetry and the people") শ্রেণীপ্রভাবের গুরুত্ব সম্বন্ধে লিখেছিলেন। (১২) এমন কি, বুর্জোয়া উদারনীতির বর্তমান বিশৃঙ্খলা যে সমষ্টিবাদ ও ব্যক্তিবাদের সংঘর্ষ থেকে জন্মেছে এবং তাই তদানীন্তন কাব্য যে এই বিশৃঙ্খলার ছাপ বহন করেছে, তাও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু পারিপার্শ্বিকের গুরুত্ব উপলব্ধি করা এক কথা, আর তার অন্ধ মাহাত্ম্য কীর্তন করা হলো অন্য ব্যাপার। মার্ক্সীয় সমালোচনার আতিশয্য দোষ এবং একদেশদর্শিতা তাই বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে গ্রাহ্য হওয়া সম্ভব নয়। এমনকি ট্রট্স্কীও এ সম্বন্ধে মার্ক্সীয় গোঁড়ামার তীব্র সমালোচনা করেছেন। শ্রেণীসংস্কৃতি বলে কোন বস্তু নেই, কাজেই প্রলেটারীয় সংস্কৃতি বা সাহিত্য বলেও আলাদা কিছু থাকবার কল্পনা করবার কোনই অর্থ নেই। যে শক্তি ও আনন্দের উপাদানকে মানুষ যুগে যুগে সঞ্চয় করেছে সেই সব উপাদানকে কোন বিশেষ শ্রেণীর সংস্কৃতি বলে ছাপ মেরে দেবার কোনই কারণ নেই। ইলেকট্রিসিটি, স্টীমএঞ্জিন, এরোপ্লেন, মোটর, চিকিৎসাবিজ্ঞান, রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি হলো আধুনিক সভ্যতার উপাদান

(১২) "All through the history of England we see a tendency in the life of the nation to concentrate itself in....some particular class which becomes for the time being the sovereign power, rallies round itself all the faculties of the people......" (Courthope).

এর মূলে বহুলোকের অবদান রয়েছে। সর্বমানবের কল্যাণে এদের ব্যবহারে ও প্রয়োগে কোন আপত্তিই থাকতে পারে না। তবে বর্তমান যুগে বুর্জোয়া শ্রেণীর সামাজিক প্রাধান্য বাণিজ্যে ও রাষ্ট্রে রয়েছে; তাই এসব মানব-ব্যবহার্য্য উপাদান কতিপয় ধনিকের দখলে ও ভোগে আটক আছে। সর্বহারাদের এতে কোন অধিকার নেই। কিষাণ-মজুরের রাজ হলে এই যুগান্তরের ক্রমসঞ্চিত ঐশ্বর্য কিষাণ-মজুরের ভোগেও আসবে। যা ছিলো সংখ্যাল্পের আয়ত্তে, তা হবে অগণিতের উপভোগ্য। যে সংস্কৃতি বা সভ্যতা আজ একশ্রেণীর একচেটিয়া, সেই সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়বে সকল স্তরের মধ্যে। শুধু এই হবে পার্থক্য। কাজেই "বুর্জোয়া" বা "প্রলেটারীয়" বলে মার্কামারা কোন সংস্কৃতি নেই; এ হোল শব্দের দুষ্ট প্রয়োগ মাত্র। আসল কথা, আজিকার বুর্জোয়ার অধিকৃত ও উপভোগ্য সংস্কৃতিকে আমরা চাই প্রলেটারীয়েটএর দখলে এনে দিতে। অনাগত বিপ্লব হবে এই হস্তান্তরের বাহক। কাজেই বিপ্লবোত্তর সংস্কৃতিকে 'সমাজতান্ত্রিক' বা 'প্রলেটারীয়' সংস্কৃতি নাম দেওয়া একান্ত নিরর্থক। অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক পরিভাষাকে সাহিত্যিক ক্ষেত্রে অপপ্রয়োগ করলে অর্থবিভ্রাট ঘটবেই। সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে যারা রাজনৈতিক লেবেল দিয়ে খণ্ডিত করে দেখেন তারা সংস্কৃতির অপব্যাখ্যা করেন। ফ্যারেলের ভাষায় "When one freezes the categories of bourgeois and proletarian and insists that they be standards of measurements in literature, one shuts out the enduring element that Gide speaks of." এঙ্গেল্স্ (Engels) মার্ক্সীয় ডায়ালেকটীক জড়বাদকে যান্ত্রিক জড়বাদে পরিণত করেছেন, 'বুর্জোয়া', 'প্রলেটারীয়' ইত্যাদি পরিভাষাকেও কাষ্ঠ-কঠিন অনড় সংজ্ঞায় দাঁড় করিয়া দিয়েছেন। এর ফলে মার্ক্সবাদীরাও 'বুর্জোয়া' ইত্যাদি লেবেল ব্যতীত সংস্কৃতি, সাহিত্য বা সমাজ-জীবনকে

ভাবতেও পারে না। এই গোঁড়ামীর পথ এঙ্গলস-ই দেখিয়েছেন। তিনিই প্রথম "প্রলেটারীয় সংস্কৃতির" কথা রাজনীতি ক্ষেত্রে আমদানী করেছেন। কিন্তু এই ধরণের ভাগাভাগি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চলে না। বিশেষতঃ যে মনোভাব বুর্জোয়া সংস্কৃতি বিলীয়মান বলে নাসিকা কুঞ্চিত করে, তা কেবল বিশুদ্ধ অজ্ঞতা বই অন্য কিছু নয়। প্রলেটারীয় সংস্কৃতি বলে যে নতুন সংস্কৃতির কাহিনী মার্ক্সবাদীরা প্রচার করে থাকেন তা সোনার পাথর বাটিরই মতন কল্পনার অলীক সৃজন। ট্রটস্কির মত গোঁড়া মার্ক্সবাদীও একথা স্বীকার করেছেন। ডিক্টেটরী যুগের অন্তে নূতন সমাজ সংগঠন হবে শ্রেণীহীনতার ভিত্তিতে। সে যুগের সংস্কৃতি হবে সর্বমানবের সংস্কৃতি, 'প্রলেটারীয়' নামক শ্রেণীচিহ্নে লাঞ্ছিত সংস্কৃতি নয়। (১৩) এমন কি মার্ক্স স্বয়ংও সাহিত্য সম্বন্ধে শ্রেণীবাদের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন বলে মনে হয় না। তথাকথিত "বুর্জোয়া"-মার্কা বলে মার্ক্স এ যুগের ও পূর্ববর্তী যুগের সাহিত্যকে অগ্রাহ্য করেন নি; বরং সাহিত্যকে

(১৩) "There is no workers' culture and that there will never be any and in fact there is no reason to regret this. The worker acquires power for the purpose of doing away for ever with class culture and to make way for human culture; we frequently seem to forget this. The main task of the proletariat intelligentsia in the immediate future is not the abstract formation of new culture,......but definite culture-bearing, i.e, systematic, planful and of course, critical imparting to the backward masses of the essential elements of the culture which already exists." (Trotsky—Literature & Revolution.)

রাজনৈতিক মতসংঘর্ষের উর্ধে রেখে তিনি অবিমিশ্র সাহিত্যরসাস্বাদের পথ দেখিয়ে গেছেন। এস্কাইলাস্ (Æschylus), হোমার থেকে দান্তে, সেক্স্পিয়ার, সার্ভেন্‌টে (Cerventes), গ্যয়েটে (Goethe), হায়নে (Heine), ইত্যাদির বইগুলো তাঁর দৈনন্দিন শান্তি এবং সারাজীবনের সান্ত্বনার উৎস ছিল। পল লাফার্গ বলেছেন, মূল গ্রীক ভাষায় এস্কাইলাসের বই মার্ক্স অন্ততঃ বছরে একবার আগাগোড়া পড়তেন। "বুর্জোয়া" কবিতা-সাহিত্যেই ছিলো তাঁর অফুরন্ত আনন্দ। (১৪) রোমান্সের নামে আমাদের আধুনিক মার্ক্সবাদীরা আঁৎকে ওঠেন; কিন্তু সারভেন্‌টের ও বাল্‌জাকের (Balzac) রোমান্সগুলিকে মার্ক্স সর্বশ্রেষ্ঠ রোমান্স বলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন; বাল্‌জাকের "La comedie Humaine" এর প্রতি তার প্রশংসা ছিলো অপরিসীম। (১৫) তাছাড়া স্কট (Scott), ফিল্ডিং (Fielding), ডুমা (Dumas) ইত্যাদিও তাঁর প্রিয় ছিলো; "Old mortality" এবং দিদেরো'র (Diderot) "Le Neveu de Rameau" কে মার্ক্স প্রতিভাদীপ্ত অসাধারণ সৃষ্টি, (masterpiece) বলে মনে করতেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মতামতে এরা সবাই মার্ক্সের কাছে ঘৃণ্য reactionary মাত্র, কিন্তু সাহিত্যলোকে এরা তার কাছে নমস্য প্রতিভা। এতেই প্রমাণ হয় যে সাহিত্যবিচারে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বা judgmentই

---

(১৪) "......he would read A Eschylus again in the original text, regarding this author and Shakespeare as the two greatest dramatic geniuses the world had ever known, for Shakespeare he had an unbounded admiration." (Lafargue).

(১৫) "The greatest masters of romance were for him Cerventes and Balzac.···His admiration for Balzac was so profound that......" (Riazanov).

চূড়ান্ত নয়, মূল্যবিচারে সাহিত্যের আছে নিজস্ব কতকগুলি মানদণ্ড ও আদর্শ। ফ্রান্‌জ্‌ মেহরিং (Franz Mehring) বলেছেন, "In his literary judgments he was completely free of all political and social prejudices, as his appreciation of Shakespeare and Walter Scott shows......." লেনিন-পত্নী ক্রুপস্‌কায়ার স্মৃতি-গ্রন্থ থেকে জানা যায়, অবসর কালে লেনিনও এই বুর্জোয়া, প্রতিক্রিয়াশীল ও decadent সাহিত্য থেকেই চিরজীবন আনন্দের খোরাক সংগ্রহ করে গেছেন। কিন্তু অদ্যকার মার্ক্সবাদীরা মার্ক্সের থেকেও বেশী মার্ক্সিস্ট্‌ এবং লেনিন থেকেও বেশী লেনিনিস্ট। কাজেই 'বুর্জোয়া' বল্‌তেই তাদের উদ্‌গত বিতৃষ্ণা দমন করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। প্রাণহীন আড়ষ্ট শ্রেণীবাদে এদের বিচার-শক্তি ও উপভোগ-প্রবৃত্তি উভয়কেই পঙ্গু করে ফেলেছে। ক্রুপ্‌স্কায়ার বইয়ে এর শিক্ষাপ্রদ ও আমোদজনক দৃষ্টান্ত রয়েছে। একদল কম্যুনিস্ট "তরুণ"কে লেনিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোমরা পুশ্‌কিন্‌ (Pushkin) পড়ো?" জবাবে তরুণ মার্ক্সিস্টরা বল্‌লেন "না, না, পুশ্‌কিন্‌ বুর্জোয়া! আমাদের হলো মায়াকভ্‌স্কী।" লেনিন মুচকি হেসে বললেন, "আমি কিন্তু পুশ্‌কিনকেই বেশী ভালবাসি!" বেচারি লেনিন! গণ্ডূষ জলে ফরফরায়মান খুঁদে মাছরা চিরকাল এবং সকল দেশেই এই রকমের হয়ে থাকেন। তারা একটু অধিক আতিশয্য ব্যাধিতে ভোগেন। কিন্তু তাই বলে বৈজ্ঞানিক বিচারে আতিশয্য বা উচ্ছ্বাসের স্থান নেই।

সমাজে আজ ধনীদরিদ্রের শ্রেণীসংগ্রাম প্রখর হয়ে উঠেছে, ভবিষ্যৎ সমাজে কিষাণ-মজুরের স্বার্থকে জয়যুক্ত করে নতুন অর্থ-ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। কিন্তু তাই বলে মানুষের সংস্কৃতি ও সমস্ত সভ্যতাকে শ্রেণী-বাদের লোহার ছাঁচে ফেলে মাপতে বা গড়তে হবে, এই Neuveau-মার্ক্সীয় সমালোচনা-রীতির কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। একই যাদুদণ্ড দিয়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রেই সবকিছুর সম্পূর্ণ সমাধান করা চলে না।

একটা সীমা পর্যন্ত এ নীতি কিছুটা কার্যকর হতেও পারে, কিন্তু তার পরে এ অদ্বৈতা পদ্ধতি অচল। সমাজ ক্ষেত্রের যে পদ্ধতি বা standard তাকে সাহিত্য ক্ষেত্রে হুবহু প্রয়োগ করার স্বপক্ষে কোনই লজিক নেই। সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রেও আজ মার্ক্সবাদীরা ডায়ালেকটিক্ ও শ্রেণীসংগ্রামের অস্ত্র হাতে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং "বুর্জোয়া" সাহিত্যের মৃত্যু-দণ্ডের হুকুম দিয়েছেন। কিন্তু ট্রট্স্কীর লেখনীতেই বেরিয়ে পড়েছে মার্ক্সীয় স্বীকৃতির সত্যভাষণ, "It is very true, one cannot always go by the principles of Marxism in deciding whether to reject or accept a work of art." ১৯১৭ সালের পরের জগতে যে সব নতুন ঘটনাবিবর্তন হয়েছে তার ঐতিহাসিক ইঙ্গিত হলো এই যে বাস্তব পরিস্থিতির চাপে মার্ক্সবাদীদের সাহিত্যিক গোড়ামীর একদিন সংশোধন হবে।

পরিশিষ্ট

(১) হবহাউস-হুইলার-গিন্সবার্গ-সংকলিত-সংখ্যাতালিকা

(৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শাসন-ব্যবস্থা

শ্রেণী	দৃষ্টান্তের সংখ্যা	বংশানুক্রমিক রাষ্ট্রব্যবস্থা	নামমাত্র রাষ্ট্রব্যবস্থা
নিম্ন-শিকারী	৩৬	৮	১৭
উচ্চ-শিকারী	৭৫	২০·৫	১৯
কৃষিজীবী (১)	৩৭	৭	১০
পশুপালক (১)	১৬	১	২
কৃষিজীবী (২)	১১৯	৩৪	১২
পশুপালক (২)	১৬	২	●
কৃষিজীবী (৩)	৯৬	১৬·৫	●

পারিবারিক-ব্যবস্থা

	মাতৃক্রমিক	পিতৃক্রমিক	ক্রয়-বিবাহ	বলপ্রয়োগে বিবাহ	কন্যার সম্মতিক্রমে বিবাহ	অস্থায়ী বিবাহ	স্থায়ী বিবাহ	সাধারণ সম্পত্তি শতকরা অংশ	ব্যক্তিগত সম্পত্তি শতকরা অংশ	কন্যার অসম্মতিতে বিবাহ	বহুবিবাহ	একবিবাহ
নিম্ন শিকারী	২৩	১৪	১০	২৪	২৯	১৪	৩৫	৬৯	১৫	৭১	২৯	১৪
উচ্চ শিকারী	১৪	১২	৪২	৬	৫৬	৬	১৪	৮০	৫	৪৪	৩২	৬
কৃষিজীবী (১)	৫·৫	৬	৩১	৬	৭৮	২৩	২২	৬৪	১৮	২২	১৮	২৩
পশুপালক (১)	৩	৬	৬১	১১	৬৫	৭	৩১	৫৭	৩৫	৬৫	৫৩	৭
কৃষিজীবী (২)	২১	১৫	৫৩	২	৬২	১৭	৩৬	৫৪	১৩	৩৮	৪৩	১৭
পশুপালক (২)	১	৬	৮৩	২·৫	১৪	০	২৯	৬২	৫	৮৬	৭৪	০
কৃষিজীবী (৩)	২০	২৪·৫	৬৯	৭	৭০	১১	২৫	২৯	১০	৩০	৬৪	১১

(২) এই পুস্তকে উল্লিখিত গ্রন্থ-তালিকা

Baldwin Mark—Social and Ethical Interpretations.

Barnes, H. E.—Recent Political Theories (article).

Bergson, H—Two Sources of Religion and Morality.

Bluntschli—The Theory of State.

Buckle—Civilisation of England.

Bukharin—Historical Materialism.

Cole—Social Theory.

Comte. A—A new programme of Sociology

—Sociology and action.

Croce—What is living and what is dead of Hegel.

Dewey, John—Liberalism and Social Action.

Durkheim—Elementary forms of Religion.

Ellwood—Introducticn to Social Psychology,

—Psycho-logy of Human Society.

Engels—Feurbach.

—Origin of Family, Private Property and State.

—Anti-Duehring.

Espinas—Ancient Society.

—The Origin of Technology.

Frazer—Golden Bough. (Abridged Ed.)

Ginsberg—Studies in Sociology.

—Art in 'Humar Affairs'.

Ginsberg, Hob House, Wheeler—The Material Culture and Social Interpretations of the Simpler Peoples.

Gidding—The Responsible State.

Hook, Sydney—Towards Understanding of Karl Marx

—Hegel and Marx.

Haldane, J. B. S.—Marxism and Science.

Kid, B—Social Evolution.

Kropotkin—Mutual Aid, A factor in Evolution.

Lenin—Lenin on Religion.

Lowie, R—Primitive Society.

Malinowski—Art in 'Human Affairs'.

—Crime and Custom.

Marx—Poverty of Philosophy.

—Eleven Theses on Feuerbach.

—Critique of Political Economy.

Morgan, Lewis—Ancient Society.

Muller-Lyer—Evolution of Modern Marriage.

Novicow—The Critique of Social Darwinism.

Perry—Origin of Civilisation.

Plekhanov—Fundamental Problems of Marxism.

Rivers—Social Organisation.

—History of Melanasian Society.

Ross—Principles of Sociology.

Russell—Freedom and Organisation.

Seal, B. N—New Essays in Criticism.

Seligman—Economic Interpretation of History.
Sorokin—Crime and Punishment
—Social and Cultural Dynamics I.
Spencer, H—Principles of Sociology I.
Stalin—Dialectical Materialism
—Letters of Engels.
Toynbee, A—Study of History.
Trotter—Instincts of Herd in Peace and War.
Wallis—Introduction to Anthropology.
Ward—Primitive Sociology.

